সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া

প্রথম বিশ্ব রামায়ণ উৎসবে ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্ত

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জিলিয়ান ও টুনটুনিকে
দিলাম

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

বালীদ্বীপের গৃহস্থ বাড়ীর সদর দরজা

বালীদ্বীপে গ্রাম্য মন্দিরের আঙ্গিনায় 'লেবং' নৃত্য
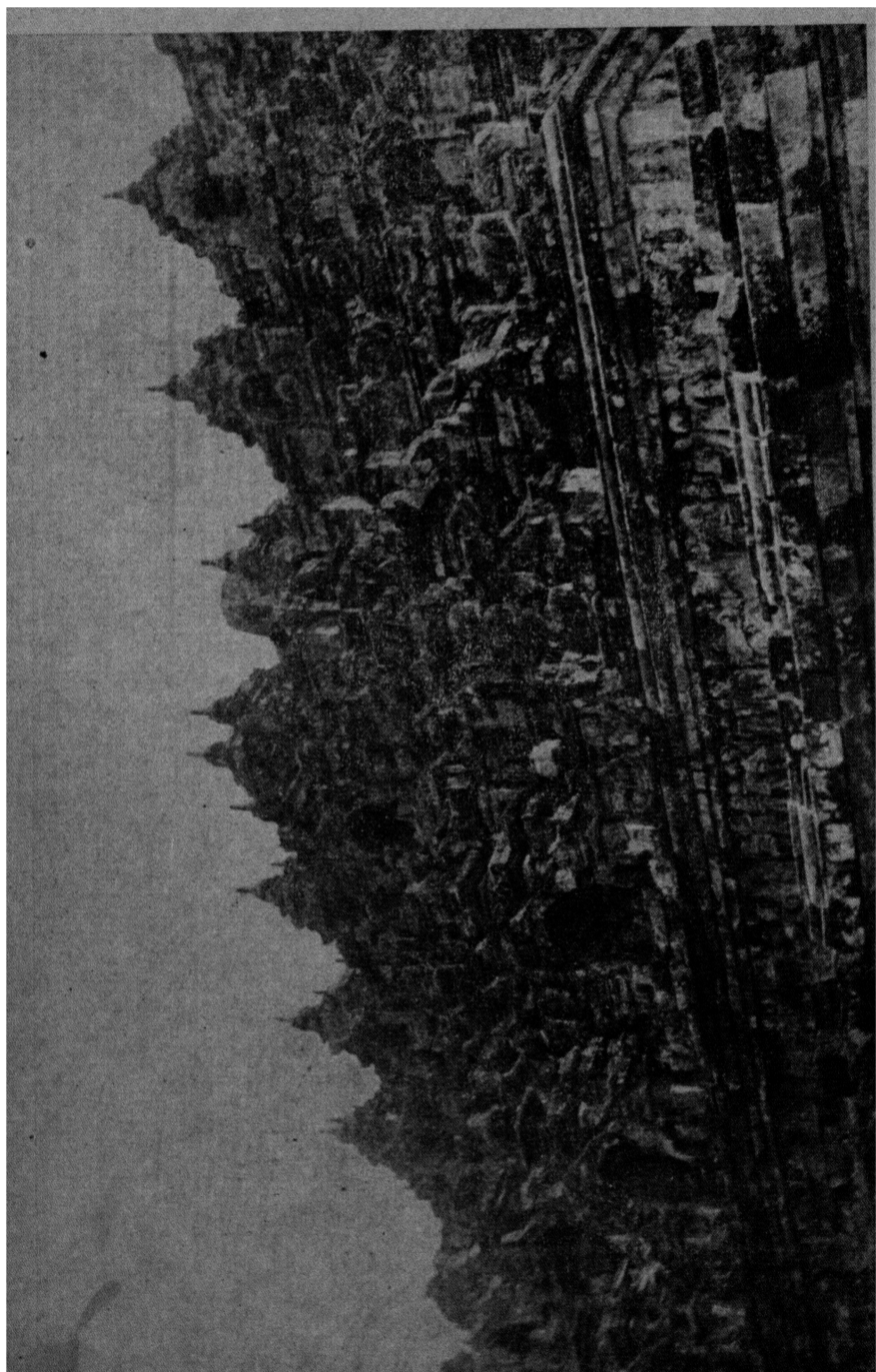
যবদ্বীপের রামায়ণ-নৃত্যে 'অশোক বনে'র একাংশ
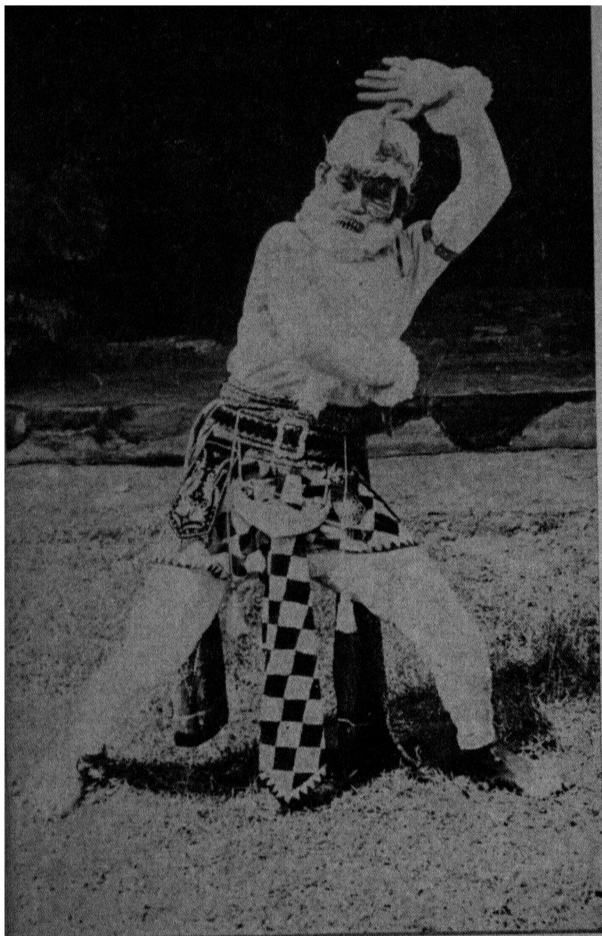
বাঁয়ে—পূর্ব যবদ্বীপের
রামায়ণ-নৃত্যে হনুমান।

নীচে—থাইল্যাণ্ডের
রামায়ণ-নৃত্যের
একটি দৃশ্য
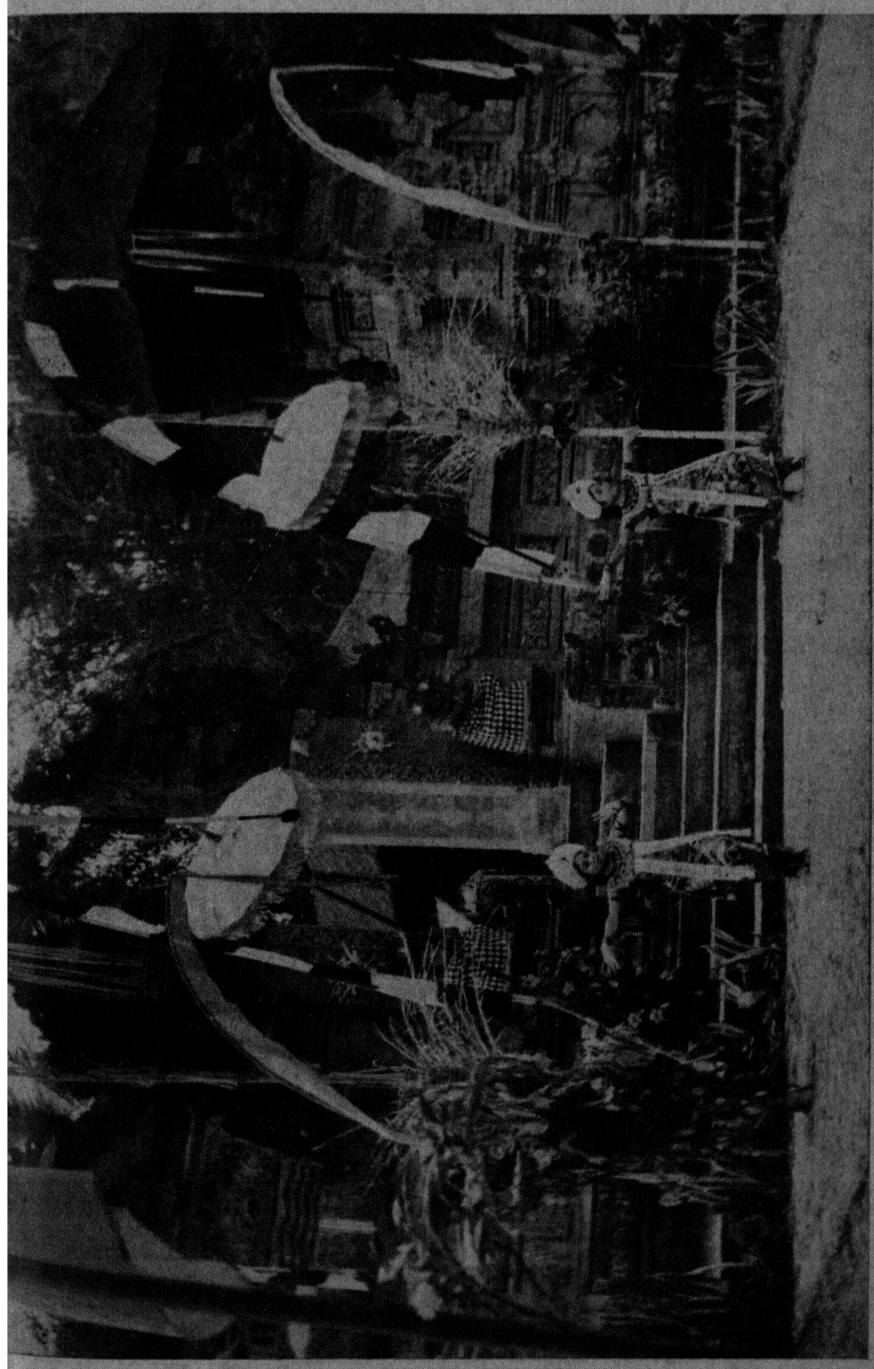
বালীদ্বীপের গ্রাম্য মন্দির-প্রাঙ্গণের একটি নৃত্যের দৃশ্য
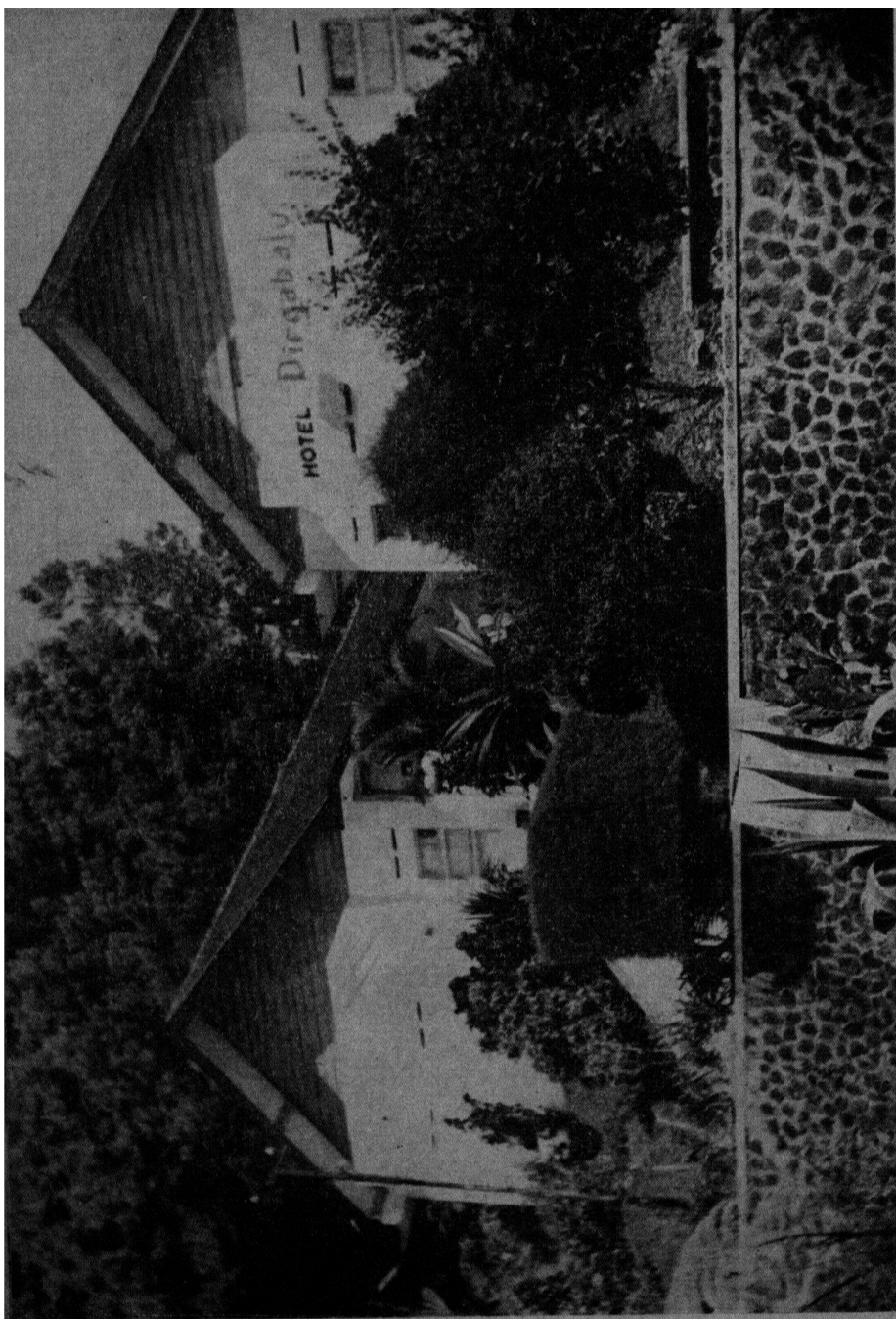
আমন্ত্রণ

জীবনে আমাদের কত রকম আকস্মিকতা এবং বিস্ময়ের জন্য যে তৈরী থাকতে হয়, তা' কেউ বলতে পারে না। আমার জীবনেও আমার পরমতম বিস্ময়ের মুহূর্ত একদিন এসেছিল, সে' দিনই যেদিন আমি ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে ইন্দোনেশিয়া যাবার নিমন্ত্রণপত্র পাই। কারণ, সব জায়গাতে বিশেষতঃ দূরবর্তী কোনো জায়গায় যাবার একটা পূর্ববর্তী প্রস্তুতি সবারই কিছু না কিছু থাকে। সে প্রস্তুতি মানসিক এবং ব্যবহারিক দুই-ই। কিন্তু ১৯৭১ সনের ২রা জুলাই তারিখে লিখিত ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের উপপরামর্শদাত্রী ডক্টর শ্রীমতী কপিলা বাৎস্যায়ন যখন তাঁর চিঠিতে আমাকে আগস্ট মাসে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় বিশ্ব রামায়ণ উৎসব ও আলোচনা চক্রে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে আমন্ত্রণ জানালেন, তখন এই বিষয়ে আমার মানসিক কিংবা ব্যবহারিক কোনো পূর্বপ্রস্তুতিই ছিল না। ১৯৬৪ সনে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ফিরে আসবার পর অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য দেশ, এমন কি, মার্কিন দেশে যাবারও মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম সত্য, কিন্তু কোনোদিন এভাবে ইন্দোনেশিয়ায় যাবার আমন্ত্রণ আসতে পারে, তা' স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি। কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক সময় যা ঘটে, তা' স্বপ্নাতীত।

ইন্দোনেশিয়া কোথায়? কোন্ দেশকে ইন্দোনেশিয়া বলে? সুমাত্রা যবদ্বীপ বালীদ্বীপ এ'সব নাম আমরা চিরকাল শুনে এসেছি। হঠাৎ ইন্দোনেশিয়া এলো কোথা থেকে? সে দেশে এখন কি শাসন? সে দেশ স্বাধীন, না ইউরোপীয় কোনো জাতির উপনিবেশ? এ'সব বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, কারণ, সে বিষয়ে ভাববার কোনোদিন কোনো প্রয়োজন হয় নি। এ'কথা সত্য, আমরা ইউরোপ এবং এমন কি, আটলান্টিকের পরপারে মার্কিন দেশ সম্পর্কেও যত সংবাদ রাখি, ভারতের প্রতিবেশী এশিয়ার দেশগুলো সম্পর্কেই সে সংবাদ রাখি না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর শেষ বয়সে ইন্দোনেশিয়া ঘুরে এসে যে বইখানি লিখেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন, 'জাভাযাত্রীর পত্র' ; তা'তেও ইন্দোনেশিয়া বলে

সে দেশকে উল্লেখ করা হয় নি। তাঁর সঙ্গীরূপে ভ্রমণ ক'রে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বইখানি লিখেছেন, তার নাম প্রথম সংস্করণে দিয়েছিলেন 'দ্বীপময় ভারত' এবং দ্বিতীয় সংস্করণে সেই নাম পরিবর্তন ক'রে নূতন নামকরণ করেছেন, 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'। সেজন্য ইন্দোনেশিয়া নামটি তখন পর্যন্ত বাঙ্গালীর কাছে খুব পরিচিত হয় নি।

আমার কাছেও নয়। অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন নাম সুবর্ণ দ্বীপ, যবদ্বীপ ও বালীদ্বীপ। ১৯৪৯ সনে ভারত মহাসাগরের এই বিক্ষিপ্ত দ্বীপগুলো ওলন্দাজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ ক'রে এদের উপর এক অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে দ্বীপগুলো একসঙ্গে ইন্দোনেশিয়া নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। ১৯২৭ সনে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন সে দেশে যান, তখনো তার নাম ইন্দোনেশিয়া হয় নি, তাই ইন্দোনেশিয়া নামটি তাঁরা ব্যবহার করেন নি।

যাই হোক, ইন্দোনেশিয়া কোথায় ও কোন্ দেশ, তা জানবার জন্য আমাকে তখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আধুনিকতম মানচিত্রের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। তা থেকেই আমি বুঝতে পারলাম, আমার গন্তব্যস্থল মূলতঃ যবদ্বীপ। এমন দুর্লভ সৌভাগ্য কোনোদিন জীবনে লাভ করতে পারব, তা' কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের পর এদেশ থেকে সাংস্কৃতিক দৌত্য নিয়ে আর কেউ সে দেশে যান নি, তাঁর পরই আমি ভারতের প্রতিনিধি হয়ে সেখানে যাবার সুযোগ পেলাম বলে নিজের অদৃষ্টকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। চিঠিটি বার বার পড়তে লাগ্‌লাম। তার বঙ্গানুবাদ এই—

প্রিয় ডক্টর ভট্টাচার্য,

আপনি হয়ত জানেন যে ইন্দোনেশিয়ায় ইউয়েনেস্কো (UNESCO)র সহযোগিতায় ১৯৭১ সনের ২৯শে আগস্ট থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসবের অনুষ্ঠান হবে। এই উপলক্ষে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রামায়ণের উপর একটি আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করা হয়েছে। আলোচনা চক্র বিভাগের দু'টি উপবিভাগ থাকবে, সকাল এবং সন্ধ্যায় দু'টিরই একসঙ্গে অধিবেশন

হবে, তা'তে রাত্রের দিকে যে উৎসবের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'য়েছে, প্রতিনিধিগণ তা'তে উপস্থিত থাকবার সুযোগ পাবেন। আলোচনা চক্রের দু'টি বিষয় স্থির করা হ'য়েছে, প্রথমতঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথাগত সংস্কৃতির প্রচারে গণ-মাধ্যম (Dissemination of Traditional Culture of South East Asia through mass-media) এবং দ্বিতীয়তঃ রামায়ণের শিল্পগত অনুষ্ঠান (Artistic Performance of the Ramayana)। সঙ্গে যে কাগজ-পত্র পাঠানো হ'লো, তা' থেকে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারবেন।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনার এই আলোচনা-চক্রে অংশ গ্রহণ করবার জন্য সানন্দে অনুরোধ জানাচ্ছি। আলোচনা-চক্রে যে সব প্রবন্ধ উপস্থিত করা হবে, ইন্দোনেশিয়ার সরকার সেগুলো বেশ কিছু দিন আগেই হাতে পেতে চান, কারণ, সেগুলো অনুবাদ ক'রে ছাপাতে এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর কাছে তা' আলোচনা-চক্রের অধিবেশনের কিছু দিন আগেই পাঠাতে হবে। আলোচনার দু'টি বিষয়ের মধ্যে আপনি কোন্‌টিতে অংশ গ্রহণ করতে চান, তা দয়া ক'রে আমাকে জানিয়ে দিবেন। ১০ই জুলাইর মধ্যে আপনার আলোচ্য প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটি আমাদের নিকট পৌঁছানো আবশ্যক।

ইন্দোনেশিয়ার সরকার জানিয়েছেন যে অংশগ্রহণকারিগণ কেবলমাত্র তাঁদের প্রবন্ধের সারমর্মটুকু আলোচনা সভায় পাঠ করবেন; তা'তে তা' নিয়ে মৌখিক আলোচনা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত-বিনিময়ের বিস্তৃততর সুযোগ পাওয়া যাবে। আলোচনা-চক্রে অংশ গ্রহণ করা উপলক্ষে ভারত সরকার আপনার ভারতবর্ষ থেকে জাকার্তা যাওয়া-আসার বিমান ভাড়ার ব্যয় নির্বাহ করবেন। যতদিন আপনি ইন্দোনেশিয়ায় থাকবেন, ততদিন আপনি ইন্দোনেশীয় সরকারের আতিথ্য লাভ করবেন, তাঁরাই আপনার সেখানকার সকল ব্যয় নির্বাহ করবেন। এই আমন্ত্রণ যে আপনার পক্ষে গ্রহণযোগ্য এবং আলোচনা-চক্রে যোগদান করবার পক্ষে যে আপনার কোনো বাধা নেই, তা' যদি সত্বর আমাকে জানিয়ে দেন, তবে আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব। ইতি—

পত্র পাওয়া মাত্রই আমি আমার এই বিষয়ে সম্মতি জানিয়ে দিলাম এবং আলোচনা-চক্রে উপস্থিত করবার জন্য প্রবন্ধটির বিষয়ে ভাবতে লাগলাম।

তারপর প্রশ্ন হ'লো রামায়ণ উৎসব ও আলোচনা-চক্র। আলোচনা-চক্র (Seminar) না হয় বুঝতে পেলাম যে রামায়ণের নানা বিষয় নিয়ে দেশে দেশান্তরের পণ্ডিতদের মধ্যে সেখানে আলোচনা হবে। আর দশটা আলোচনা-চক্র যে ভাবে হয়, সেই ভাবেই তা পরিচালিত হবে। কিন্তু রামায়ণ উৎসব, সে কি জিনিস? ভারতবর্ষ ত রামায়ণের দেশ, রামায়ণের এখানে উদ্ভব, আর উদ্ভবের মুহূর্ত থেকে তা মুখে মুখে সারা ভারতবর্ষ প্রচারলাভ করছে, এখানে ত রামায়ণ উৎসব বলে কোনো বিষয় কোনোদিন দেখতে পাইনি।

আর ইন্দোনেশিয়া। তার সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যতটুকু জানতে পেরে-ছিলাম, তা'তে ত বুঝতে পেরেছিলাম তা মুসলমান রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথ এবং ডক্টর সুনীতিকুমারের বই পড়ে যতদূর মনে হ'য়েছিল, সেখানকার কেবল মাত্র ক্ষুদ্র বালীদ্বীপে কিছু সংখ্যক হিন্দু বাস করে। সেখানেই বিশ্বের আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব কি ভাবে অনুষ্ঠিত হ'তে পারে? এ' বিষয়েও আমার বিস্ময় কিছুতেই দূর হ'লো না। কারণ, তখনো এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারিনি। সুতরাং আমি পরবর্তী চিঠি-পত্রের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অল্প দিনের মধ্যেই আলোচনা-চক্র এবং উৎসব সম্পর্কে আরো বিস্তৃত বিবরণ জানতে পেলাম। তার জন্য যে অনুষ্ঠানলিপি স্থির করা হ'য়েছে, তার একটি অনুলিপি আমার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। ইতিপূর্বেই আলোচনা-চক্রে যে দু'টি বিষয় অবলম্বন ক'রে আলোচনা হবে বলে স্থির করা হ'য়েছে তা' আমাকে জানিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল, এবং তা'দের মধ্যে একটি বিষয় অবলম্বন ক'রে একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা ক'রে একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে (১০ই জুলাই) আমাকে তা' দিল্লীতে পাঠিয়ে দিতে বলা হ'য়েছিল, সে কথা আগে উল্লেখ ক'রেছি। আমি দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে The Ramayana in Chhau, a traditional dance-drama of Purulia, West Bengal, India, এই বিষয়ে একটি রচনা লিখে অল্প দিনের মধ্যেই দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলাম।

যে সকল দেশ আলোচনা-চক্রে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিল, তাদের নাম নেপাল, ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, খেমর, ভিয়েৎনাম, লাওয়স, ফিলিপাইন্‌স্ ও সিঙ্গাপুর। অর্থাৎ

যে সকল দেশে রামায়ণের ঐতিহ্য জাতীয় জীবনে আজো সক্রিয় আছে, সে সব দেশকেই প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হ'য়েছিল। প্রত্যেক দেশ থেকে একজন মাত্র প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল, ভারতবর্ষ সুবৃহৎ দেশ ব'লে সেখান থেকে দু'জন সরকারী প্রতিনিধিকে পাঠানো হ'য়েছিল। আমি ব্যতীত আর একজন যে প্রতিনিধি ভারতের পক্ষে সেখানে যোগদান করেছিলেন, তাঁর নাম ডক্টর লোকেশচন্দ্র, তিনি দিল্লীর ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক পরিষদ (International Academy of Indian Culture)-এর অধ্যক্ষ, তাঁর পিতা পরলোকগত স্বনামধন্য পণ্ডিত ডক্টর রঘুবীর। নিজেও তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ে সুগভীর পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে তখনো আমার ব্যক্তিগত কোনো পরিচয় হয় নি।

পশ্চিম বাংলার ছৌ-মুখোস নৃত্য বিষয়টি নির্বাচন ক'রে প্রবন্ধ রচনার আমার বিশেষ একটি কারণ ছিল। ইতিপূর্বে আমি পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জিলার গ্রাম্য কৃষকদের মধ্যে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখে এ'র প্রতি আমি আকৃষ্ট হই। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ'র প্রতিষ্ঠা একদিন সম্ভব হ'য়ে বাঙ্গালীর নিজস্ব শিল্পকৃতির একটি বিশেষ পরিচয় তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে। ইতিমধ্যেই আমি দিল্লীর বিদগ্ধ সমাজের সামনে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখিয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন ক'রেছিলাম। সুতরাং একটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রচার করবার যে সুযোগটি আমি পেলাম, তার সদ্ব্যবহার করবারই আমি সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম। বলা বাহুল্য, আমার এই প্রচেষ্টা সফল হ'য়েছিল এবং এই নৃত্যের বিষয়ে আমার মুখ থেকে সেখানে কেবল মাত্র বক্তৃতা শুনে এবং আমার প্রকাশিত ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা প'ড়ে সেখানে উপস্থিত পশ্চিম ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজ পরের বৎসরই আমাকে এই নৃত্যের একটি দল নিয়ে পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেখান থেকে দেশে ফিরবার তিন বছরের মধ্যেই আবার আমাকে সেই নৃত্যের দল নিয়ে মার্কিন দেশের বিদগ্ধ সমাজের আমন্ত্রণে মার্কিন দেশ সফর করবার জন্য যেতে হ'য়েছিল। সে' কথা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার আলোচনা-চক্র থেকেই তা'র বিশ্ব-ভ্রমণের সূচনা হ'য়েছিল। সেই জন্যই এ' কথাটি এখানে উল্লেখ করলাম।

শুধু একটি মামুলি প্রবন্ধ পাঠিয়ে কিংবা আলোচনা-চক্রে তা' পাঠ ক'রেই আমার দায়িত্ব সেখানে আমি শেষ করতে চাইলাম না, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমন্ত্রিত নৃত্যশিল্প-রসিক বিদগ্ধ সমাজ যাতে একটি সচিত্র সুমুদ্রিত পুস্তিকা প্রত্যেকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েও এই বিষয়ে ভাবতে পারেন, সে জন্য আমি কোলকাতার সব চাইতে অভিজাত মুদ্রাযন্ত্রে বহু অর্থ ব্যয় ক'রে একটি পুস্তিকাও ছাপিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব ব'লে সঙ্কল্প ক'রলাম। উদ্দেশ্য এ'টি বিনামূল্যে সেখানে বিতরণ করব। মুদ্রণ-পারিপাট্যে পুস্তিকাটির বিদেশে মুদ্রিত যে কোনো পুস্তকের সঙ্গেও যাতে তুলনা হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা করলাম। পুস্তিকাটির নাম দিলাম The Ramayana in Indian Chhau Dance. পুস্তিকাটির ছাপার কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া হ'লো। কয়েকটি আলোকচিত্র বহু ব্যয়ে তাতে মুদ্রিত ক'রে তা'কে সব দিক থেকেই আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা করা হ'লো।

ইতিমধ্যে ভারতের প্রতিনিধি হ'য়ে যখন আমার ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে বিশ্ব রামায়ণ উৎসবে যোগদান করবার কথা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হ'লো, তখন নানা বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে অভিনন্দন জানিয়ে আমার নিকট চিঠি-পত্র আসতে আরম্ভ করল। এই আমন্ত্রণ পাওয়ার পর থেকে আমি আমার নিজের দেশ-ভ্রমণের আনন্দলাভের সম্ভাবনায় নিজের মনেই বিভোর হ'য়েছিলাম, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এই বিষয়ে আমার একটি সুগভীর দায়িত্ব পালন করবার গুরুত্ব রয়েছে : তা কেবল মাত্র আমার ব্যক্তিগত ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যাপার নয়।

শান্তিনিকেতন থেকে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ২২শে জুলাই ১৯৭১ তারিখে একখানি চিঠি লিখে এই ব'লে আমাকে অভিনন্দন জানালেন—

কাল খবরের কাগজে দেখলাম, আপনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ইন্দোনেশিয়ায় আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হ'য়েছেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধি মানে ভারতবর্ষেরই প্রতিনিধি। বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়েছিলেন বেসরকারী ভারত-প্রতিনিধি রূপে। আর আপনি যাচ্ছেন সরকারী ভারত-প্রতিনিধি

রূপে। এটা সকল বাঙ্গালির পক্ষেই, বিশেষতঃ বন্ধুজনের পক্ষে অশেষ গর্ব, গৌরব ও আনন্দের বিষয়। সেই গৌরব ও আনন্দ জ্ঞাপনের জন্য এই অভিনন্দন পত্র লিখছি। আপনার যাত্রা সফল হ'ক ; ভারতবর্ষের বিশেষ ক'রে বাংলার মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি হ'ক, এই শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

বহু শতাব্দী পূর্বে বাঙ্গালি সাংস্কৃতিক অভিযাত্রীরা তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে যবদ্বীপ, বালী প্রভৃতি দ্বীপভূমিতে ভারতীয় ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির সৌধ প্রতিষ্ঠা করেছিল কালজয়ী দৃঢ় ভিত্তির উপরে। আপনি সেই অভিযাত্রীদেই উত্তরাধিকারী। আপনার উপরে সেই পূর্বগামী অভিযাত্রীদের আশীর্বাদ বর্ষিত হ'ক, এই কামনা জানাই। প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি—

প্রীতিবদ্ধ

প্রবোধচন্দ্র সেন

বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদিগের অসংখ্য ব্যক্তিগত সম্বর্ধনা সূচক পত্র ব্যতীতও একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ই আগস্ট তারিখে লিখিত এই পত্রটি পাই, পত্রের লেখক শ্রীঅমিয় ভাণ্ডারী, সম্পাদক সনাতন হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ সমিতি, ঘেঁটুগাছি, নদীয়া—

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় সমীপেষু,

সর্বপ্রথমে সশ্রদ্ধ ও সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন। নেতাজীবাজার সনাতন হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ সমিতির গুণমুগ্ধ সদস্যবৃন্দের বিগত ইংরাজী ৯।৮।১৯৭১ তারিখের বাংলা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার একটি সংবাদ বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে। সংবাদটি এই—আগামী ২৯।৮।৭১ তারিখ হ'তে ৯।৯।৭১ তারিখ পর্যন্ত ভারত, কম্বোডিয়া, নেপাল, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব অনুষ্ঠান। আমরা জানি, আজকের ইন্দোনেশিয়া একটি মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্র। অধিকন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তারা ইসলামের অনুগামী। অতএব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেখানে রামায়ণ উৎসব অনুষ্ঠানের তাৎপর্য কি ? যদিও থেকে থাকে তবে সেটা নিছক সাংস্কৃতিক, না এ'র দ্বারা ঐ এলাকার অধিবাসীদের মনে ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের মত কোনো ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে ? ইতিহাস বলে, বিগত কোনো এক সময়ে যবদ্বীপ, শ্যাম,

ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ, বালীদ্বীপ প্রভৃতি এলাকায় হিন্দু প্রধান ছিল। তবে কি আজকের অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব আমাদের লুপ্ত ধর্মের পুনরুজ্জীবনে বিশেষ কোন সহায়তা করবে? ইতিহাস দৃষ্টে সনাতন ধর্মের এই অবলুপ্তি নিতান্তই বেদনা-দায়ক। এই অবলুপ্তির জন্য দায়ী কে? আমাদের ধর্মীয় বিভ্রান্তিকর অনুশাসনের কঠোর সংরক্ষণশীলতা, যা যুগোপযোগী নয়? অথবা এ'র জন্য দায়ী কি আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ? শোনা যায়, আগেকার যুগে আমাদের ধর্মীয় নেতারা ধর্মপ্রচার মানসে দেশে বিদেশে অভিযান চালাতো। একমাত্র হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্যান্য সব ধর্মে আজো এ' রীতি বর্তমান। এ'টাও কি বিলুপ্তির কারণ?

কিংবদন্তী, বালীদ্বীপে এখনো যথেষ্ঠ হিন্দু আছে। কিংবদন্তী সত্য হ'লে তাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, আচার-আচরণের সামগ্রিক বিবরণ আপনার নিকট হ'তে জানবার আশা রাখি, অবশ্য উল্লিখিত উৎসব হ'তে ফিরবার পর। নিছক কৌতূহল চরিতার্থই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ক্রম ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু-ধর্মের অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশা পতন রোধ কল্পে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আপনার নিকট হ'তে যথাযথ নির্দেশ লাভই আমাদের নেতাজীবাজার সনাতন হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ সমিতির গুণমুগ্ধ সদস্য-বৃন্দের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইতি—

এই চিঠিখানি আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করবার উদ্দেশ্য এই যে আমি ইন্দোনেশিয়া যাত্রা করবার আগে এবং সেখান থেকে ফিরে আসবার পর এই প্রশ্নগুলো আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা ক'রে তাদের উত্তর জানতে চেয়েছেন। আমার বর্তমান গ্রন্থের ভিতর দিয়ে আমি যথাসাধ্য এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর জবাব দিবার চেষ্টা ক'রেছি। কারণ, এই পত্রটি কেবলমাত্র একটি অভিনন্দন পত্র নয়, বরং তার পরিবর্তে একটি গুরু দায়িত্ব নিয়োগ পত্র। কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করতে স্বীকৃত হ'লাম।

আগেই বলেছি, আমার গন্তব্যস্থল যবদ্বীপ, সেখানকার ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় আমাকে গিয়ে প্রথমেই পৌঁছুতে হবে। সেখান থেকে পরে উৎসবস্থলে যাবার ব্যবস্থা করা হবে। রামায়ণ উৎসব ও আলোচনা-চক্রের স্থান জাকার্তা থেকে ২৫০ মাইল দূরে পাণ্ডান নামক একটি স্থানে নির্বাচিত হয়েছে। কোলকাতা থেকে সেই অচেনা পথে আমি নিঃসঙ্গ যাত্রী।

ওলন্দাজ অধিকারের কালে যবদ্বীপের রাজধানীর নাম ছিল বাটাভিয়া, জাকার্তা ব'লে কোনো জায়গার নাম ছিল না। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হবার পর দেশের সমস্ত ওলন্দাজদের দেওয়া নাম পরিবর্তন ক'রে ইন্দোনেশিয় নাম রাখা হ'য়েছে। বাটাভিয়ার নাম পরিবর্তন করে সেখানে তার জাকার্তা নাম রাখা হ'য়েছে। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের 'জাভাযাত্রীর পত্রে' জাকার্তা বলে কোনো জায়গারই উল্লেখ নেই, তার পরিবর্তে বাটাভিয়া নামই ব্যবহার করা হ'য়েছে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যখন সে দেশে গিয়েছিলেন, তখন তা ওলন্দাজদিগের উপনিবেশ ছিল, আজ ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন, স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছরের মধ্যেই সে' দেশের চেহারার আমূল পরিবর্তন হ'য়েছে।

আমার গন্তব্যস্থল জাকার্তা, অথচ ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে আমার প্রাথমিক জ্ঞান আমি রবীন্দ্রনাথের 'জাভাযাত্রীর পত্রে'র উপর নির্ভর ক'রে লাভ করেছিলাম, তা'তে জাকার্তা ব'লে কোনো শহরের উল্লেখ না পেয়ে প্রথমটায় বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লাম। জাকার্তা যে কোথায় তা বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। জাকার্তায় কি ভাবে পৌঁছুতে হয়, তা' জান্‌বার জন্য ভাবলাম এয়ার ইণ্ডিয়ার শরণাপন্ন হব। কারণ, আমি জান্‌তাম সম্ভবতঃ আমাকে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে না হ'লেও অন্ততঃ তার টিকিট নিয়েই যেতে হবে।

এমন সময় একদিন কোলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী অধ্যক্ষ আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) মহাশয়ের সঙ্গে কি কারণে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনিও সংবাদপত্রে আমার ইন্দোনেশিয়া যাবার বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছিলেন। তিনি নিজে থেকেই আমাকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, আপনি কবে জাকার্তা রওয়ানা হ'চ্ছেন তার তারিখ আমাকে জানাবেন। জাকার্তায় আমাদের একজন সহকর্মীর কন্যার বিয়ে হ'য়েছে, সে স্বামীর সঙ্গে সেখানেই থাকে, হয়ত সে আপনার ছাত্রীও হ'তে পারে। আমি তার পিতাকে দিয়ে তার কাছে চিঠি লিখিয়ে দিব, সে এসে আপনাকে জাকার্তা বিমান-বন্দর থেকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে, তারপর সেখান থেকে যেখানে যাবার আপনি সেখানে যেতে পারবেন। তার স্বামী সেখানে একজন খুব পদস্থ সরকারী কর্মচারী। সেও আপনাকে সব বিষয়ে সাহায্য কর্‌তে পারবে।

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম, আমার গন্তব্য স্থলের নামটি মাত্র জেনেছি, জাকার্তা। কিন্তু কোন পথে সেখানে পৌঁছুতে হয়, তার তখনো কিছুই জানি না, এই ভেবে যখন আমি প্রায় দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিলাম, তখনই তার কথা শুনে আশ্বস্ত হ'লাম। বল্লাম, আমার যাত্রা করবার দিন ঠিক হ'য়েই আছে, তা ২৬শে আগস্ট।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বল্লেন, আপনার জাকার্তা পৌঁছবার তারিখটি মেয়েটিকে জানিয়ে দিতে বলব, যা'তে আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাত্রা ক'রতে পারেন।

যখন আমি সোভিয়েত দেশে যাই তখনো আমি নিঃসঙ্গ যাত্রী ছিলাম, তার ফলে মস্কো বিমান-বন্দরে নেমে এক অতি করুণ অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল। তার বিষয় আমার 'সোভিয়েতে বঙ্গ সংস্কৃতি' বইয়ে উল্লেখ ক'রেছি। তার কথা স্মরণ ক'রে যখন এ'বারও আমার আর এক নূতন দেশে নিঃসঙ্গ যাত্রা অনিবার্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল, তখনই গন্তব্য স্থলের একটি নির্ভর যোগ্য আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ'জন্য বার বার ধন্যবাদ দিয়ে আমার অন্তরের সন্তোষ প্রকাশ করতে লাগ্‌লাম।

তিনি বল্লেন, জাতীয় গ্রন্থাগারে আমার একজন সহকর্মী শ্রী এ. আর. সেনগুপ্ত তাঁর কন্যাকে বিমান-বিভাগের একজন উচ্চ রাজকর্মচারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, কন্যাটির কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ পড়তে পড়তে বিয়ে হ'য়ে যায়। বিয়ের পর থেকে অনেক দিন ধরে নানা জায়গায় বদ্‌লি হ'য়ে তার স্বামী বেশ কিছুকাল যাবৎ জাকার্তায় স্থায়ী হ'য়ে আছে, তার নাম গ্রুপ ক্যাপ্টান এন্‌. সিংহ রায়। যে পদে সে এখন কাজ ক'রছে, তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—তা Air Attache, Embassy of India in Indonesia.

আমি বল্লাম, বাঙ্গালীর ছেলেদের আমরা কেবল নিন্দা করতেই শিখেছি, দেশ বিদেশে তারা যে কত দুঃসাহসিক কাজে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছে, তার সংবাদও রাখি না। যাই হোক, তার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমি সত্যই খুব আনন্দ লাভ করতে পারব।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বল্লেন, তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কথা যে তার স্ত্রী অর্থাৎ আমার বন্ধুকন্যা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার ছাত্রী ছিল।

আপনি চিন্‌তে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু সে নিশ্চয়ই আপনাকে ভুলে যায় নি। মেয়েটির স্বভাব চমৎকার, আপনি দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবেন।

শুনে গভীর স্বস্তি লাভ করলাম। জটিল জীবনের পথে কি ভাবে যে কখন বন্ধু জুটে যায়, তা কেউ আগে থেকে জানে না। পথের দুশ্চিন্তার আমার অনেকখানি লাঘব হ'লো।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ায় শীত না গ্রীষ্ম? কি রকম কাপড়-চোপড় সঙ্গে নিয়ে যাব? শীতের না গ্রীষ্মের? এ'কথা কা'কে জিজ্ঞেস করি? ইন্দোনেশিয়া থেকে এ'সেছে এমন লোক ত কাউকে দেখি না।

ভাবলাম একদিন শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এ'বিষয়ে জেনে নিব। সংবাদ নিয়ে জান্‌লাম, তিনি কোলকাতায় নেই। কেন জানি আমার মনে হ'লো, ইন্দোনেশিয়া অনেক দক্ষিণে ব'লে সেখানকার জলবায়ু নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ এ' দেশে যখন শীত, সে' দেশে তখন গ্রীষ্ম এবং এ' দেশে যখন গ্রীষ্ম তখন সে' দেশে নিশ্চয়ই শীত। আগস্ট মাসে এখানে বৃষ্টি হ'লেও প্রচণ্ড গরম চল্‌ছিল, তাই ইন্দোনেশিয়ায় এখন শীত হ'তে পারে ভেবে নূতন এক প্রস্থ শীতের পোশাক তৈরী করতে দিলাম। কিন্তু তথাপি মন থেকে আমার সন্দেহ দূর হ'লো না। ভাবলাম, হয়ত গ্রীষ্মকালীন পোশাক তৈরী কর্‌লেও হ'তো। শেষ পর্যন্ত রওয়ানা হবার দিন বুদ্ধি ক'রে এক প্রস্থ গরম জামার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রস্থ গ্রীষ্মকালীন ব্যবহারোপযোগী জামাও সঙ্গে নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, গরমই হোক শীতই হোক, কোন অবস্থাতেই উপযুক্ত পোশাকের অভাবে বিপন্ন হ'য়ে পড়ব না। তা'তে বোঝা বাড়্‌লেও উদ্বেগ কম্‌ল।

ক্রমে জান্‌তে পেলাম, ভারতবর্ষ থেকে রামায়ণ উৎসবে অনুষ্ঠান করবার জন্য দু'টি শিল্পীসংস্থা ইন্দোনেশিয়ায় যাবে—একটি প্রসিদ্ধ নৃত্য-শিল্পী শ্রীমতী গুলবর্ধন পরিচালিত গোয়ালিয়রের লিট্‌ল ব্যালে ট্রুপ (Little Ballet Troupe), আর একটি শ্রীপি. কে. ওয়েরিয়র পরিচালিত কেরলের কথাকলি নৃত্যসম্প্রদায়। উভয়েই রামায়ণের বিষয় অনুষ্ঠান কর্‌বে।

প্রত্যেক আমন্ত্রিত দেশ থেকে একটি ক'রে শিল্পীসংস্থাকে উৎসবে

অংশ গ্রহণ করবার অধিকার দেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ ব'লে তার দু'টি সংস্থা—একটি উত্তর ভারত থেকে আর একটি দক্ষিণ ভারত থেকে আমন্ত্রিত হয়েছিল।

ক্রমে আমার যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হ'য়ে গেল। কোন্ পথে আমাকে জাকার্তায় পৌঁছুতে হবে ত' আর আমার বুঝ্‌বার বাকি রইল না। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছিল যেন আমি কোলকাতা থেকে মাদ্রাজ হ'য়ে প্রথমতঃ আই. এ. সির. ও পরে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে সেখান থেকে সিঙ্গাপুর যাই, তারপর সিঙ্গাপুর থেকে গরুড় (ইন্দোনেশিয়ান এয়ার ওয়েজ)-এ করে জাকার্তা যাই। কিন্তু মাদ্রাজ যাত্রার দিন কোলকাতায় সাধারণ হরতাল ঘোষিত হ'য়েছিল ব'লে আমি যাত্রাপথ পরিবর্তন ক'রে ২৮শে আগস্ট তারিখ জাকার্তার পথে ব্যাঙ্কক রওয়ানা হ'লাম। ব্যাঙ্ককে এক রাত্রি বাস ক'রে সেখান থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে পরের দিন সিঙ্গাপুর গিয়ে বিমান বদল ক'রে গরুড়-এ ক'রে ২৭শে আগস্ট ১৯৭১ জাকার্তা পৌঁছবার সঙ্কল্প করি। আমি আমার এই ব্যবস্থার কথা যথাস্থানে জানিয়ে দি'। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারী ব্যবস্থার একদিন আগেই আমার জাকার্তা পেঁছে যাবার কথা। ২৮শে আগস্ট দম দম বিমান বন্দর থেকে শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় ঋতুরই পোশাকে ভর্তি এক স্ফীতোদর চামড়ার পেটিকা নিয়ে আমি যবদ্বীপের পথে ব্যাঙ্কক যাত্রা করলাম। দম দম বিমান-বন্দরে আত্মীয় স্বজন, ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুবান্ধব আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে গেল। কিন্তু এই বিদায়ে সেদিন বিন্দুমাত্র যে বেদনা অনুভব করিনি, সে কথা আজো মনে করতে পারি।

ব্যাঙ্কক—থাইল্যাণ্ড

একদিন পথযাত্রার দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য ক'রে নানা উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার দুঃস্বপ্ন উত্তীর্ণ হ'য়ে দূর দেশের গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌঁছুতে হ'তো : সেইজন্য সেখানে পৌছুবার যে আনন্দ, সে আনন্দের তুলনা হ'তো না। কিন্তু এখন পথযাত্রা নিতান্ত সহজ আরামপ্রদ এবং অভাবনীয় ভাবে ত্বরান্বিত হ'য়েছে, তাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর সেই আনন্দ আর লাভ করবার উপায় নেই। একদিন রবীন্দ্রনাথকে যবদ্বীপের পথে যাত্রা ক'রে প্রথমতঃ ট্রেনযোগে কোলকাতা থেকে মাদ্রাজ যেতে হ'য়েছিল, তারপর সেখান থেকে জাহাজে চ'ড়ে কয়েকদিন জাহাজের বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন ক'রে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে ধীরমন্থর গতিতে গিয়ে একদিন সিঙ্গাপুরে পৌঁছুতে হ'য়েছিল, তারপর সেখান থেকে আরো কয়েকদিন আবার এক নুতন জাহাজে চ'ড়ে আরো কয়েকদিন তেমনই জীবন যাপন ক'রে মন্থরতর গতিতে যবদ্বীপের পথে অগ্রসর হ'তে হ'য়েছিল। তাঁর কোলকাতা থেকে রওয়ানা হবার পর এক মাস উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবার পর তাঁকে যবদ্বীপের উপকূলে গিয়ে পৌঁছুতে হ'য়েছিল। এই একমাস তাঁর আনন্দে উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় নিদ্রায় অনিদ্রায় নানাভাবে উত্তীর্ণ হ'য়ে যখন তিনি গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর যে আনন্দ তিনি লাভ ক'রেছিলেন, আজকের ইন্দো-নেশিয়ার কোনো যাত্রী সে আনন্দের কথা কল্পনাও কর্‌তে পারে না। একদিন তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে আমাদের পূর্বগামীরা যে ভাবে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সে সব দূরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে যে কি ভাবে পৌঁছে, কী আনন্দলাভ করতেন, তা' আজ আমরা অনুমানও করতে পারব না। কারণ, এখন কোলকাতা থেকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা শহরে পৌঁছুতে মাত্র ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ সেদিন রবীন্দ্রনাথ হাওড়া থেকে স্টীম ইঞ্জিনে টানা ট্রেনে রওয়ানা হ'য়ে যতক্ষণে খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছেছেন, ততক্ষণে আজ কোলকাতা থেকে জাকার্তা পৌঁছে যাওয়া যায়। সুতরাং আজ আর পথ চলার আনন্দ উৎকণ্ঠা, শঙ্কা আশঙ্কা কিছুই নেই, তার অভাব অন্য দিক থেকে পূরণ ক'রে নিতে হয়।

আমি সকাল ৯-৪৫-এ দমদম বিমান বন্দর থেকে রওয়ানা হ'য়ে

দু' ঘণ্টার মধ্যেই থাইল্যাণ্ড-এর রাজধানী ব্যাঙ্ককে গিয়ে পৌঁছুলাম। আগেই বলেছি, এখানে একদিন বাস ক'রে পরের দিন আমি সিঙ্গাপুর হ'য়ে জাকার্তা যা'ব স্থির ক'রেছিলাম, নতুবা সেদিনই আরো দু' ঘণ্টার মধ্যেই আমি জাকার্তা পৌঁছে যেতে পারতাম।

দমদমে বিমান ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম, রামায়ণ উৎসবে ভারতবর্ষ থেকে যে দুটো শিল্পীসংস্থা (Performing party) যাওয়ার কথা, তারাও সেই বিমানেই জাকার্তা অভিমুখে যাত্রা ক'রেছে। তাদের এক এক দলে প্রায় ত্রিশ জন শিল্পী ; কথাকলি দলের সবই পুরুষ, কিন্তু লিটল্ ব্যালে গ্রুপে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই আছে। শেষোক্ত দলটির নেতৃত্ব করছিলেন ডক্টর শ্রীমতী কপিলা বাৎস্যায়ন স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে এবং কথাকলি সংস্থার নায়ক শ্রীওয়েরিয়ারের সঙ্গে বিমানেই আলাপ হ'লো। তাঁদের কাছে জান্‌তে পেলাম, তাঁরা সেদিনই সোজাসুজি ব্যাঙ্ককে বিমান বদল ক'রে গরুড়ে (আগেই বলেছি, ইন্দোনেশীয় বিমান সংস্থার নাম গরুড়) জাকার্তা পৌঁছবেন। আমি তাঁদের জানিয়ে দিলাম যে আমি একদিন ব্যাঙ্ককে থেকে পরের দিন পৌঁছুব।

ব্যাঙ্ককে নেমে তাঁরা গরুড়ের খোঁজ করতে লাগলেন, আমি সোজা-সুজি বিমান-বন্দরের বাইরে চলে এসে এয়ার ইণ্ডিয়ার লাউঞ্জের খোঁজ কর্‌তে লাগ্‌লাম। কারণ, তাদেরই আমার হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করে দিবার কথা।

ব্যাঙ্কক বিমান-বন্দরে নেমে এক বিচিত্র দৃশ্য আমার চোখে পড়্‌ল। বিমান-বন্দরের কর্মীদের স্ত্রী-পুরুষ সবারই চেহারা এক রকম। সবারই চুল কাঁধ পর্যন্ত একই রকম ক'রে ছাঁটা, মুখ গোল ও চেপ্টা, চোখ ছোট ছোট, পরিধানে একই ধরনের সাদা পোশাক, স্ত্রী-পুরুষের পোশাকেও কোনো পার্থক্য নেই। তখনও আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে লম্বা বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখার এত প্রচলন হয়নি, কিন্তু সেখানে তার কারো মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম নেই। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এই কর্মব্যস্ত বিমান-বন্দরের মধ্যে অর্ধেকের বেশী কর্মী নারী, কিন্তু তাদের বেশভূষা চেহারায় তা' কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

এই ভাবে দাড়ি গোঁপের স্পর্শহীন গোল গোল মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যখন এয়ার ইণ্ডিয়ার কোনো কর্মীর আমি সন্ধান

কচ্ছি, তখন সহসা এক দাড়িগোঁপে আচ্ছন্ন লম্বা মুখওয়ালা পাঞ্জাবী শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো। সমগ্র জনতার মধ্যে দৈর্ঘ্যে, মুখাবয়বের স্বকীয়তায় সেই ব্যক্তি যেন স্বতন্ত্র। সেই অপরিচিত জনতার মাঝখানে তাকে দেখতে পেয়ে তা'কে আমার একান্ত আপনার লোক ব'লে মনে হ'লো। তার কাছে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি এয়ার ইণ্ডিয়ার লাউঞ্জটা খুঁজ্‌ছি, কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

আর কিছু বল্‌তে হ'লো না। তিনি বল্‌লেন, আইয়ে—ব'লে আমার অগ্রবর্তী হ'য়ে চল্‌লেন, আমি তার পিছন পিছন যেতে লাগ্‌লাম।

ব্যাঙ্কক আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরের বিভিন্ন বিখ্যাত বিমান-প্রতিষ্ঠান-গুলোর বিস্তৃত লাউঞ্জগুলোর এক প্রান্তে নিতান্ত অপরিসর স্থানে এয়ার ইণ্ডিয়ার ক্ষুদ্র লাউঞ্জটি যেন নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে মুখ গুঁজে পড়েছিল। ছোট্ট একটি sign board-এর পাশে একজন সেই দেশীয় তরুণ কর্মী চুপ ক'রে ব'সেছিল। সে স্ত্রী কিংবা পুরুষ তা আমার বুঝ্‌বার উপায় ছিল না।

শিখ ভদ্রলোক তা'কে দেখিয়ে বল্‌লেন, জিজিয়ে, ব'লে তিনি আর অপেক্ষা না ক'রে নিজের কাজে চ'লে গেলেন। আমি সেই তরুণ কর্মীর (কিংবা স্ত্রীও হ'তে পারে) সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতেই সে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝ্‌তে পারল যে আমি এয়ার ইণ্ডিয়ার যাত্রী। আমি কিছু বল্‌বার আগেই সে বল্‌ল, আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি, এই আপনার ট্যাক্সি আর হোটেলের 'টোকেন'। যে কোনো ট্যাক্সি-ওয়ালাকে এই 'টোকেন'টি দেখাবেন, সে আপনাকে নির্দিষ্ট হোটেলে নিয়ে যাবে, তারপর কাল যথাসময়ে আবার বিমান-বন্দরে নিয়ে আস্‌বে, ট্যাক্সির ভাড়া আপনাকে দিতে হবে না।

আমি বল্‌লাম, একটা ট্যাক্সি আপনিই বরং যদি ডেকে ব'লে দিন তবে আমার উপকার হয়, না হয় ত কার খপ্‌পরে গিয়ে পড়ব, তা কেউ বলতে পারে না।

সে তাই কর্‌'ল। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে যেতেই একদল ট্যাক্সিওয়ালা তার হাত থেকে টোকেনটি নিয়ে আমাকে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দেবার জন্য নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে লাগ্‌ল। তাদের এত আগ্রহের কারণটা পরে জান্‌তে পেরেছিলাম, সেই মুহূর্তে কিছুই বুঝতে পারি নি। যাই হোক

অনেক ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি দুর্বোধ্য ভাষায় বকুনির পর একটা ট্যাক্সি স্থির হ'লো।

আমি মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। মনে হ'ল, বিমান-বন্দর শহর থেকে বেশ দূরে, যেমন সর্বত্রই থাকে, এখানেও তাই। বিস্তৃত পথের ধার দিয়ে বরাবর একটি খাল চলেছে, খালের উপর কোনো কোনো জায়গায় আমাদের দেশের মত বাঁশের সাঁকো। পথিপার্শ্বের বাড়ীঘর অধিকাংশই কাঠের তৈরী, দুপাশের বিস্তৃত মাঠের পরপারে নারকেল ও সুপারি বন। কোনো কোনো জায়গায় অযত্ন বর্ধিত বাঁশবন ব'লেও মনে হ'লো। বিস্তৃত মাঠে তখন কোনো ফসল নেই, তবে মনে হলো ক্ষেতগুলোতে ধান চাষ হয়। দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্র ক্রমে অত্যন্ত উত্তপ্ত হ'য়ে দুঃসহ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর ড্রাইভার গাড়ী চালাতে চালাতে এ'বার মুখ খুল্‌ল। ইংরাজিতে বল্‌ল, কাল বারোটার সময় আপনার জাকার্তার প্লেন, আমিই নির্দিষ্ট সময়ে হোটেল থেকে আপনাকে তুলে বিমান বন্দরে নিয়ে আসব।

আমি বল্লাম, বেশ, আমি তৈরী হ'য়ে থাকব।

তারপর সে আসল কথাটি পাড়্‌ল। সে বল্ল, লাঞ্চ খেয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে আপনি ত শহরটা একটু ঘুরে দেখতে চাইবেন। আমি আপনাকে আমার ট্যাক্সিতে ক'রে সব জায়গা ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। অন্য কোনো ট্যাক্সি আপনার দরকার হ'বে না।

এ ইচ্ছা যে আমার নেই, তা নয়। তবে ভেবেছিলাম, আমি এখানকার পথঘাট কিছুই জানি না, তার উপর সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। সুতরাং হোটেলের চেনা কোনো ট্যাক্সি ড্রাইভার ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আমার বাইরে যাওয়া নিরাপদ হবে না। সেই জন্য ভেবেছিলাম, এ'বিষয়ে যা করবার, তা যে হোটেলে যাচ্ছি, সেই হোটেলের ম্যানেজারের পরামর্শে তারই নির্দিষ্ট কোনো ট্যাক্সি নিয়ে করব। আমি নিজে থেকে কোনো ট্যাক্সি ঠিক করব না। অনেক সময় হোটেলের নিজস্ব গাড়ীও থাকে, তা'তে নির্ধারিত অর্থ ব্যয় কর্‌লে দেখা শোনা সবই হয়, অথচ তা'তে কোনো হাঙ্গামা হ'বার ভয় থাকে না। তাই আমি বল্লাম, এ' বিষয়ে হোটেলে গিয়ে যা হোক একটা কিছু ঠিক কর্‌ব।

কিন্তু আমার এই উত্তর ড্রাইভারের মনঃপূত হ'লো না ; সে ব ,. আমি আপনাকে খুব কম খরচে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারব। হোটেলের মাইনে করা ড্রাইভারেরা ঘড়ি-ধরা কাজ করবে। আমাকে যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ আপনি রেখে সব দেখে নিতে পারবেন। এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে। জানেন ? এই শহরে তিন শ' মন্দির আছে, সব জায়গাতেই আমি নিয়ে যেতে পারব। তারপর যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে রাত্রে আপনাকে 'নাইট্ ক্লাবে'ও নিয়ে যাব। তারপর হোটেলে এনে পৌঁছে দেব। আমার গাড়ীর নম্বর ত এয়ার ইণ্ডিয়ার লোকদের কাছে লেখাই আছে। আপনি আমার উপর নির্ভর কর্‌তে পারেন।

শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, ভাবলাম, কী সর্বনাশ ! মন্দির থেকে একেবারে 'নাইট্ ক্লাব'। বুঝতে পারলাম, সব বড় বড় শহর বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক শহর-বন্দর সব একই রকম।

আমি প্রকাশ্যে বল্লাম, না, আমার 'নাইট্ ক্লাবে' দরকার নেই। যা করবার আমি হোটেলে গিয়েই ঠিক করব। তারপর সন্ধ্যার আগেই আমাকে হোটেলে ফির্‌তে হবে।

সে আর কিছু বল্ল না, হোটেলে পৌঁছে দিয়ে হোটেলের দরজায় গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল।

প্রথম শ্রেণীর একটি মনোরম হোটেল। হোটেলের নামটি এতদিনে ভুলে গেছি, কোথাও লিখে রাখি নি ; কিন্তু নামটি সত্যিই মনে ক'রে রাখ্‌বার মত ছিল। চীনা হোটেল কিনা জানি না, কিন্তু চীনা তরুণীরা পরিচারিকা থেকে আরম্ভ ক'রে পরিবেষণ-কারিণীর সর্ব কর্মেই নিযুক্তা। পটের ছবির মত তা'দের রূপসজ্জা, তবে তা চীনা কায়দায় নয়, অনেকটা আধুনিকতম মার্কিন দেশীয় কায়দায়। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী তরুণী চীনাদের চলাফেরা কথাবার্তায় হোটেল যেন জীবন্ত রূপ ধারণ ক'রেছে। তার মধ্যে বিদেশী অতিথিদের আনাগোনার অন্ত নেই।

হোটেলের রেস্তরাঁতে গিয়ে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন শেষ করা গেল। পৃথিবীর যাবতীয় অখাদ্য বস্তু চীনারা আহার করে বলে ছেলেবেলা থেকেই শুনে আস্‌ছি, বোধ হয়, তারও কিছু কিছু আস্বাদ নিতে হ'য়েছিল। এমন অখাদ্য আমি জীবনে কোনোদিন খাই নি।

হোটেলের গৃহসজ্জা অতি মনোরম। ঘরে টেলিভিসন থেকে আরম্ভ ক'রে সব আধুনিক উপকরণই আছে, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরটি ছেড়ে বাইরের প্রচণ্ড গরমে বেরুতে ইচ্ছা করল না। ইচ্ছা হ'লো, এই কোমল শয্যার উপর শুয়ে দু'দণ্ড ঘুমিয়ে নি'। কিন্তু ভাবলাম, তা' হ'লে সন্ধ্যার আগে আর ঘুম ভাঙবে না; এই সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন ছবির মত শহরটির কিছুই দেখা হবে না। ভেবে সোফার উপর চুপ ক'রে ব'সে দিবানিদ্রার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে লাগ্‌লাম। ঘরের এক কোণে একটি 'ফ্রিজ' (refrigerator) ছিল, কৌতূহল বশতঃ সে'টি খুলে দেখ্‌তে পেলাম, তা'তে সারি সারি বোতলে ভর্‌তি মিষ্ট পানীয় (soft drink)। ছিপি খুলবার যন্ত্রও কাছেই ছিল, একটি খুলে আস্বাদন করা গেল। তারপর ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এসে হোটেলের দরজার কাছে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লাম, আমার সেই ড্রাইভার এখনো সেখানে ব'সে অপেক্ষা করছে। একবার আমার মনে হ'লো, হয়ত সে ফিরে বিমান-বন্দরে গিয়ে আবার নূতন কোনো যাত্রী নিয়ে এসেছে, আর একবার মনে হ'লো, হয়ত সে আমার জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছে।

আমি হোটেলের চীনা অভ্যর্থনাকারিণীর নিকট গিয়ে শহর দেখ্‌বার কি ব্যবস্থা তাদের দিক থেকে তারা করেছে, তা' জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌তে চাইলাম। সে বল্ল, আমাদের নিজেদের কোনো ব্যবস্থা নেই। দরজার সাম্‌নে ট্যাক্সি আছে, না থাক্‌লে টেলিফোন ক'রে ট্যাক্সি আনিয়ে দিতে পারা যায়, তা'তে ক'রেই যাত্রীরা শহর দেখে থাকেন। আপনিও ইচ্ছা কর্‌লে সেই ব্যবস্থা ক'রেই যেতে পারেন। তবে আপনার নিরাপত্তার জন্য ট্যাক্সির নম্বরটি আমাদের জানিয়ে যেতে পারেন, তা'তে আপনার কোনো ভয় নেই।

আমি বল্লাম, আমি একা, তাই অজানা ট্যাক্সিতে যেতে একটু ইতস্ততঃ কর্‌ছি।

সে বল্‌ল, ইতস্ততঃ করবার কোনো কারণ নেই, যে ট্যাক্সিগুলো এখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তা' সবই আমাদের চেনা, যে কোনো একটা ট্যাক্সিতে ক'রে আপনি যেতে পারেন, যতক্ষণ খুশি বেড়িয়ে-দেখ্‌তে পারেন, ট্যাক্সিতে মিটার আছে, সেই অনুযায়ী ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যেখানে খুশি সেখানে আপনি নেমেও যেতে পারেন, তারপর নূতন ট্যাক্সি

ক'রে আবার হোটেলে ফিরতে পারেন।

বলতে বলতে আমার সে সময়কার ট্যাক্সি ড্রাইভার নিজেই সেখানে এসে হাজির হ'লো। তা'কে দেখে অভ্যর্থনাকারিণী বলল, এর ট্যাক্সিতেই আপনি যেতে পারেন, ড্রাইভারটি ভাল ইংরেজিও জানে। ভারতীয় পর্যটকেরা কি দেখতে চায়, তাও সে ভালই বোঝে। আপনি তার ট্যাক্সিতেই ঘুরে আসতে পারেন।

আমি আর আপত্তি না ক'রে সেই ট্যাক্সিতে চ'ড়েই নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লাম।

ড্রাইভার গাড়ী চালাতে চালাতে বলল, এই শহরে তিন শ' মন্দির আছে। তার মধ্যে একেকটি মন্দির খুব পুরানো। আপনাকে সেই পুরানো মন্দিরগুলোতেই প্রথম নিয়ে যাচ্ছি।

মন্দিরগুলো অধিকাংশই বৌদ্ধ মন্দির, কয়েকটি হিন্দু মন্দিরও আছে। হিন্দু মন্দির অর্থে তা'তে বিষ্ণু কিংবা লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তবে কোন পদ্ধতিতে তাদের পূজার্চনা হ'য়ে থাকে তা বলা কঠিন।

এ' কথা হয়ত অনেকেই জানেন যে ব্যাঙ্ককে আকৃতির দিক থেকে পৃথিবীর কয়েকটি সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি আছে। তাদের বিভিন্ন রূপ ; কোনো মূর্তি ধ্যানী বা বিশাল উচ্চ, আবার কোনো মূর্তি শয়ান, কোনোটি বা অর্ধশয়ান। সবই প্রস্তর-নির্মিত। তাদের মধ্যে অর্ধশয়ান অবস্থায় বৃহত্তম যে বুদ্ধমূর্তিটি আছে, তা' দেখ্‌বার জন্য প্রথমই গিয়ে হাজির হলাম। বিশাল মন্দির চত্বর, তার চার পাশে নানা প্রকোষ্ঠ। দেখা গেল, একটি প্রকোষ্ঠ থেকে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর তত্ত্বাবধানে ভিক্ষুবেশধারী প্রায় ৪০।৫০টি কিশোর বালক বেরিয়ে এল ; মনে হ'লো, তারা বিদ্যার্থী, তবে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র নয়, বৌদ্ধ মঠের দীক্ষিত ছাত্রশিষ্য। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হ'য়ে গেছে, তার আচার-আচরণ আর আজ আমরা এখানে চোখে দেখতে পাই না ; এমন কি, এই প্রাচীন ধর্ম পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এখনো যে জীবন্ত থেকে মানব-সমাজকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে, তার কথা আমরা আজ আর কল্পনাও করতে পারি না। তাই ভিক্ষুবেশধারী তরুণ কিশোরদের যখন একজন প্রবীণ বয়স্ক ভিক্ষুর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে এক প্রকোষ্ঠ থেকে আর এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে দেখলাম, তখন আমার চোখের সামনে প্রাচীন ভারতের সমগ্র-রূপটি যেন

প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠ্‌ল। একদিন বৌদ্ধধর্ম যখন সারা ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল, সমাজের ধ্যানে কর্মে প্রাত্যহিক জীবনের আচরণে যখন বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ ব্যতীত আর কোনো লক্ষ্য ছিল না, তখনও বুঝি সঙ্ঘের তরুণ ভিক্ষুরা এমনই ভাবে সঙ্ঘপতির নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবন গঠন করত। তরুণ তাপসের যে ত্যাগমূর্তির মহিমময় রূপটি সেদিন আমার চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল, তার ভিতর দিয়ে আমি যেন প্রাচীন ভারতের অন্তর্লোকে পৌঁছে গেলাম। অনেকক্ষণ অভিভূত হ'য়ে সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম। দেখ্‌লাম, বৌদ্ধধর্ম এখনো যাদের জীবনে সত্য, তারা কি ভাবে জীবনের প্রত্যুষকাল থেকেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে। কেবলমাত্র মন্ত্রে দীক্ষা নয়, জীবনে তাকে সত্য বলে গ্রহণ ক'রে প্রত্যক্ষ ভাবে তা আচরণ করে। ভারত এই সত্যকে হারিয়েছে, তার কোনো প্রেরণাই তার অন্তরকে আজ আর স্পর্শ কর্‌তে পারে না।

সেই মন্দির চত্বরের পশ্চিম দিকে এক চার তলার মত উঁচু ব্যারাকের মত লম্বা ঘরে বিশাল বুদ্ধমূর্তি শয়ান অবস্থায় রয়েছে। বুদ্ধের মহানির্বাণের রূপটি বিশাল প্রস্তরে খোদিত ক'রে সেই মন্দিরে রক্ষা করা হ'য়েছে, তা' অন্য কোনো স্থানে নির্মাণ ক'রে এখানে এনে স্থাপন করা সম্ভব নয়। আমার মনে হ'লো, এখানেই কোনোদিন কোনো পাহাড়ের অংশ ছিল, তাই কেটে কেটে এই বিশাল প্রস্তর মূর্তি এখানেই উৎকীর্ণ করা হ'য়েছে; এই মূর্তি স্থানান্তরিত করাও কোনো মতেই সম্ভব নয়।

এই মূর্তির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের নিশ্চয়ই কোনো হিসাব আছে, কিন্তু আমি তা' যাচাই ক'রে দেখিনি। এই মূর্তির বিশালতার মধ্যে সামগ্রিক একটা আবেদন প্রকাশ পায়, তা' তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থের হিসাবের বাইরে। আমি কেবল মাত্র তার সেই দিকটিই লক্ষ্য করছিলাম। মূর্তিটির আগা গোড়া অর্থাৎ পা' থেকে মাথা পর্যন্ত সোনালি রঙের রাংতার পাত দিয়ে মোড়া। তা'তে সাধারণ ভক্তের কাছে মনে হ'তে পারে যে এই বিশাল মূর্তিটি সোনার তৈরী। দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণু মন্দিরের সামনে যে গরুড় স্তম্ভ থাকে, তা'র আপাদমস্তক যেমন রাংতার পাত দিয়ে মোড়া থাকে এবং তার ফলে তা'কে 'সোনার তালগাছ' বলে উল্লেখ করা হয়, এখানেও যেন সেই মনোভাবই কার্যকর হ'য়েছে। কিংবা একথাও কি মনে হ'তে পারে যে একদিন প্রাচীন শ্যাম দেশের ঐশ্বর্য যুগে এই বিশাল মূর্তিটি সত্য সত্যই

সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া মোড়া ছিল ? যে দিন এদেশের সার্বভৌম অধিপতিরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সে দিনের পক্ষে তা' সত্যও হ'তে পারে।

সেই বিশাল (collosal) বুদ্ধমূর্তিটি আমি তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার বার হেঁটে হেঁটে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। মূর্তির বিশালতা, যাঁর মূর্তি, তাঁর কালজয়ী বিশাল কীর্তিকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে লাগ্‌ল। এই দূর দেশ দু' হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে একদিন যা পেয়েছিল, তা'কে যে কি মর্যাদা দিয়ে এখনও পর্যন্ত রক্ষা ক'রে এসেছে, তা' ভাব্‌তে গিয়ে যেন আমি তার কূল-কিনারা পেলাম না। আমরা যে সম্পদকে পরিত্যাগ করেছি, এ' দেশ তাকে কি ভাবে রক্ষা ক'রেছে, তা ভাবতেও বিস্ময় বোধ হলো।

সেই মন্দিরের সাম্‌নে ব'সে কয়েকজন চিত্রকর বিশেষ এক ধরনের কি কাগজের উপর নানা হিন্দু দেবদেবীর চিত্র আঁকছিল ; তাদের মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, অনন্ত শয়নে বিষ্ণু এবং নানা আসনে উপবিষ্ট কয়েকটি বুদ্ধ এবং তাঁর শক্তির চিত্রও ছিল। বিদেশী পর্যটকেরা বহু মূল্য দিয়ে চিত্রগুলো আঁকবার সঙ্গে সঙ্গেই কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদের কোনো মর্মই বুঝ্‌তে পারবার কথা নয়, কেবলমাত্র কৌতূহল্ এবং কৌতুকের সঞ্চয় ব'লেই তা' নিয়ে তাদের বোঝা ভারি করছিল। আমি প্রতিটি চিত্রেরই মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারছিলাম, কিন্তু আমার বৈদেশিক মুদ্রার পুঁজি এত কম ছিল যে এত দাম দিয়ে তা' কিনবার আমার সাধ্য ছিল না। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে বিদেশীদের কাণ্ড দেখছিলাম। যাই হোক, তার ফলে দরিদ্র চিত্রকরদের ট্যাঁকে কিছু পয়সা আসছিল, এ' কথা সত্য। অবশেষে অনেক হিসেব, অনেক নিকেশ, অনেক বাচ-বিচার ক'রে তিনটি মার্কিন ডলারের বিনিময়ে (আমাদের ২৫.০০ টাকা) কম দামের সরস্বতীর একটি চিত্র কিনে নিলাম। শ্যামদেশের সরস্বতীর চিত্র ব'লে তার একটি বিশেষ মূল্য ছিল।

সেই বিশাল বৌদ্ধ মন্দিরের পবিত্র পরিবেশটি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে ইচ্ছা করল না, অথচ জান্‌তাম, ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে আমি অর্থ দণ্ড দিয়ে চলেছি।

কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি একটি ডালিতে ক'রে কতকগুলো টাট্‌কা ফুল নিয়ে সেখানে এসে হাজির। সে ইংরেজি বল্‌তে জানে না, তবু

আকারে ইঙ্গিতে আমাকে বোঝাতে লাগ্‌ল যে তার কাছ থেকে কিছু ফুল কিনে বুদ্ধমূর্তির পায়ে দেওয়া আমার উচিত। তার দেখাদেখি আর এক ব্যক্তি একটি প্রদীপ নিয়ে এসে হাজির হ'লো, সেও আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে প্রদীপটি জ্বালিয়ে আমার বুদ্ধমূর্তির সাম্‌নে দেওয়া কর্তব্য। আমি বুঝ্‌তে পারলাম, প্রাচীন ভারতের প্রতি আমার ভক্তি এবং বিশ্বাস যতই প্রগাঢ় হোক না কেন, আর আমার পক্ষে সেখানে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ফুলওয়ালা এবং প্রদীপওয়ালা উভয়কেই নিরাশ ক'রে আমি ধীরে ধীরে মন্দির চত্বর থেকে মন্দিরের বিশাল সিংহ দ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম। ফুলওয়ালা এবং প্রদীপওয়ালা আমার পিছন পিছন আস্‌তে লাগ্‌ল, আমি আমার ট্যাক্সিতে উঠে ব'সে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। এখানে উল্লেখ যোগ্য যে আমাকে ভারতীয় ব'লে চিন্‌তে পেরেই ফুল-ওয়ালা এবং প্রদীপওয়ালা আমাকে তাড়া ক'রেছিল, নতুবা কোনো বিদেশীকে তারা এজন্য উৎপাত করতে দেখ্‌তে পাইনি।

আরও অনেকগুলো পুরানো মন্দির দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে এল। আমাদের দেশে পুরানো মন্দির বল্‌তেই যেমন জঞ্জালের স্তুপে আচ্ছাদিত ধ্বংসস্তুপ বুঝায়, এদেশে তা' নয়। প্রত্যেকটি মন্দির যত পুরানোই হোক, তার চত্বর এবং প্রকোষ্ঠ থেকে গর্ভগৃহ পর্যন্ত তা'কে পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখা হয়। সেখানে সময়ে সময়ে প্রার্থনা, ধর্মালোচনা সভা, বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানে ধুমধামও হ'য়ে থাকে। জনসমাগমে মন্দিরগুলো সর্বদা কলরব-মুখর হ'য়ে উঠে। এই বিংশতি শতাব্দীতেও ধর্ম এবং তার আচার এই জাতির জীবনে সত্য এবং সক্রিয়। অনেক মন্দিরের সাম্‌নেই সারি সারি ফুলের দোকান, তা থেকে নারী ও পুরুষ ফুল কিনে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের দেবতাকে নিবেদন করে। তাই মন্দির-গুলো দেখ্‌লেই ভারতবর্ষের মন্দিরের কথা স্মরণ হয়, সে দেশ যে ভারত-বর্ষের মধ্যে নয়, তা' কিছুতেই মনে হয় না।

সেখানকার আরো একটি বিষয় অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রল। ব্যাঙ্কক শহরের মধ্যেও যে কোনো গৃহস্থ বাড়ীর বাইরের আঙ্গিনায় একটি উচ্চ বেদীর মত তৈরী করা। বেদীটি উচ্চতায় প্রায় এক মানুষ, কিন্তু প্রস্থে দেড় ফুটের বেশী নয়। বেদীর শীর্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র সিংহাসন অর্থাৎ দেবতার আসন। কিন্তু তা'তে কোনো দেবমূর্ত্তি নেই।

বাড়ী থেকে বেরোবার পথের ধারেই বেদীটি তৈরী করা হয়। যখনই যে কোনো ব্যক্তি, সে স্ত্রীই হোক কিংবা পুরুষই হোক, বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথাও যদি যায়, সে পথে পা দিবার আগে বেদীটির সাম্‌নে গিয়ে জোড় হাতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রার্থনা করে, তারপর নিকটেই রাখা কিছু ফুল সেই শূন্য সিংহাসনটির মধ্যে দিয়ে বাড়ী থেকে যাত্রা করে। প্রত্যেক বাড়ীর সাম্‌নেই এই ধরনের এক একটি বেদী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থাইল্যাণ্ডে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল, সমাজের মানুষ চোখের সাম্‌নে বৌদ্ধভিক্ষুদিগের ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পেত, তারই প্রভাব প্রত্যেকের মনে সঞ্চারিত হ'য়ে তাদেরও এক আধ্যাত্মিক আদর্শের সন্ধান দিত। এই সংস্কার ভারতবর্ষে বর্তমান কালে যেভাবে লুপ্ত হ'য়ে গেছে, থাইল্যাণ্ডে এখনো সেভাবে লুপ্ত হ'য়ে যায় নি। অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কেই এ'কথা বলা চলে না, এ' বিষয়ে দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারত থেকে অনেক রক্ষণশীল; সুতরাং মুসলমান প্রভাবিত উত্তর ভারতের আচার বিচার দেখে সমগ্র ভারত সম্পর্কে বিচার করা সমীচীন হয় না। তাই এই বিষয়ে থাইল্যাণ্ডের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে বরং দক্ষিণ ভারতের কতকটা ঐক্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তবে এক জায়গায় বৌদ্ধধর্ম এবং আর এক জায়গায় হিন্দুধর্ম তার অবলম্বন।

এ' দেশের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা বৌদ্ধধর্মের বিষয় কেবলমাত্র বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাসের বই থেকেই মুখস্থ ক'রে থাকে, তার যথার্থ রূপটি প্রত্যক্ষ করবার আজ আর সুযোগ পায় না। কিন্তু থাইল্যাণ্ডের সমগ্র সমাজ আজও বৌদ্ধধর্মের রূপটি চোখের সাম্‌নে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পায়, সেই জন্যই সেখানে প্রত্যেকেই তাদের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণে তার প্রভাব স্বীকার করে।

ব্যাঙ্ককে থাইল্যাণ্ডের রাজপ্রাসাদ, নানা সরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজোদ্যান, ইত্যাদি দেখবার পর ড্রাইভার বল্‌ল, এ'বারে চলুন আপনাকে একটি এখানকার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য দেখ্‌বার জিনিস দেখিয়ে আনি। সবে সন্ধ্যে হ'য়েছে, এখনো তা' দেখবার পক্ষে অসময় হ'য়ে যায় নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কি জিনিস্?

সে বল্‌ল, এখানকার ভাসমান বাজার। অবশ্য ইংরেজিতে বল্‌ল, floating market.

আমি একটু বিস্মিত হ'য়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, সে আবার কি জিনিস ?

সে বল্‌ল, দেখ্‌বেন চলুন। ব'লে সে তার গাড়ী চালিয়ে চল্‌লে।

ব্যাঙ্কক প্রাচীন শহর। বিশেষতঃ সেখানে আজো তিন শ' মন্দির এবং প্রত্যেক মন্দিরেই লোকজনের নিত্য যাতায়াত আছে, সমাজ-জীবনের সঙ্গে মন্দির এবং তার আচারও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে, সেখানে সেই শহরকে ইচ্ছা করলেও আধুনিক ক'রে তোলা যায় না। তবু যেখানেই সম্ভব হ'য়েছে, সেখানেই মার্কিনী আধুনিকতার স্পর্শ'ও কিছু না কিছু এসে গেছে। বিশাল হোটেলগুলো এবং তাদের আনুষঙ্গিক সব কিছুই উগ্র ভাবে আধুনিক। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মত এই যে হোটেলের জীবন এবং তার পরিবেশের সঙ্গে যেন থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীর কোনো অন্তরের যোগ কোনো ভাবেই সেদিন পর্যন্তও সৃষ্টি হ'তে পারেনি। হোটেলগুলোর পরিচালক অধিকাংশই বিদেশী এবং তা'তে কর্মরত যারা তারাও প্রধানতঃ চীনা; স্থানীয় অধিবাসী খুবই নগণ্য। সেজন্য এই প্রাচীন শহরে প্রাচীন জীবন-ধারা দীর্ঘদিন ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন চলে এসেছে। 'ভাসমান বাজার' তারই একটি।

ব্যাঙ্কক শহরটি সমুদ্র থেকে দূরে নয় এবং নদীর মত একটি সমুদ্রের ফাঁড়ি (creek) শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেছে। তার দুই তীর বাঁধানো। ফাঁড়িটির দু' ধারে সুসজ্জিত পণ্যবীথি এবং ফাঁড়ির জলেও অসংখ্য নৌকোয় ক'রে অগণিত দোকান পাট্ নানা পণ্য দ্রব্য দিয়ে সাজানো। ফাঁড়ির সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে ব'লে তার জল সর্বদা আন্দোলিত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পণ্যদ্রব্য বোঝাই নৌকাগুলোও আন্দোলিত হচ্ছে। তার মধ্যেই জলের উপরেই নৌকোতে ক'রে কেনাবেচা চল্‌ছে। কেনাবেচার সামগ্রীর মধ্যে অধিকাংশ ফল-মূল শাক-সব্জি এবং মাছ-মাংস। কাঠের তৈরী নানা শৌখিন দ্রব্যেরও সেখানে প্রচুর আমদানি দেখা গেল। সেই ভাসমান বাজার অবিশ্রাম দুল্‌ছে,—ক্রেতা দুল্‌ছে, বিক্রেতা দুল্‌ছে, পণ্যসামগ্রী দুল্‌ছে, সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার টানে অনবরত দুল্‌ছে, তার মধ্যে সবাই টাল সাম্‌লে নৌকোর উপর মাঝ-ফাঁড়িতে দাঁড়িয়ে বেচাকেনা করছে। ফাঁড়িটি বেশী প্রশস্ত নয়, ফাঁড়ির দুই তীরেও অসংখ্য বিপণি। ভারতের প্রাচীন শহরে যেমন চক বাজার, এ'ও যেন তাই, তবে এই চক বাজার স্থলে নয়, জলে।

ফলমূলের মধ্যে কলা আনারস নারকেল আরো কত কি, নৌকোয় নৌকোয় পাহাড়ের মত উঁচু স্তূপ ক'রে রাখা।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেখানে ব্যাঙ্ককের সাধারণ জনতার একটি পুরোপুরি ছবি পেলাম। স্ত্রীপুরুষের সেখানে নিঃশঙ্ক চলাফেরার মধ্যে সে দেশের সামাজিক এবং তাদের কেনাকাটার মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক দিকগুলোও চোখে পড়ল। এই বিশাল জনতার মধ্যে কোনো কলরব নেই, সবই যেন কেমন শৃঙ্খলার সঙ্গে চল্‌ছে। কেবলমাত্র ফাঁড়ির ঢেউগুলো যে মধ্যে মধ্যে বাঁধানো তীরের গায়ে এ'সে আছড়ে পড়্‌ছে, তার এক রকম শব্দ হ'চ্ছে। ক্রমে নৌকোয় নৌকোয় আলো জ্বলে উঠ্‌ল, ফাঁড়ির দুই তীরে মালার মত আলো জ্বলে ঝলমল করতে লাগ্‌ল। দুই তীরের পণ্যবীথিকায় নানা রকমের আলো জ্বলল, আলোয় আলোয় সব দিকে আলোর মায়াপুরী সৃষ্টি কর্‌ল।

সারাদিন রৌদ্রের তাপ দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিল, সেখানে সমুদ্রের হাওয়ায় যেন সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল। সারাদিনের ক্লান্তি অল্পক্ষণের মধ্যেই দূর হলো।

এ'বার তা' হলে ফেরা যাক, যদি রাত না হয়ে যেত, তা' হ'লে আরো ঘুরে দেখা যেত, ড্রাইভারটি সত্যি খুব ভালো লোক; কিন্তু রাত্রে অপরিচিত জায়গায় একাকী বাইরে থাকা ঠিক নয়। তবু হোটেলে ফির্‌তে রাত্রি ৮ টা হ'য়ে গেল।

আমার দুপুরে চীনা হোটেলের খাওয়া অত্যন্ত অতৃপ্তিকর হ'য়েছিল। হোটেলে ফিরেই যখন মনে হলো এ'বারও সেই খাবার ঘরেই রাত্রির খাবার খেতে যেতে হ'বে তখনই মনটা আবার বিরক্তিতে ভ'রে গেল। নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিয়ে হোটেলের বিশাল খাবার ঘরে ঢুকে এক কোণে একটি চেয়ারে চুপ ক'রে বসে রইলাম।

তরুণী পরিচারিকা খাদ্যতালিকা হাতে দিয়ে গেল, কোন জিনিসের কি স্বাদ, কি দিয়ে রান্না তা' জানিনা। খাদ্যতালিকা হাতে নিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম।

পরিচারিকাকে বললাম, আমি ভারতীয়, ভারতীয় খাদ্য কিছু দিতে পার দাও, আমি গোরু (beef) শূকর (ham) খাই না। মাছ, ভেড়ার মাংস দিতে পার।

সে জিজ্ঞেস কর্‌ল, ষাঁড়ের জিভ্‌ (tongue) ?

সর্বনাশ, বলে কি ? গোমাংস (beef) খাই না বল্লাম, বল্‌ছে ষাঁড়ের জিভ ? ষাঁড়কে কি এরা গোরু বলে মনে করে না ?

ক্ষুধায় এবং ক্রোধে আমার প্রায় কান্না এসে যাচ্ছিল। আমি একটু ধমক দিয়েই বল্লাম, গো-মাংস (beef) আমি খাই না বল্লাম, শুন্‌ছ না ?

সে বল্‌ল, গো-মাংস (beef) নয়, আমি ষাঁড়ের জিভের কথা বল্‌ছি।

আমি বল্লাম, ঐ একই হোল। তুমি অন্য কিছু দাও।

অবশেষে সে যে কি পরিবেষণ করল, আর আমি তা কি ভাবে গলাধঃকরণ করলাম, তা' আজ আর খুলে বল্‌তে পারব না।

শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরটিতে বেশ আরামে সারারাত্র ঘুমোলাম, সারা-দিনের ক্লান্তি ও অবসাদ সহজেই দূর হ'য়ে গেল। শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ব্যাঙ্ককের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখ্‌তে গিয়ে সেখানকার মশার উপদ্রবের কথা লিখেছিলেন, তাঁকে এবং রবীন্দ্রনাথকে মশারি টানিয়ে ঘুমোতে হয়েছিল, তা'তেও তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত হ'য়েছিল। আমিও তাঁদের লেখা পড়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম্‌, কিন্তু আজকের ব্যাঙ্ককে তা' ইতিহাস হয়ে আছে ; এমন কি, সেখানকার আজকের অধি-বাসীরা কল্পনাও কর্‌তে পারবে না যে ব্যাঙ্ককে সত্যিই কোনোদিন মশার উপদ্রব ছিল। মানুষের চেষ্টায় সব কিছুই হ'তে পারে।

বেশ সকালেই ঘুম থেকে উঠ্‌লাম। ভাবলাম, সকাল বেলায় একটু ঘুরে আসি, শহরের সকাল বেলার রূপটাও একটু চোখে দেখ্‌তে পাব, কাল দুপুরবেলা কর্মচঞ্চল ব্যাঙ্ককে যা দেখেছি, এখন হয়ত তার সে রূপ আর নেই। ভেবে হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিলাম, ভাবলাম, এ'বার আর ট্যাক্সি নয়, হেঁটেই যতদূর পারি ঘুরে আস্‌ব। সকালে হাঁটা আমার অভ্যাস ছিল।

শেষ রাত্রে হয়ত বৃষ্টি হয়েছিল, পথের উপর কোনো কোনো জায়-গায় জল জমে আছে, তবে আমাদের কোলকাতার মত বুক জল, এমন কি, হাঁটুজলও নয় ; সামান্য জল, তাও রাস্তার দু'ধারে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে বৃষ্টি যেন আশীর্বাদ বর্ষণ ক'রে দিয়ে গেছে, চার দিকটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।

দোকানপাটগুলো এখনো বন্ধ, সম্ভবতঃ ৮টার আগে খুলবে না, পথে

রিক্সা চল্‌তে আরম্ভ করেছে। দেখলাম, এক জায়গায় একটি তাজা ফুলের দোকান ব'সেছে, একটি রমণী নানা রকম ফুল সাজিয়ে নিয়ে ব'সে আছে। যেখানেই ফুলের দোকান, সেখানেই নিকটে মন্দির আছে বুঝ্‌তে হ'বে। আমিও চারদিকে তাকিয়ে মন্দির খুঁজ্‌তে লাগলাম, কাছেই একটি আধুনিক ধরণের মন্দির দেখ্‌তে পেলাম, যারা সকালে কাজে বেরুবে তারা সকালে এসেই মন্দিরে ফুল দিয়ে যায়। একজন মহিলা ফুল কিনে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ কর্‌ছে, আমিও তার পিছন পিছন চল্‌লাম।

চত্বর পার হ'য়ে গর্ভগৃহের দিকে গিয়ে দেখি মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। মনে হয়, সাম্প্রতিক কালে কেউ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মন্দিরের চেহারা পুরানো নয়, তবে বুদ্ধমূর্তিটি প্রাচীন হ'তে পারে। বুদ্ধ-মূর্তির সাম্‌নে সারি সারি প্রদীপ জ্বল্‌ছে। আমাদের দেশে দেবমূর্তির সাম্‌নে একদিকে যেমন নৈবেদ্যের থালা, আর একদিকে ভিক্ষার থালা থাকে, এখানে তা' নেই; এখানে নৈবেদ্যের থালাও নেই, ভিক্ষার থালাও নেই। এখানে পাণ্ডাও নেই, পুরোহিতও নেই। পুরোহিতের নির্দেশে বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র বলাও নেই। নহবৎও বাজে না। সব নীরব। কেবল প্রদীপ আর ফুল দিয়ে বেদীটি সাজানো। ফুল এবং ধূপের সুগন্ধে চারদিক ভরপুর। সেই পবিত্র পরিবেশে বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ প্রভাতে মনটি যেন আপনা থেকেই প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল।

দেবতার সাম্‌নে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে লোকের যাতায়াত দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। আমার পরিধানে ধুতি এবং পাঞ্জাবী, কেউ আমার দিকে তাকাল, কেউ তাকাল না। নীরবে দেবতার সাম্‌নে কেউ ফুল, কেউ প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে চ'লে যেতে লাগ্‌ল। ভারতের বৌদ্ধযুগের চিত্রটি আমার সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সম্বিৎ ফিরে এ'ল। ভাবলাম, এ'বার হোটেলে ফেরা উচিত। কিন্তু হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে অনেক দূর চলে এসেছিলাম, একটি রিক্সা ক'রে হোটেলে ফিরলাম। পথঘাট তখনো জনবিরল।

ঘরে ফিরে মনোরম স্নানাগারটিতে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। তারপর হোটেলের রেস্তরাঁতেই প্রাতরাশ খেয়ে বিমান-বন্দরে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম। আজ ১১ টার সময় জাকার্তার বিমান ধরতে হবে।

জাকার্তা

আজ ২৭শে আগস্ট ১৯৭১। বেলা ১১ টার সময় গরুড় বা ইন্দো-নেশিয়ান এয়ার ওয়েজের বিমানে ক'রে সিঙ্গাপুর হ'য়ে জাকার্তা পৌঁছবার কথা, তা' আগেই বলেছি। যথা সময়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার গাড়ী হোটেলে এ'সে আমাকে ব্যাঙ্কক বিমান-বন্দরে পৌঁছে দিল। গরুড় বিমান ব্যাঙ্কক থেকে ছেড়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই সিঙ্গাপুর পৌঁছুবে, সেখানে ঘণ্টা খানেক বিরতির পর জাকার্তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। ঠিক ক'রেছিলাম, যাবার পথে সিঙ্গাপুরে যাত্রা বিরতি করব না, বরং তার পরিবর্তে ফিরবার পথে দু' একদিন এখানে থাকব।

যথা সময়ে বিমানে ক'রে প্রথমেই সিঙ্গাপুরের দিকে যাত্রা ক'রলাম। বিমানে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত দু' একজন ভারতীয় যাত্রী ছিলেন বুঝতে পারলাম, কিন্তু কেউ জাকার্তা পর্যন্ত যাবেন কিনা তখনো বুঝ্‌তে পারিনি।

গরুড় বা ইন্দোনেশিয়ান এয়ার ওয়েজের বিমানগুলো প্রকৃতপক্ষে KLM বা রয়্যাল ওলন্দাজ বিমান সংস্থারই অংশ। ওলন্দাজের বিমান চালক এবং বিমান-পথ পরিচালনার খ্যাতি সর্বত্র। দেখা গেল, ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে চ'লে গেলেও সেখানকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক যতদূর সম্ভব রক্ষা করবার প্রয়াস পেয়েছে। অথচ অন্যান্য বিষয়ে ওলন্দাজ-দিগের চাইতে বর্তমানে সে দেশের উপর মার্কিন জাতির প্রভাব বেশী অনুভব করা যায়, সে কথা পরে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।

গরুড় এক ঘন্টার মধ্যেই প্রাচ্যের অন্যতম বিশাল বিমান বন্দর সিঙ্গা-পুরে পৌঁছে গেল। গরুড় নামটি আমার বড় পছন্দ। হিন্দু পুরাণে গরুড় বিষ্ণুর বাহন, পক্ষীরাজ, বিমানের পক্ষে এর চাইতে সার্থক নাম আর কিছুই হ'তে পারে না। তার উপর গরুড় জননীকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত ক'রেছিল। ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজের দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'বার পরই সে দেশে গরুড়ের জয়যাত্রা শুরু হ'য়েছে। সুন্দর তাৎপর্য। কিন্তু যে দেশে 'গরুড় পুরাণে'র জন্ম সে দেশের বিমান-সংস্থা একটি বিজাতীয় নাম গ্রহণ করেছে 'এয়ার ইণ্ডিয়া' বা 'ইণ্ডিয়ান এয়ার ওয়েজ'। আর যে দেশের এগার কোটি অধিবাসীর মধ্যে দশ কোটি মুসলমান, যার সঙ্গে 'গরুড়

পুরাণে'র আজ কোনো সম্পর্ক নেই, তার বিমান-পথের নাম হিন্দু পুরাণ থেকে নেওয়া গরুড়। আমরা ভারতবাসী হিসাবে গৌরব অনুভব করি, হিন্দু হিসাবে নয়। তা' যদি না হ'তো, তবে হিন্দু পুরাণের গরুড় ভারতের আকাশে না উড়ে ইন্দোনেশিয়ার আকাশে উড়্বে কেন? ইন্দোনেশিয়া জাতীয় ঐতিহ্যকে বিশ্বাস করে, তাই গরুড় তার ধর্মের প্রতীক না হ'য়েও তার জাতির প্রতীক হ'য়েছে। ধর্মের উপরেও জাতীয় ঐতিহ্যকে যে স্থান দিয়েছে, তার জাতীয়তাবোধের তুলনা নেই। তার আরো নিদর্শন সে দেশে গিয়ে পেয়ে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছি। তার সঙ্গে নিজেদের বার বার তুলনা ক'রে নিজেদের ছোট বলে মনে হ'য়েছে।

সিঙ্গাপুরে বিমান এক ঘণ্টা থাম্বে। বিমান থেকে নেমে বিমান-বন্দরের কর্মচঞ্চল রূপটি দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। Transit Card নিয়ে নির্দিষ্ট ঘুরে বেড়ানোর স্থানটুকুতে এসে পৌঁছলাম। হিন্দু উপনিবেশের যুগে স্থানটির নাম ছিল সিংহপুর, প্রকৃতপক্ষে স্থানটি ভারত মহাসাগরের সিংহদ্বার (Gateway of the East)। ইংরেজের বিকৃত বানানে তা' আজ সিঙ্গাপুরে পরিণত হ'য়েছে। চিরদিন ধ'রে শুনে এসেছি. সিঙ্গাপুর Tax-free City. অর্থাৎ সিঙ্গাপুরে জিনিসপত্র কিন্‌লে তা'তে কোনো শুল্ক দিতে হয় না, কিন্তু Lounge-এর নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যে দোকানগুলো ছিল, তাদের জিনিস-পত্র সত্যই যে কোনো রকম কর-মুক্ত, তা' মনে হ'লো না। বোধ হলো, বাজারের জিনিসের তাই হ'বে। সুতরাং স্থির করলাম, ফিরবার পথে যা কিছু হোক কেনা-কাটা করব। এখন শুধু দেখে দেখেই চক্ষু জুড়াই।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আবার গিয়ে গরুড়ে চড়্‌তে হ'লো। এবার যাত্রী বোঝাই বিমান ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার দিকে যাত্রা ক'রল। নীচের দিকে তাকিয়ে সিঙ্গাপুর বন্দরটিকে সমুদ্রের উপর ভাস্‌ছে বলে মনে হ'লো।

সিঙ্গাপুরের সীমানা ছাড়িয়ে গরুড় যখন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'চ্ছিল, তখন নীচের দিকে সমুদ্রের জলে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়্‌ল। তার কথা থেকে থেকে আজো আমার মনে হয়। নীচে সমুদ্রের জল স্থির, এতটুকুও তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নেই, তার মধ্যে ছোট ছোট কালো কালো বিন্দুর মত অসংখ্য দ্বীপ, দ্বীপের পরে দ্বীপ, দ্বীপের পাশে সারি সারি দ্বীপ, এ দিকে সে দিকে

বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট কেবলই দ্বীপ। সে দ্বীপের সংখ্যা যে কত, হয়ত আজ পর্যন্ত গুণে কেউ শেষ কর্‌তে পারে নি। দ্বীপগুলোকে যেন স্থির সমুদ্র-জলের উপর স্থির হয়ে বসা মাছির মত দেখাচ্ছে। মাছি, মাছি, মাছি, আর মাছি, ঝাঁকে ঝাঁকে কেবল মাছি। দ্বীপগুলোতে জনমানবের বসতি আছে কিনা তা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যায় না, থাকবার কথা নয়। হয়ত কোনো কোনো সময় বিশেষ কোনো প্রয়োজনে মানুষ সেখানে গিয়ে থাকে, তারপর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই ফিরে আসে। গভীর ভাবে লক্ষ্য কর্‌লে কোনো দ্বীপ থেকে ধোঁয়ার একটি সূক্ষ্ম সাদা রেখা আকাশের দিকে উঠে আস্‌তে দেখা যায়; মনে হয়, কেউ সেখানে আগুন জ্বালিয়েছে। কিংবা আপ্‌না থেকেই কোনো কারণে আগুন জ্বলেছে কি না তাই কে জানে। শুনেছি এই সকল দ্বীপের কোনো কোনোটির মধ্যে টিনের কারখানা কিংবা রবারের চাষ হয়, সাময়িক ভাবে সেখানে জনবসতি তখন গড়ে উঠে, কিন্তু সেখানকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে মানুষ সে দ্বীপ পরিত্যাগ ক'রে যায়। বেশী দিন মানুষ সেখানে থাক্‌তে পারে না; কারণ, নানা ব্যবহারিক অসুবিধা আছে। ইন্দোনেশিয়া নাকি এমনই ত্রিশ হাজার ছোট বড় দ্বীপের সমষ্টি। আমার ত মনে হয়, ত্রিশ হাজার সংখ্যাটি অনুমান-ভিত্তিক; প্রকৃত হিসাব তার কেউ কোনোদিন জান্‌তে পারবে না, এমনি ভাবেই দ্বীপগুলো নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে। কোনো কোনো দ্বীপকে আকাশ থেকে দেখা গেলেও সমুদ্র থেকে দেখা যায় না; কারণ, হয়ত জলের উপর তার খুব সামান্য মাথা জেগে আছে। বার বার ঢেউয়ের অন্তরালে চলে গিয়ে সমান জায়গা থেকে তা অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

গরুড় এক ঘন্টার মধ্যেই জাকার্তা বিমান-বন্দরে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে দেখি আমার এক বিপুল সম্বর্ধনার আয়োজন হ'য়েছে। আগের দিন ভারতের শিল্পীদল এসে পৌঁছেছিল, তাদের মুখেই সেখানকার কর্মকর্তারা শুন্‌তে পেয়েছিলেন যে আজ আমি এই বিমানে জাকার্তা পৌঁছব। কিন্তু তাদের কথার চাইতেও আর একজন যিনি সমস্ত সরকারী মহলে আমার আগমন-বার্তা প্রচার করেছিলেন, তিনি শ্রীযুক্ত সিংহ রায়, তাঁর কথা বলেছি, কোলকাতা থেকে আমার আজকেই জাকার্তা পৌঁছানোর কথা তাঁকে আগে তাঁর শ্বশুর জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী আমার ছাত্রী শ্রীমতী নন্দিতাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও বিমান-বন্দরে হাজির ছিলেন,

তিনিই সঙ্গে ক'রে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীকে আমাকে আনুষ্ঠিকভাবে অভ্যর্থনা করবার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হ'য়েছেন। ভারতীয় দূতাবাসের 'এয়ার এটাচি' (Air Attache) শ্রীযুক্ত সিংহ রায়ের সরকারী মহলেও বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তা পরেও অনুভব করতে পেরেছিলাম। অভ্যর্থনাকারী সরকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকেও একজন পদস্থ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বিমান থেকে অবতরণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে সকলে মিলে ভি, আই, পি লাউঞ্জে (V. I. P. Lounge) নিয়ে বসালেন। শ্রীযুক্ত সিংহ রায় আমাকে সকল সরকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পথে আমার কোনো কষ্ট হ'য়েছে কি না সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লেন। বাংলাদেশে তখন মুক্তি-সংগ্রাম চল্‌ছিল, পূর্ব বাংলার এক কোটি উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় এসে হাজির হ'য়ে তার অর্থনৈতিক জীবনে সঙ্কট সৃষ্টি করছিল। আমি কোলকাতা থেকে এসেছি শুনে তারা সবাই সে' কথা আমার কাছে জিজ্ঞেস কর্‌লেন। উদ্বাস্তুদের খাওয়া এবং থাকার কি ব্যবস্থা হ'য়েছে, তারা কি ভাবে আছে, তা' তাঁরা জানতে চাইলেন। আমিও সে সব সম্পর্কে বাংলা খবরের কাগজে যে সব বৃত্তান্ত পড়েছিলাম, তা সংক্ষিপ্ত ভাবে তাদের কাছে প্রকাশ করলাম। তারা এ' জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ব'লে মনে হ'লো।

আমি ভাবলাম, আমি ত কোনো মতেই ভি, আই, পি ব'লে গণ্য হ'বার যোগ্য নই, তবে এঁরা আমাকে যে ভি, আই পি-র সম্মান দিচ্ছে তা' কি আমাকে ভুল ক'রে? আমি ইন্দোনেশিয়ার সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিশ্ব রামায়ণ উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা-চক্রের একজন অংশগ্রহণকারী মাত্র। আমি কি ভি, আই, পি'র মর্যাদা পাবার যোগ্য? এ' প্রশ্ন বার বার আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল। এ'রা আমাকে ভুল ক'রে নি ত! প্রভাত মুখুয্যের 'বলবান জামাতা' গল্পটির কথা আমার মনে হ'লো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি বুঝ্‌তের পারলাম, এ'রা আমাকে ভুল করে নি, ভারত সরকারের প্রেরিত একজন অতিথি হিসাবে তাদের কাছে আমার ভি, আই, পি-র মর্যাদাই প্রাপ্য। আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসাবেও এখানে আসি নি, আমি যে কেউ হই না কেন, আমি ভারতের মত একটি দেশের আজ

প্রতিনিধি হ'য়ে এখানে এ'সেছি, সুতরাং আমার মর্যাদা রক্ষার অর্থ ভারতের মর্যাদার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন, আমার অমর্যাদার অর্থ ভারতের অমর্যাদা। এই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার যে প্রচলিত ধারা (protocal) আছে, তাই তারা আরোপ করছে, তাঁদের নিমন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় অতিথির যে মর্যাদা প্রাপ্য তাই তারা এখানে আমাকে দিচ্ছে।

যে সকল সরকারী কর্মচারী আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বিমান-বন্দরে উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে উচ্চ সামরিক কর্মচারীও কয়েকজন ছিলেন বলে আমি বুঝ্তে পেরেছিলাম। তার কারণ, তখন ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক শাসন চল্ছিল।

আমার আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা শেষ হ'য়ে যাবার পর শ্রীযুক্ত সিংহ রায় সংবেত সরকারী অভ্যর্থনাকারীদের বল্লেন, এবার আপনাদের সম্মানিত অতিথি ডক্টর ভট্টাচার্যের ভার আমি এবং আমার পত্নী গ্রহণ কর্তে চাই। এই বিষয়ে আমাদের প্রধান দাবি শ্রীমতী সিংহ রায় ডক্টর ভট্টাচার্যের ছাত্রী এবং তিনি তার কাছে থাকলেই তাঁর নিজের বাড়ীর মত সেবা-যত্ন এবং আপ্যায়ন লাভ করতে পারবেন। আমার এবং আমার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা যে এখনই আমরা তাঁকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাই। সেই-ভাবেই আমরা প্রস্তুত হ'য়ে এ'সেছি।

ভারতীয় দূতাবাস থেকে যিনি আমাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য এ'সেছিলেন, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত প্রতাপ। তিনি অন্ধ্র প্রদেশের লোক, অত্যন্ত বিচক্ষণ সরকারী কর্মচারী। তিনি শ্রীযুক্ত সিংহ রায়ের প্রস্তাব সমর্থন কর্লেন।

কেউ এই বিষয়ে আর আপত্তি কর্লেন না, কেবল একজন মন্ত্রী ব'লে দিলেন, আজ রাত্রি এগারটার সময় সুরাবইর বিমান ছাড়বার আগে তাঁকে বিমান-বন্দরে এনে পৌঁছে দিতে হবে। কিংবা যদি বলেন, আমরাও গাড়ী পাঠিয়ে তাঁকে আপনার বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে আস্তে পারি। কারণ, আজ রাত্রেই আমাদের সঙ্গে তাঁকে সুরাবই এবং সেখান থেকে গাড়ীতে ক'রে রামায়ণ উৎসব ক্ষেত্রের অনতিদূরে যেখানে তাঁর থাক্বার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে সেখানে নিয়ে যেতে চাই।

শ্রীযুক্ত সিংহ রায় বল্লেন, আপনাদের গাড়ী পাঠাতে হ'বে না। আমি তাঁকে যথাসময়ে পৌঁছে দিয়ে যাব।

মন্ত্রী এবং উচ্চ সরকারী কর্মচারিগণ সবাই আমার সঙ্গে একে একে করমর্দন ক'রে আবার দেখা হবে ব'লে বিদায় নিয়ে গেলেন। আমি শ্রীসিংহ রায়, শ্রীপ্রতাপ এবং শ্রীমতী নমিতার সঙ্গে বিমান-বন্দরের বাইরে এসে তাদের গাড়ীতে ক'রে তাদের বাড়ী রওয়ানা হ'লাম। দেখ্‌লাম, সরকারী অভ্যর্থনাকারীরা আমার জন্য যে একখানি বিশাল গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন, তা' শূন্য ফিরে গেল, কেবল একজন সামরিক কর্মচারী তার ড্রাইভারের পাশে ব'সেছিলেন। তখন মনে মনে ভাবলাম, হয়ত রাজ-ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করবার একটি সুযোগ আজ এইভাবে মাটি হ'য়ে গেল। কিন্তু পরে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম যে সেদিন সেই বিশাল গাড়ীটিতে ক'রে যদি আমার ছাত্রীর আতিথ্য পরিত্যাগ ক'রে রাজভবনে গিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি হ'য়ে থাকৃতাম, তা' হ'লে একটি সুন্দর পারিবারিক জীবনের মধ্যে যে পরম মাধুর্যটুকু উপভোগ ক'রেছিলাম, তার দুর্লভ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'তাম।

গাড়ীতে উঠে বসেই শ্রীমতী নমিতা তার মুখ খুল্‌ল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে এক প্রকার চুপ ক'রেই ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন স্যার? আমি ১৯৫৯ সনে আপনার ছাত্রী ছিলাম, তবে ভাল ছাত্রী ছিলাম না, প্রোফেসারদের কাছ ঘেঁষতাম না, কারণ, পড়া-শোনা ত ক'রতাম না, পাড়ার থিয়েটার আর নাচ-গান নিয়ে মেতে থাকৃতাম। এমন কি, শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাও দিই নি, তাই এম, এ পাশ করা আর হ'লো না, আর হবারও কোনো উপায় নেই। বিয়ে হ'য়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দেশছাড়া হ'লাম। এখন ত ছেলেপিলে নিয়ে সংসার করৃছি।

নমিতা এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে থাম্‌ল: আমি তার মুখের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে দেখে তাকে আমার ক্লাসে কোনোদিন দেখেছি কি না, তা' ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। কিন্তু কিছুতেই মুখটি মনে কর্‌তে পারলাম না। অবশ্য মনে করৃতে পারার কথাও নয়। সে আজ বারো বছরের কথা। আগে হয়ত সে আরো তন্বী ছিল, এখন চেহারায় সামান্য একটু গিন্নির ছাপ প'ড়ে গেছে। তথাপি তাকে এখনো সুন্দরীই বলা যায়। হয়ত এককালে সত্যই নাচ্‌ত, হয়ত ভালই নাচ্‌ত, সে বয়সে নৃত্যশিল্পী হিসাবে খ্যাতিও লাভ ক'রে থাকৃবে।

আমি বল্লাম, এত ছাত্রছাত্রীর সংস্পর্শে আমাদের আস্তে হয় যে সব সময় সব মুখ মনে ক'রে রাখ্‌তে পারি না। কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ছাত্রধারা' কবিতাটি পড়েছো তো। 'ব্যক্তি ডুবে যায় দলে, মালিকা পরিলে গলে প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে?' আমাদের সকলেরই একই অবস্থা। সেজন্য অনেক সময় খুব লজ্জা পেতে হয়। কারণ, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই তার অধ্যাপককে আজীবন শ্রদ্ধা করে; তিনি যে তাকে একদিন চিন্‌তেও পারবেন না, এই কথা জান্‌তে পারলে সে ব্যথা পায়, কিন্তু আমাদের উপায় কি বল। তবু তোমরা আমাদেরে যে ভুলতে পার না, তাই আমাদের শিক্ষক-জীবনের সব চাইতে বড় পুরস্কার। শিক্ষকদের সরকারের দেওয়া জাতীয় পুরস্কারের চাইতেও এই পুরস্কারের দাম অনেক বেশী। আমি 'জাতীয় পুরস্কার' পাইনি, কিন্তু এই পুরস্কারটি শিক্ষক-জীবনের গোড়া থেকেই পেয়ে আস্‌ছি।

শ্রীমতী নমিতা বল্ল, ভাল ছাত্রছাত্রীদের আপনারা নিশ্চয়ই মনে রাখেন। কিন্তু আমি ত আগেই ব'লেছি, আমি কোনোদিনই ভালো ছাত্রী ছিলাম না, শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাটাও দেওয়া হয় নি। কি ক'রে আমাকে মনে রাখ্‌বেন? তবু আপনাকে আমাদের মধ্যে এমনই ভাবে পাব, তা' কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি নি।

আমি বল্লাম, সে আমারও আনন্দের কথা।

জাকার্তা শহরটি বিরাট, বাড়ীঘরগুলো ঝক্‌মক্ ক'র্‌ছে, পথঘাট প্রশস্ত। একটা বিষয়ে সহজেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো। দেখলাম, দ্বি-প্রহরের প্রখর সূর্যালোকেও শহরটি আলোক-মালায় সজ্জিত, দিনের বেলায়ও পথের পার্শ্বে, পথের উপরে নির্মিত তোরণে নানা রঙের বিজলী বাতি জ্বলে বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় ঘটাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম, এ কি ব্যাপার? দিনের বেলায় এই আলোকসজ্জা কেন?

শ্রীসিংহ রায় বল্ল, হল্যাণ্ডের রানী জুলিয়ানা কিছুদিন আগে ইন্দো-নেশিয়ায় সফরে এসেছিলেন, একদিন তিনি এ' দেশের রানী ছিলেন, তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যই শহরটিকে আলোক-মালায় সজ্জিত করা হ'য়েছিল। সপ্তাহ খানেক হ'লো তিনি চ'লে গিয়েছেন, তা' সত্ত্বেও আলোক-সজ্জা তেমনই র'য়েছে। এই আলো তিনি এ' দেশে আসবার

আগে থেকেই দিবা-রাত্র জ্বল্‌ছে, কোনোদিন নেভে নি। কবে নিভ্‌বে, তা বল্‌তে পারি না। দেশব্যাপী এই বিশাল আলোক-সজ্জা অপসারণ করাও এক দুরূহ কাজ।

আমি বল্লাম, হয়ত ততদিনে আর এক দেশের নূতন কোনো রাজা কিংবা প্রেসিডেন্ট এসে প'ড়বেন, এগুলো তখন তাঁর সম্বর্ধনার কাজ করবে। তাঁর জন্য নতুন ক'রে ব্যবস্থা করবার কোনো প্রয়োজন হবে না।

শুনে সকলেই হেসে উঠল। আমি বল্লাম, এখানে বিদ্যুতের ঘাট্‌তি নেই ব'লেই তার অপচয় করতে হবে, তারো কোনো কথা নেই। যে কোনো জিনিসই অপচয় করা পাপ।

কিন্তু বোধ হয় প্রাচুর্যের দেশে অপচয় ব'লে কোনো কথা নেই।

মধ্যাহ্নের রৌদ্রে দিনের তাপমাত্রা ১২০ ডিগ্রির ওপর উঠে গিয়েছিল ব'লে মনে হ'লো। আমার চর্মপেটিকার মধ্যে আমার গরম জামা কাপড়-গুলোর কথা মনে হ'য়ে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'লো। এ'গুলোর বোঝা বৃথাই এখানে ব'য়ে বেড়াতে হবে দেখ্‌ছি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীসিংহ রায়ের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম। শ্রীপ্রতাপ ইতিপূর্বেই নিজের বাড়ীতে নেমে গিয়েছিলেন। তিনি জানালেন, আজ রাত্রের প্লেনে তিনিও আমাদের সঙ্গী হবেন।

শ্রীসিংহ রায়ের বাড়ীর গৃহসজ্জা অত্যন্ত মনোরম। ঘরগুলো শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। তার বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করা মাত্র শরীরের জ্বালা দূর হ'য়ে গেল, স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম।

শ্রীমতী মিনতি কাঁচের গ্লাসে ক'রে এক গ্লাস পানীয় আমার হাতে দিয়ে বল্‌ল, নিন, এটা একটু একটু ক'রে (sip) করুন। সদ্য গরম থেকে এসে-ছেন, শরীরটা বেশ হাল্‌কা হ'য়ে যাবে। তারপর স্নান ক'রে খাওয়া দাওয়া করুন। একটু বিশ্রাম করবার পর বিকালে আপনাকে নিয়ে শহরটা ঘুরে আস্‌ব। রাত্রেই ত আপনাকে আবার বেরোতে হবে।

আমি বল্লাম, তা' হবে। কিন্তু এটা হাতে কি দিলে?

সে বল্ল, কিছু খারাপ জিনিস নয়, আমি খুব পাত্‌লা করে দিয়েছি, একটু একটু ক'রে 'সিপ' করুন, শরীরটা ভাল লাগ্‌বে।

মিনতি আমার ছাত্রী, সে তার শিক্ষককে নিজের হাতে যা দিতে পারে, তা' আমার নিঃশঙ্ক চিত্তে খাওয়াই উচিত। তবু আমি ইতস্ততঃ

কচ্ছি দেখে বল্‌ল, আপনি ভয় পাবেন না, ও কিছু নয়, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এ' জিনিস আমি আমার ছেলে মেয়েদের হাতেও দিই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জিনিসটা কি?

সে বল্‌ল, কিছু নয়, হুইস্কি। আপনি একটু একটু ক'রে সিপ্‌ করুন। ভাল লাগ্‌বে।

আমি বল্লাম, মাথা ঘুরে পড়ে যাব না ত।

সে বল্ল, পড়ে গেলে ত আমরা আছিই। আপনি ভয় পাবেন না। গরমের জ্বালাটা আপনার কাটবে।

শ্রীযুক্ত সিংহ রায় পাশের ঘরে বোধ হয় বাইরের পোশাক ছাড়ছিল, সে তখনো ফিরে আসে নি। আমি অগত্যা মিনতির কথায় হাতে গ্লাসটি নিয়ে এক একবার সামান্য চুমুক দিতে লাগলাম। দেখলাম, পানীয়টি বড় বিস্বাদ। কিন্তু হাতের গ্লাসটি নামিয়ে রাখ্‌তে পারলাম না। বার বার চুমুক দিতে লাগলাম।

এমন সময় শ্রীযুক্ত সিংহ রায় এসে দ্বিপ্রাহরিক খাবার পোশাকে বৈঠকখানা ঘরে ঢুক্‌ল। সে আমার হাতে পানীয়ের গ্লাস দেখে মিনতিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মাষ্টার মশাইকে তুমি কি খেতে দিয়েছ?

মিনতি নির্বিকারে জবাব দিল, হাল্‌কা ক'রে একটু হুইস্কি।

সে একটু বিস্মিত হ'য়ে বল্ল, হুইস্কি?

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি খান?

আমি বল্লাম, খাই না, তবে মিনতি বল্‌ল। মিনতি এগিয়ে এসে তার স্বামীকে বল্‌ল, প্রচণ্ড গরম থেকে এই মাত্র এসেছেন, আমি ওঁকে একটু সিপ্‌ করতে দিয়েছি। শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।

সে বল্‌ল, তা হবে, তবে অভ্যাস না থাক্‌লে মাথা ঘোরাতে পারে, 'লাইট' ক'রে খেলে কিছু হবে না।

মিনতি যে-সমাজে বাস করে, সেখানে পানীয় জল আর হুইস্কিতে কোনো পার্থক্য নেই। এই জীবন এবং এই সংস্কারে সে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে, একদিন যে পারিবারিক জীবনের সংস্কারের মধ্যে সে মানুষ হ'য়েছিল, তা' যেন জীর্ণ খোলসের মত আল্‌গা হ'য়ে তার গা থেকে খসে পড়ে গেছে। সেইজন্য অতি সহজে নিঃসঙ্কোচে তার শিক্ষকের হাতে এক গ্লাস নিষিদ্ধ

পানীয়, তা যত 'লাইট' বা হাল্কাই হোক, সে তুলে দিতে পেরেছে। এই বিষয়ে তার নিঃসঙ্কোচ ভাবটি আমার কাছে বড় ভাল লেগেছে। এর ভিতর দিয়ে সে তার শিক্ষকের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেনি, যদি তা' ক'রেছে ব'লে আমি মনে ক'রতাম, তবে তা' আমি স্পর্শ ক'রতাম না। কিন্তু শিশুর সারল্য নিয়ে সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সরল ভাবেই কাজ করেছিল বলেই সব কিছু জেনেও আমি তা তার হাত থেকে নিয়েছিলাম। যদি আমি তা' ফিরিয়ে দিতাম, তা' হ'লে সে যে আঘাত পেত, তা' আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।

আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই পানীয় নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌লাম, বোধ হয় আরো একটু বেশীক্ষণ ধরে 'সিপ' ক'রে ক'রে শেষ করা উচিত ছিল।

আরামপ্রদ স্নানাগারে অনেকক্ষণ ধ'রে স্নান করার পর শরীরটা একটু বেশ হাল্‌কা বোধ হ'লো।

খাবার টেবিলে ব'সে মিনতি বল্‌ল, রান্না সব আমি আমার নিজের হাতে করি, তা' নয় ত উনি খেতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত সিংহ রায়ের বয়স খুব বেশী নয়, চল্লিশ কিংবা তার সামান্য কিছু বেশী হ'তে পারে। সুদীর্ঘ সুগঠিত দেহ, বৈমানিক হিসাবে যে দুঃসাহসিক কাজ তাঁকে কর্‌তে হয়, সেই তুলনায় চোখে মুখে বেশ একটি নির্ভীক স্বচ্ছন্দ ভাব। অথচ যে বিপজ্জনক দায়িত্ব তাঁকে তাঁর কর্মব্যাপ-দেশে পালন কর্‌তে হয়, তা' প্রতি মুহূর্তেই রোমাঞ্চকর। যুদ্ধের সময় বোমারু-বিমান নিয়ে গিয়ে শত্রুশিবিরে বোমাবর্ষণ ক'রে আবার নিরাপদে ফিরে আসার কি যে উল্লাস, তা সে খেতে খেতে কিছু কিছু আমাকে বর্ণনা ক'রে শুনাল। শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু আমার মনে হ'লো সে যে শত্রুশিবিরে বোমাবর্ষণ ক'রে নিরাপদে বার বার নিজের শিবিরে ফিরে আস্‌তে পেরেছে, সেই কৃতিত্বেই তার জীবনের সকল ভয় ও শঙ্কা দূর হ'য়ে গেছে। সেই নিঃশঙ্ক চিত্তের মধ্যে কোনো দিক থেকেই ভয়ের রেখা মাত্রও দাগ কাট্‌তে পারে নি। বাঙালী ছেলের এই অসাধারণ কৃতিত্বের কথা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠ্‌ল। যে জাতির যুবক জীবন-পণ ক'রে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌তে গিয়ে চরম দুঃসাহসিক কাজ কর্‌তে পারে, সেই জাতিকে ভীরু কিংবা ভেতো অপবাদ দেওয়া

যে কত অর্থহীন তা আমার এক একবার মনে হ'তে লাগ্‌ল।

সে বল্‌তে লাগ্‌ল, অনেকের ধারণা, যুদ্ধ আর আজকাল কোথায় হ'চ্ছে, তাই আমাদের জীবনে অবসর এবং আনন্দই বেশী, সঙ্কট অতি অল্পই। কিন্তু তারা জানে না যে আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাসের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষাকে সক্রিয় রাখ্‌তে হয়। যে-কোনো মুহূর্তেই যুদ্ধের প্রয়োজন হ'তে পারে, তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাক্‌তে হয়, তাই প্রত্যহই দুঃসাহসিক অভিযানগুলোর অভ্যাস করতে হয়। তখন অবশ্য বিমান-বিধ্বংসী কামানের কিংবা জঙ্গী-বিমানের ঘা খেতে হয় না, কিন্তু কসরৎ-গুলো সবই প্রতিদিনই করতে হয়। তাও যদি আপনি দেখেন, তবু আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌বে।

আমি বল্লাম, যার সাহস আছে ভগবান তার সহায় থাকেন, তিনি কদাচ ভীরুর সহায়ক নন। এর উপরই মানুষ জীবনে চরম দুঃসাহসিক কাজ কর্‌তেও এগিয়ে যায় এবং তাতে সাফল্যও লাভ করে।

সিংহ রায় ইন্দোনেশীয় বিমান-বাহিনীর তরুণ বৈমানিকদিগকে জঙ্গী-বিমান চালনায় শিক্ষা দিয়ে থাকে, ইন্দোনেশীয় ভাষা তাঁর আগেই জানা ছিল, সেই সূত্রে এই দায়িত্বটি পালন করবার সুযোগ পেয়েছে।

মিনতি এতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তার স্বামীর মুখের কথাগুলো শুন্‌-ছিল; মনে হ'লো, সেও তার স্বামীর সাহসিকতা এবং কর্মদক্ষতায় গর্বিতা। সে বল্ল, জানেন? বৈমানিকদের জীবনের কথা কেউ জানে না, অথচ তাদেরও পরিবার আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র-কন্যা আছে, বৃদ্ধ মাতা-পিতা আছে। স্বামীকে বোমারু-বিমানে যাত্রা করতে পাঠিয়ে দিয়ে তার ফিরে না আসা পর্যন্ত তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের প্রতিটি মুহূর্ত যে কি ভাবে কাটে তা' আমি আপনাকে খুলে বল্‌তে পারব না। আমার স্বামীকে পাকি-স্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কত রাত আমি এমনি পাঠিয়ে দিয়েছি, তারপর ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে সারা রাত যে আমার কি ভাবে কেটেছে, তা' আপনাকে কি ব'লব! আমাদের এই বেদনার কথা কেউ জানে না, আমরা এ যুগের কাব্যের উপেক্ষিতা।

বল্‌তেই তার গলার সুর আটকে এল, আর কথা বল্‌তে পারল না।

আমি বল্লাম, তোমাদের স্বামীরা সত্যকারের সাহস ত তোমাদের কাছ থেকেই পায়। তোমাদের সাহসই কি কম? তা নয় ত স্বামীকে

এমনিভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনেই বা কি ক'রে পাঠিয়ে দিতে পার? তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়েই, তারা এ' দুঃসাহসিক কাজে প্রেরণা পায়। যারা বাঙালী মেয়েদের এ' পরিচয়টুকু জানে, তারা কেবল মাত্র তারা কাঁদতেই পারে এ অপবাদ কখনই দিবে না।

মিনতির রান্নার সত্য সত্যই প্রশংসা করতে হ'লো; আমি বল্লাম, কাল ব্যাঙ্ককে একটা চীনা রেস্তরাঁতে যে কি খেয়েছি আর কি না খেয়েছি, তা বলতে পারব না, বোধ হয়, আরশুলা টারশুলা খেয়ে থাকব। আজকের খাবার খেয়ে মনে হ'লো, এ যেন দেশেই আছি, এ বিদেশ নয়।

মিনতি বল্‌ল, এ কথা সত্য, আমাদের দেশের সব জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। তবে একটু খুঁজে পেতে চিনে নিতে হয়। এ' দেশ ত ভাতেরই দেশ, তারপর দেশের মাছ, দেশের তরকারী সবই এখানে আছে, শুধু দেশের মত ক'রে রাঁধ্‌তে পার্‌লেই দেশের খাওয়া হ'লো।

আমি বল্লাম, আজ যে দেশের খাওয়া হ'লো সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই।

সিংহ রায় বল্ল, এবারে আপনি একটু বিশ্রাম করুন। বিকেলে গাড়ী ক'রে আপনাকে নিয়ে বেরোব। তার আগে আমার ছেলেমেয়ে দু'টোকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হবে।

সিংহ রায়ের একটি ছেলে একটি মেয়ে; মেয়েটি বড়, উপরের স্টাণ্ডার্ডে পড়ে, মেয়েটি ছোট, তার নীচে পড়ে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে লেখা-পড়া শিখ্‌ছে, তবে বাড়ীতে মাতাপিতার শিক্ষার গুণে বাংলাও মোটামুটি শিখেছে।

আমি বিছানায় শুয়ে দিবানিদ্রার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে পর্দা সরিয়ে কাঁচের মধ্য দিয়ে এক একবার বাইরের দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড রৌদ্র। পথে জনমানবের বিশেষ কোনো চলাফেরা নেই। কচিৎ এক একটি যাত্রী-বাস বড় সড়ক ধরে ছুটে চল্‌ছিল। তার শব্দ কানে আস্‌ছিল।

চারটের সময় তখনো প্রচণ্ড রোদ। সিংহ রায় বল্ল, চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি, আপনাকে নিয়ে অনেক দূর ঘুরে বেড়াব। মিনতি তার ছেলেমেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবে, তারাও একটু ঘুরে আস্‌বে।

দেশের বাইরে যে যত বড় উঁচু কাজই করুক না কেন, সে তার ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তা নিয়ে বড় বিব্রত হয়। এরা বিদেশের সমাজে যে ভাবে জীবনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে তা' নিয়ে নিজেদের দেশের সমাজে আবার ফিরে এলেও চলাফেরার দিক থেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। প্রত্যেক মাতাপিতারই কমবেশী এই দুশ্চিন্তা থাকে, কারণ, প্রবাসের কর্মস্থল প্রবাসই, তা' কখনো স্বদেশ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না। একদিন মাতাপিতাকে সে দেশ ছেড়ে আস্‌তে হয়। কিন্তু এসে তারা নিজেরা কতকটা নিজের দেশের সমাজের সঙ্গে এক রকম ভাবে মানিয়ে নিলেও যে ছেলেমেয়ের প্রবাসেই জন্ম হয়েছে, প্রবাসকেই নিজের দেশ ব'লে জেনেছে, সে কিছুতেই তা মানিয়ে নিতে পারে না। রায়-দম্পতীর মনেও অল্পবিস্তর এই দুশ্চিন্তা ছিল। তবু তাদের ছেলেমেয়েদের যথাসম্ভব দেশীয় আচার-আচরণেও তারা শিক্ষা দিচ্ছিল। তাতে ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি অবাঙ্গালী হ'য়ে ওঠেনি দেখ্‌তে পেলাম।

যাই হোক, বেলা চারটের সময়ই প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে সকলে মিলে গাড়ী ক'রে জাকার্তার রাজপথে বেরিয়ে পড়্‌লাম। এ বিষয়ে সিংহ রায়ের পরম উৎসাহ, নিজেই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চল্‌ল।

কিছু দূর গিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় একটা খালের মত চোখে পড়্‌ল। খাল খুবই সঙ্কীর্ণ, নৌকো চলাচলের উপায় নেই, তাকে একটা বড় 'ড্রেন' বল্‌লেও চলে। ড্রেনের জলের মত সে জল অপরিস্কার, নোংরাই বলা চলে, সেখানে শত শত স্ত্রীপুরুষ স্নান কর্‌ছে, কেউ বা কাপড় কাচ্ছে, কেউ বা গা রগ্‌ড়াচ্ছে।

সিংহ রায় আমাকে দেখিয়ে বল্‌ল, দেখুন কাণ্ডটা!

আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, এখানে এই নোংরা ড্রেনের জলে কি হ'চ্ছে? এত লোক মিলে?

সে বল্ল, স্নান হ'চ্ছে।

আমি বল্লাম, সে কি কথা? এই নোংরা জলে স্নান?

সিংহ রায় বল্‌ল, এই দেশের লোকের এইটে একটা অভ্যাস। হয়ত অসাধারণ গরমের দেশ ব'লেই হোক, কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, এখানকার সব শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষই দিনে দু'বার স্নান ক'রবেই। একবার সকালের দিকে, আর একবার বিকেলের দিকে।

জলের কোনো বাচবিচার ক'রবে না, জল হ'লেই হ'লো। এ জল অবশ্য শহরের ড্রেনের জল নয়, কোথাও কোনো নদীর সঙ্গে খালটির যোগ আছে, গ্রীষ্মকাল ব'লে এখন শুকিয়ে গেছে, বর্ষায় অনেক জল হয়, এই খালটি সকাল বিকাল এই অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি স্নানের জায়গা। দেখুন, নারীপুরুষ একত্রই নিঃসঙ্কোচে কি ভাবে এক সঙ্গেই স্নান করছে। খালে কোন ঘাট নেই, যে যে-দিকে পেরেছে নেমে পড়েছে, তারপর ঐ জলেই স্নান সেরে নিয়ে শুকনো জামা কাপড় প'রে যে যার স্থানে ফিরে যাচ্ছে। এই জাতি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা-প্রিয়, দারিদ্র্যের মধ্যেও এই স্বভাবটি তারা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার অভ্যাস ক'রেছে।

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, এই অপরিচ্ছন্ন জলে পরিচ্ছন্নতা আস্‌বে কোত্থেকে ?

সে বল্‌ল, এখানে এখন জলের অভাব, তাই ব'লে তারা তাদের অভ্যাস পরিত্যাগ কর্‌তে পারে না। এই জলেই তাদের অভ্যাস মত কাজ ক'রে যায়।

পরে আমি যখন পূর্ব যবদ্বীপে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন এক জন নিম্নমধ্যবিত্ত ইংরেজি জানা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম, আপনাদের দু'বেলা যেমন তেমন ভাবেই হোক স্নান করবার অভ্যাস কেন হলো বল্‌তে পারেন ?

তিনি বল্লেন, আমাদের জীবনের সব অভ্যাসই আমরা ভারতবর্ষ থেকে একদিন পেয়েছিলাম, তারই ধারা আজও আমরা রক্ষা ক'রে চল্‌ছি। আপনি ত নিশ্চয়ই জানেন যে ভারতীয়েরা নানা উপলক্ষেই দিনে রাত্রে কতবার নদীতে স্নান করে।

হায় ভারতবর্ষ! তোমার সম্পর্কে এখনো বাইরের লোকের কারো কারো এই ধারণা! তুমি যে আজ কোথায়, এই সংবাদও এরা রাখে না! আমি চুপ ক'রে রইলাম, তার ধারণায় আমি আঘাত করতে চাইলাম না।

প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে হল্যাণ্ডের রানী জুলিয়ানায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে যে বিজলীর দীপমালা জ্বালানো হ'য়েছিল তা' অনির্বাণ র'য়েছে। লাল সবুজ নানা রঙের বাল্‌বগুলোর ভিতর থেকে আলো সূর্যতেজ বশতঃ যে ক্ষীণ হয়ে জ্বলছিল, তা বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছিল। আমি বুঝ্‌তে পারলাম না সাম্রাজ্যবাদ দেশ থেকে দূর হ'য়ে যাওয়ার পরও এত রাজভক্তি কেন ?

আমি সিংহ রায়কে জিজ্ঞেস করলাম।

সে হেসে বল্‌ল, হয় ত তা' রাজভক্তির জন্য নয়। যে বিদেশী বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ররা সারা শহরময় এইভাবে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রদীপমালা সাজিয়ে তা' জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তারা এসে আবার তা' নিভিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত হয়ত তা এম্‌নি ভাবে দিবারাত্র জ্বল্‌তেই থাক্‌বে। এ' আলো জ্বালানোও যেমন সহজ ছিল না, নিভানোও তেমন সহজ নয়, তার চাইতে এখন জ্বল্‌তে দেওয়াটাই সহজ। তাই এগুলো জ্বল্‌ছে।

জাকার্তার রাজপথে এক বিচিত্র রূপের সাইকেল রিক্সা দেখ্‌তে পেলাম, পরে অন্যত্রও তা' দেখেছি এবং চ'ড়ে বিস্তর হাওয়া খেয়েছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে তা প্রথম দেখে একটু চম্‌কে উঠ্‌লাম। তা'তে চালকের আসন পিছনে এবং দু'জন পর্যন্ত যাত্রী সাম্‌নে বসে। অর্থাৎ আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। আমাদের দেশের সাইকেল রিক্সায় চালকই সাম্‌নে বসে এবং যে যাত্রী পয়সা দিয়ে তা'তে চড়ে সে চালকের পিছনে বসে। কিন্তু সেখানে তার এই ব্যতিক্রম দেখ্‌তে পেলাম।

আমি তা' দেখে ব'লে উঠ্‌লাম, দেখ্‌ছ, সাইকেল রিক্সাগুলো কি অদ্ভুত। চালক পিছনে ব'সে চালাচ্ছে, যাত্রী দু'জন সাম্‌নে ব'সে আছে।

সিংহ রায় বল্‌ল, এখানকার সাইকেল রিক্সাগুলো সবই এই রকম। আমি একবার এক রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম, এখানে এ'রকম নিয়ম কেন? সে বলেছিল, যাত্রীরা পয়সা দেবে, তারা সাম্‌নে ব'সে হাওয়া খাবে না? যে পয়সা পাবে সে কখনো সাম্‌নে ব'সে হাওয়া খেতে পারে? এ'রীতি আবার কোন দেশে আছে?

যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য এদেশের সাইকেল রিক্সাওয়ালাদের এই অভিনব ব্যবস্থার প্রশংসা না করে পারা গেল না।

গতকাল ভারতবর্ষ থেকে আমার সঙ্গেই কোলকাতা হ'য়ে যে দুটি শিল্পীদল জাকার্তায় এসে পৌঁছেছে, তারা আজ রাত্রেই আমার সঙ্গেই পূর্ব যবদ্বীপের রাজধানী সুরবই রওয়ানা হবার কথা। তারা কোথায় আছে জিজ্ঞেস কর্‌তে সিংহ রায় বল্ল, চলুন, তা' হ'লে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসি, তারা কখন বিমান-বন্দরে রওয়ানা হবে, তা' জেনে আসি।

সিংহ রায় বল্ল, কাল রাত্রে এখানকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শিল্পীদের

এক নৈশ-ভোজে আপ্যায়িত ক'রেছেন, আপনি যদি গতকাল আস্‌তেন তবে এই ভোজ-সভায় উপস্থিত থাক্‌তে পার্‌তেন, সেখানে অনেক বিশিষ্ট ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন।

আমি বল্লাম, তা' হোক, তবু গতকাল আমি ব্যাঙ্ককে যে আনন্দ পেয়েছি, এখানকার ভোজ-সভায় তা' পেতাম না।

যেতে যেতে এক বিরাট স্টেডিয়ামের কাছে এসে পৌঁছলাম। সিংহ রায় বল্ল, এখানে এই স্টেডিয়াঁমে আন্তর্জাতিক 'অলিম্পিক গেম' হ'য়ে গেছে, দেশ বিদেশের খেলোয়াড়ের দল এলে এখানে তাদের খেলা হয়, আর খেলোয়াড়ের দল এবং অলিম্পিকের সময় বিদেশী অংশগ্রহণকারী অতিথিদের থাক্‌বার জন্য নিকটেই কয়েকটা আটতলা বাড়ী তৈরী হ'য়েছে। তারই একটার মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদলকে থাক্‌বার জায়গা দেওয়া হ'য়েছে।

সিংহ রায় তার গাড়ী নিয়ে সেই বাড়ীর সাম্‌নে গিয়ে হাজির হ'লো। গাড়ী থেকে আমরা সবাই নেমে পড়্‌লাম, তারপর শিল্পীরা কোন্ ঘরে আছে সিংহ রায় তার সন্ধান কর্‌তে গেল।

মিনতিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এমন চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন? কোথায় কি দেখ্‌বার আছে, তা' আমাকে দেখিয়ে দাও, আমার কিন্তু শহরের চওড়া রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, হোটেল, রেস্তরাঁগুলো বেশ ভাল লাগ্‌ছে। জনতার চলাফেরার মধ্যে যেন বেশ একটু শৃঙ্খলাবোধ আছে।

মিনতি বল্ল, এখানকার লোকজন এত ভদ্র বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের যে আপনি তাদের সঙ্গে না মিশলে তা' বিশ্বাসই কর্‌তে পারবেন না। সব বিষয়েই শৃঙ্খলা রক্ষা করা এদের জন্মগত গুণ। তাই পথে ঘাটেও তা' লক্ষ্য করা যায়। তারা সবাই এই ব'লে গর্ব অনুভব করে যে তারা ভারতীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সেই জন্য তাদের স্বভাব উচ্চ কুলের মর্যাদা-সম্মত, সেই মর্যাদা রক্ষায় তারা সকলেই সচেষ্ট। বাস্তবিক এদের মত এত ভালোমানুষ আপনি কোথাও পাবেন না।

পরে সে' দেশে থাকবার কালে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার যে আরও সুযোগ পেয়েছিলাম, তা'তে এ'কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছিলাম। সিংহ রায় এসে জানাল, শিল্পীরা সব রাত্রির আহার শেষ ক'রে নিচ্ছে, তারপর বিমান-বন্দরে যাবার জন্য তৈরী হবে। হয়ত রাত্রি

১টার মধ্যেই তারা বিমান-বন্দরে পৌঁছে যাবে, কারণ, তাদের সঙ্গে অনেক লটবহর আছে।

আমি ভাবলাম, একবার সবার সঙ্গে দেখা করে আসি। কারণ, আমরা কোলকাতা থেকে একসঙ্গে রওয়ানা হ'য়েও আমি ব্যাঙ্ককে যাত্রা বিরতি ক'রে তাদের সঙ্গচ্যুত হ'য়েছিলাম, আবার যে ফিরে এসে তাদের সঙ্গী হ'তে চলেছি, সে কথা তাদের জানিয়ে আসি।

দুই দলের প্রায় সত্তর আশিজন শিল্পী এক সঙ্গে কলরব ক'রে বিরাট ভোজনাগারে ব'সে আহারে মত্ত হ'য়ে আছে। দাক্ষিণাত্যের কথাকলির দলটি নিরামিষভোজী, তারা স্বতন্ত্র ব'সে চুপ ক'রে খেয়ে চলেছে, উত্তর ভারতের দলে স্ত্রীপুরুষ প্রায় সমসংখ্যায় দুই-ই আছে, তাদের মধ্যেই উচ্চ কলরোল শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। খাওয়ার চাইতে খাদ্যের সমালোচনাই তাদের মধ্যে বেশী শোনা গেল।

আমাকে দেখবা মাত্র উত্তর ভারতীয় আমিষ দলটির সবাই আমাকে তাদের সঙ্গে খেতে বস্‌বার জন্য অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। মিনতি সবাইকে বল্‌লে, ইনি আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের বাড়ীতেই তাঁকে খাইয়ে নিয়ে বিমান-বন্দরে পৌঁছে দিব।

অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম, জাকার্তার পথে যে সকল যাত্রী-বাস চল্‌ছে তাদের গায়ে লেখা 'রামায়ণ ট্রান্সপোর্ট' (Ramayana Transport) বা রামায়ণ পরিবহন। আমি ব্যাপারটা স্পষ্ট কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে শ্রীসিংহ রায়কে জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কি? এই বাসগুলোর গায়ে রামায়ণ পরিবহন লেখা কেন? এগুলো কি রামায়ণ উৎসবের যাত্রীদের বহন করবার উদ্দেশ্যেই পথে যাতায়াত কর্‌ছে।

সে বল্‌লে, না তা' নয়। এখানকার পরিবহনের (Transport) নামই রামায়ণ পরিবহন। শহর এবং শহরতলীতে এই বাসগুলো যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে, যে রামায়ণ উৎসব উপলক্ষে আপনি এখানে এসেছেন, তার সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো আগে থেকেই এখানে চল্‌ছে।

আমি ভাবলাম, আমাদের রামায়ণের দেশে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে কোথাও কোনো রামায়ণ পরিবহনের নাম শুনি নি। তবে হনুমান পরিবহন হয়ত উত্তর ভারতে কোথাও থাকতে পারে, তবে তাও চোখে পড়ে নি।

শৈলনগর ত্রেতস, পূর্ব যবদ্বীপ

রাত্রি ১০ টার মধ্যেই গিয়ে আমারও বিমান-বন্দরে পৌঁছানো আবশ্যক, সেইজন্য সেখানে আর বিলম্ব না ক'রে সিংহ রায়ের বাড়ী চলে এলাম। মিনতি দুপুরেই রাত্রের খাবার রান্না ক'রে 'ফ্রিজে' রেখে দিয়েছিল, রাত্রি ৯ টার মধ্যেই খেয়ে দেয়ে বিমান-বন্দরে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌লাম। সস্ত্রীক সিংহ রায় আমাকে বিমান-বন্দরে পৌঁছে দিবে ব'লে স্থির হ'লো।

জাকার্তা থেকে পূর্ব যবদ্বীপের রাজধানী সুরবই বিমানে মাত্র ৪৫ মিনিটের পথ, সেখানে রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় বিমান থেকে নেমে আমাদের গাড়ীতে ক'রে আরো পঞ্চাশ মাইল পথ যেতে হবে। সেখানে ত্রেতস নামে মনোরম এক শৈল-নগরে আমাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'য়েছে। সেই নগরে পৌঁছানোর পথে যেখানে সমতল ভূমি শেষ হ'য়ে পাহাড়ের পথ আরম্ভ হ'য়েছে, সেখানে পাণ্ডান নামে ক্ষুদ্র একটি শহর। তাতেই এশিয়ার বৃহত্তম মুক্তাঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। রামায়ণ উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের রামায়ণ 'ব্যালে' বা নৃত্যনাট্য সেই বিশাল রঙ্গমঞ্চেই অনুষ্ঠিত হবার আয়োজন হ'য়েছে। আলোচনা-চক্রেরও উদ্বোধন এখানেই হবে, তবে তার পরবর্তী অধিবেশনগুলো প্রতিদিন সকালে এবং দুপুরে শৈল-নগরের একটি বিরাট হোটেলের মিলন-কক্ষে হবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। প্রতি রাত্রে পাণ্ডানের মুক্তাঙ্গনে দেশ-বিদেশের নৃত্যনাট্য দেখবার জন্য প্রতিনিধিদের সন্ধ্যার পর সরকারী ব্যবস্থায় একবার নিয়ে গিয়ে আবার অনুষ্ঠান শেষে ফিরিয়ে দিবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। পাশ্চাত্য কায়দায় তৈরী ত্রেত্‌স শৈল-নগরের তানজুঙ্ (Tandjung) নামক বিশাল প্রাসাদোপম হোটেলে আলোচনা-চক্র বসবার আয়োজন হ'য়েছিল।

মধ্য রাত্রে ভারতের দুই দলের একশত শিল্পীর সঙ্গে আমিও গিয়ে সুরবই বিমান-বন্দরে অবতরণ ক'রলাম। বিমান থেকে সেখানে নেমেই দেখ্‌তে পেলাম, সেখানে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হ'য়েছে। যাঁরা অভ্যর্থনা করতে এসেছেন, তাঁরা সবাই রাজধানীর উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, তাদের মধ্যে সামরিক কর্মচারীর সংখ্যাই অধিক। আমিই

ভারতীয় দলে সেদিন প্রবীণতম ব্যক্তি ছিলাম, আমি দলের অগ্রবর্তী হ'য়ে যখন অপেক্ষমান সম্বর্ধনাকারীদিগের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন প্রত্যেকেই হাতে ক'রে যে এক একটি ফুলের মালা এনেছিলেন, তা' আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর অন্যান্যদেরও এক একটি পুষ্প্‌স্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা করা হ'লো। একজন প্রধান বিশিষ্ট নাগরিক (মেয়র কি না আমার স্মরণ নেই) সবাইকে আমার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। আগেই ব'লেছি, তাদের মধ্যে সামরিক পদবিধারী ব্যক্তিই সংখ্যায় বেশী।

আমাদের জন্য গাড়ী অপেক্ষা কর্‌ছিল, আমরা ভি, আই, পি কক্ষে না গিয়ে সোজাসুজি গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম। আমার এবং ভারতের আর একজন প্রতিনিধি ডক্টর লোকেশচন্দ্রের জন্য একখানি বিরাট গাড়ী নির্দিষ্ট ছিল ব'লে মনে হ'ল। লোকেশচন্দ্র সেদিন তখনো এ'সে পৌঁছান নি, তাই গোটা গাড়ীটাই আমার ভাগ্যে জুট্‌ল। শিল্পীদের জন্য দু'টি ডি-ল্যাক্স বাস সেখানে অপেক্ষা কর্‌ছিল, তারাও গিয়ে বাসে নিজেদের আসন গ্রহণ কর্‌ল। আলোয় আলোকময় বিমান-বন্দর পার হ'য়ে গাড়ী বিস্তৃত রাজপথ ধ'রে দ্রুত বেগে পশ্চিম দিকে চল্‌ল। আমি লক্ষ্য করলাম, আমাদের গাড়ীর অর্থাৎ আমার গাড়ী ও শিল্পীদের বাসের আগে এবং পিছনে আমাদের রক্ষীরূপে কয়েকটি সামরিক গাড়ীও চলেছে। এমন সুরক্ষিত অবস্থায় আর কোনো দিন পথে যাত্রা করি নি। সব দেখে শুনে খানিকটা ভয় এবং খানিকটা বিস্ময় জন্মাল। কিন্তু মনের সে ভাব কারো কাছে প্রকাশ করবার মত সেখানে কেউ ছিল না।

ধীরে ধীরে গলা থেকে মালাগুলো খুলে আসনের উপর রেখে দিলাম, ভাবলাম এগুলো দিয়ে আর কি হবে? এগুলো এখানেই থাক। এখন কোথায় কেমন আশ্রয় জুটে, তা' দেখা যাক।

রাত্রির অন্ধকারে পথের দু'পাশে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, তবে মধ্যে মধ্যে ছোটখাট শহরে বিজলী আলোগুলো তখনো জ্বল্‌ছিল। দোকান-পাট বাড়ীঘর সব কিছুরই দ্বার রুদ্ধ, পথে জনমানব প্রায় নাই বল্‌লেই চলে।

সামরিক বেশধারী গাড়ীর ড্রাইভার গাড়ী চালাতে চালাতে এক একবার তার পার্শ্বস্থিত বেতার-যন্ত্রে কার সঙ্গে নিজের ভাষায় কি আলাপ কর্‌ছিল, তা' বিন্দুবিসর্গও বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম না, তার গম্ভীর সুরে দুর্বোধ্য

বেতার আলাপন শুনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় বুকটা দুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু বুঝ্‌তে পারলাম, এ' আশঙ্কা সবই অমূলক।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আলোকোজ্জ্বল একটি শহরে এসে পৌঁছলাম। ড্রাইভার একবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন বল্‌ল, পাণ্ডান; তারপর 'রামায়ণ' এই কথাটিও তার মুখ থেকে শুন্‌তে পেলাম, তা'তে আমার আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে এই স্থানটির নামই পাণ্ডান, এখানেই রামায়ণ উৎসবের অনুষ্ঠান হবে। ছোট্ট শহরটির আশে পাশে পথের দু'ধারে ছোট বড় অসংখ্য দোকান-ঘর তৈরী হ'য়েছে এবং সেই গভীর রাত্রে তখনো তৈরী হ'য়ে চলেছে। রাত্রি-জাগা লোকজনের ভীড়। দু' একটি প্রাচীর পত্রে 'First International Ramayana Festival' কথাটি লেখা দেখ্‌তে পেলাম।

গাড়ী সেখানে দাঁড়াল না। একটু ধীরে ধীরে চল্‌ল এইমাত্র, তারপর এবার পাহাড়ের চড়াইয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। বুঝ্‌তে পার্‌লাম, এবারে আমরা ত্রেতসের পথে পাহাড়ে চড়্‌ছি। সেখান থেকে পাহাড়ের উপরে ত্রেতস শহর ছ' মাইল পথ। গাড়ীকে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠ্‌তে হচ্ছে। শিল্পীদেরে নিয়ে বাস দু'টি আমার গাড়ীর পিছনে ধীরে ধীরে উপরে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড গরমের মধ্য থেকে একটু একটু শীত অনুভূত হ'তে লাগ্‌ল। সে শীত তখনো তীব্র নয়, কিন্তু বেশ আরামপ্রদ। ভাবলাম, আমার গরম জামাগুলোর এখানে সদ্ব্যবহার করা যাবে।

ক্রমে গাড়ী এসে শৈলনগরে প্রবেশ করল, পথের দু'ধারে বাড়ীঘর দোকান-পাট সব রুদ্ধ-দ্বার। শীত ক্রমে তীব্র হ'য়ে এলো। হাতের কাছে গরম জামা ছিল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই শীতে কাঁপুনি আরম্ভ হ'লো।

একটি বিরাট দ্বিতল প্রাসাদের সাম্‌নে এ'সে গাড়ী দাঁড়াল। বুঝ্‌তে পারলাম, আমরা গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছে গেছি। মুখ বার ক'রে দেখ্‌লাম সাম্‌নেই লেখা Hotel Tandjung, Tretes.

আমি গাড়ী থেকে নাম্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ছি, এমন সময় ভারতীয় দূতাবাসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মী শ্রীপ্রতাপ তাঁর বাস থেকে নেমে আমার কাছে এসে বল্লেন, আপনি এখানে নাম্‌বেন না, আপনার জন্য নিকটেই আর

একটি হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে, গাড়ী আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিবে, আমিও সেখানে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব। অন্যান্য শিল্পী ও তাদের কর্মকর্তা নিকটে আর একটা হোটেলে থাকবে।

ব'লে তিনি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন, তারপর ড্রাইভারকে কি বল্‌তেই সে গাড়ী ঘুরিয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ের পথে কিছুদূর গিয়ে আরও উঁচুতে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

শ্রীপ্রতাপ বল্ল, আপনার জন্য যে হোটেলটিতে থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'য়েছে, তা' আপনি খুব পছন্দ করবেন, আপনি অধ্যাপক লোক, হৈ-চৈ হট্টগোল নিশ্চয়ই আপনি ভালবাসবেন না, এই ভেবে এই আলাদা হোটেলটি আপনার জন্য আমিই ব্যবস্থা করেছি। এ'সব ব্যবস্থার ভার আমার উপরেই ছিল।

বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই আর একটি পাহাড়ের একটা চূড়ায় যেন এসে পৌঁছলাম। গাড়ী থেমে গেল। শ্রীপ্রতাপ বল্লেন, এ'বারে নামুন।

গাড়ী থেকে নেমে বুঝ্‌তে পারলাম, পাহাড়েব একেবারে চূড়োতে এসে পৌঁছেছি, সেই পাহাড়ের ঢালুর মধ্যে পাথরে গাঁথা ছোট ছোট কাঠের তৈরী বাড়ী, তার সর্বোচ্চ স্থানে যে বাড়ীটি সেটি পুরো'ই আমার জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রাখা হ'য়েছে। শ্রীপ্রতাপ বল্লেন, এই পুরো ছোট্ট বাড়ীটাই আপনার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, একটা পুরো বাড়ী দিয়ে কি করব? আমি একা মানুষ।

তিনি বল্লেন, এখানকার সব চাইতে শৌখিন হোটেলগুলো এমনি ছোট ছোট তিন ঘরের এক একটি বাড়ী। এক ঘরে বৈঠকখানা সাজানো, একটি ঘর শোবার জন্য, আর একটি ঘর স্নানের জন্য।

অনেকক্ষণ ধরেই শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপুনি আরম্ভ হ'য়েছিল, আমি বল্লাম, আর বাইরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, চলুন ঘরের ভিতরে গিয়ে বসি।

তিনি বল্লেন, এখন আর বস্‌ব না, আপনাকে ঘরে পৌঁছে দি, বিছানা তৈরী আছে, আপনি গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে আবার দেখা হবে।

ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে হোটেলের বৈঠকখানায় গিয়ে উঠ্‌লেন। আমি হোটেলের নামটি দেখে চম্‌কে উঠ্‌লাম, নিঃসংশয় হবার জন্য শ্রীপ্রতাপকে জিজ্ঞেস করলাম, হোটেলের নামটি কি ?

শ্রীপ্রতাপ বল্লেন, দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ? হোটেলের নাম 'হোটেল দীর্ঘায়ু'।

হোটেল দীর্ঘায়ু ?

তিনি পুনরাবৃত্তি কল্লেন, হ্যাঁ, হোটেল দীর্ঘায়ু।

আমি বিস্মিত হ'য়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এ কী নাম ?

তিনি বল্লেন, কেন ? সংস্কৃত নাম। আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না ?

আমি বল্লাম, বুঝ্‌তে পাচ্ছি সত্য, কিন্তু বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।

তিনি বল্লেন, আরো দেখুন, আরো শুনুন, ক্রমে বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে।

আমি হোটেলের নামটির রহস্য-বিষয়ে ভাবতে ভাবতে হোটেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছ থেকে ঘরের চাবি নিয়ে আমার নির্দিষ্ট ঘর বা ছোট বাড়ীটিতে গিয়ে ঢুকলাম। বৈঠকখানা ঘরটি দেখেই মনটা প্রসন্ন হ'য়ে গেল। কে যেন টাট্‌কা তাজা ফুল তুলে নিয়ে এসে টেবিলের উপর ফুল-দানিগুলো সাজিয়ে রেখে গেছে। দরজায় দরজায় রঙ্‌ বেরঙের জাপানি পর্দা। শোবার ঘরে নরম গদীর উপর আরামদায়ক বিছানা। আর দেরী করতে পারলাম না। শ্রীপ্রতাপকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

রাত্রি আর বেশী বাকি ছিল না, তাই ঘুম পাকা না হ'তেই ভোর হ'য়ে গেল, তখনো শুয়ে থাকবার কোনো বাধা ছিল না, কিছুক্ষণ অলসভাবে শুয়েও ছিলাম, কিন্তু ঘুম আর এলো না। চারদিক ক্রমে ফরসা হ'য়ে উঠেছে অনুভব করলাম, কাল রাত্রে চারদিককার অবস্থাটা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারি নি, শীঘ্র বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিকটা ভাল ক'রে দেখ্‌-বার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না। কোনো রকমে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিককার দৃশ্য দেখে একেবারে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হ'য়ে গেলাম।

বিস্তৃত পাহাড়ের ঢালু জুড়ে হোটেল দীর্ঘায়ু ছড়িয়ে আছে, অন্যান্য শহরের হোটেলের মত এক জায়গায় উঁচু হ'য়ে ওঠে নি। পাহাড়ের উচ্চ চূড়া থেকে তার নীচের কিছু অংশ জুড়ে তিন চারটি থাক্‌ কাটা। সর্বোচ্চ

থাকে অর্থাৎ পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় দু'টি তিন-ঘরা ছোট কাঠের বাড়ী; তার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে কাঠের বাড়ীটি, তা'তে আমি আছি। তার দিকে পিছন ফিরে আর একটি তেমনি বাড়ী, তা'তে আর কেউ আছেন। পরে অবশ্য তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল, তিনি ইন্দোনেশিয়ার গজমদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর লেখা একখানি ইংরেজি বই তিনি পরে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, তিনিও বিশ্ব রামায়ণ উৎসব উপলক্ষে এখানে এসেছেন এবং দুদিন ধ'রে এখানেই আছেন।

উপরের থাকে আর কোনো বাড়ী নেই। তারপরই তার নীচের বা দ্বিতীয় থাক্, সেখানে ছোট ছোট বাড়ী (cot)-র পরিবর্তে দু'টি লম্বা কাঠের ব্যারাকের মত। তার মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট কুঠরী, আর তাদের মাঝখানে এক একটা হলঘরের মত। আমি দেখ্‌তে পেলাম, গতকাল আমার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কথাকলি দলের যে শিল্পীরা এসেছিল, তারা সেখানে স্থান নিয়েছে। তাদের পরিচালক শ্রীযুক্ত ওয়ারিয়রের সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল, সুতরাং পরিচিত লোকদের সেখানে পেয়ে আমার অসহায়ের ভাবটা অনেকটা কেটে গেল।

সেই থাকের পূব দিক ঘেঁষে কয়েকটি কাঠের বাড়ী, কিন্তু তা অতিথিদের জন্য নয়; মনে হ'লো, তা'তে হোটেলের ধোপা, নাপিত, মালি এরা বাস করে, কিন্তু তাদের বাড়ীঘর এবং তার আশপাশ সুপরিচ্ছন্ন। এই সকল বাড়ীঘরের যেখানেই কিছু ফাঁক বা খালি জমি প'ড়েছিল, সেখানেই বাগান করা হ'য়েছে, শীতের নানা রঙের মৌসুমী ফুলে বাগানগুলো ভর্তি। তাদের ফাঁকে ফাঁকে লাল পাথর-কুচি ঢালা সরু সরু পথ।

তারপর সবের নীচের থাকে একদিকে হোটেলের উন্মুক্ত ও ঢাকা ভাসমান বৈঠকখানা (floating loung), তার একদিকে অভ্যর্থনাকারিণী (Receptionist)-র এক অর্ধবৃত্তাকার কাঠের টেবিল, সেখান থেকে একটি ছোট্ট কাঠের পুল পার হয়ে গেলেই বিস্তৃত ভোজনাগার। ভাসমান বৈঠকখানা যে সত্যই জলের উপর ভাস্‌ছে, তা নয়, মধ্যে একটি অল্পজলের পুকুরের মত জায়গা জুড়ে কাঠের খুঁটির উপর কাঠের পাটাতন ক'রে তার উপর চেয়ার দিয়ে সুন্দর বস্‌বার জায়গা করা হ'য়েছে। নীচে জলের মধ্যে লাল নীল সাদা কালো নানা রঙের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলের নীচে ছোট বড় নানা আকৃতির রাশি রাশি পাথর, সেগুলোতে প্রায় শেওলা ধ'রে গেছে। তারপর সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় যা, সেই ভোজনগারের পাশে তার পশ্চিম দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে এক বিস্তৃত swimming pool বা স্নানের জলাধার, জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, জলাধারের তলদেশ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুন্‌তে পাচ্ছিলাম,–বিলিতি বাদ্যের রেকর্ড বাজ্‌ছে, তা'তে সেই নির্জন প্রকৃতির নিঃস্তব্ধতাকে এক মধুর সঙ্গীতে ভরে দিচ্ছে। দূর বহুদূর নীল আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত ঘন বনানীতে আচ্ছন্ন, পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী। চারদিকে নিঃস্তব্ধ সবুজের সমারোহ। আমি পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় আমার ছোট্ট বাড়ীখানির অপ্রশস্ত সাম্‌নের বারান্দাটিতে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে সে অসামান্য দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। ইন্দোনেশিয়ার সুন্দরী শৈল-প্রকৃতিকে আমার বিমুগ্ধ মনের গভীর প্রণাম জানালাম।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে সেই দৃশ্যের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম, প্রাতরাশ খাবার জন্য তৈরী হয়ে নীচে যাই। ততক্ষণে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে রোদ উঠে সারা আঙ্গিনাটি ভ'রে দিয়েছে। শীতের তীব্রতার উপর প্রভাত সূর্যের ঈষৎতপ্ত প্রথম আলোটুকু যেন দেবতার আশীর্বাদের মত গায়ে মুখে এসে প'ড়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শীতের পোশাক প'রে খোলা বৈঠকখানার উন্মুক্ত জায়গাটির উপর সাজানো সারি সারি শূন্য চেয়ারগুলোর একটিতে এসে ব'সে রৌদ্রের উত্তাপটুকু উপভোগ কর্‌তে লাগ্‌লাম। বিলিতি বাদ্য ভোর থেকে বাজ্‌তে আরম্ভ ক'রে ক্রমাগত মৃদু সুরে বেজেই চলেছে, মুহূর্তের জন্যও তা'তে বিরতি হচ্ছে না, তা' দিয়ে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশটির উপর যেন এক সুরের আবরণ রচনা করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীওয়ারিয়র কথাকলি দলের অন্ততঃ ত্রিশজন শিল্পীকে নিয়ে প্রাতরাশের জন্য সেখানে এসে হাজির হ'লেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সব নিরামিষাহারী ?

তিনি বল্লেন, সেই ত আমাদের বিপদ হ'য়েছে। এখানে শুন্‌ছি হোটেলে শূকর-মাংস (ham), গো-মাংস দু-ই রান্না হয়। আমাদের শিল্পীরা মুরগী (Chicken) কিংবা ডিম পর্যন্ত খায় না। সবাই ব্রাহ্মণ কি না !

মনে মনে বল্লাম, হায়, আমিও ত ব্রাহ্মণ-সন্তানই ছিলাম, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ' আশঙ্কা তার নাই কেন? বোধ হয়, বাঙ্গালী যে ব্রাহ্মণ হ'তে পারে, এ'কথা তারা জানে না; তারা জানে, বাঙ্গালী সাহেব হ'তে পারে, কিন্তু কদাচ ব্রাহ্মণ নয়।

আমি বল্লাম, তাই ত এখন কি উপায়? তিনি আমার কথায় কোনো জবাব না দিয়ে ভোজনশালার দ্বারপথ দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পীরাও সেখানে গিয়ে প্রবেশ করল। আমি সেখানেই বসে রইলাম, শীতের সকালে আরামদায়ক কোমল রৌদ্রটুকু আমার মুখে ঈষদুষ্ণ স্নেহের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

শুধু পাঁউরুটি আর মাখন দিয়ে প্রাতরাশ শেষ ক'রে কথাকলির শিল্পীরা বিরস বদনে ভোজনাগার থেকে বেরিয়ে এল। ঘরে ফিরবার পথে শ্রীওয়ারিয়র আমার মুখের সামনে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি নেড়ে এই ব'লে নিরাশ ক'রে গেল, আপনারও খাবার সেখানে কিছু নেই।

ডিম এবং 'চিকেন' থাকা সত্ত্বেও যে আমার খাওয়া কেন জুটবে না, তা খেতে ব'সে গিয়ে বুঝ্‌তে পারলাম। প্রাতরাশ করতে এসে দু'জন ইন্দোনেশিয়ান দেখ্‌লাম, এক থালা ভর্তি ক'রে রঙিন ভাত খেল। সেই ভাতের মধ্যে মাংসের টুক্‌রো ছিল এবং সে মাংস যে আমাদের পক্ষে পবিত্র মাংস ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। পাঁউরুটি হোটেলে খুব সুলভ নয়, যা কিছু হোটেলের সংগ্রহে ছিল, তা ইতিপূর্বেই কেরলের কথাকলির দল নিঃশেষ ক'রে গেছে, তাদেরও শেষ পর্যন্ত কুলোয় নি, আমার জন্য কিছু আর অবশিষ্ট নেই। হোটেলের পরিচারক (পরিচারিকা নহে) আমি ভাত খাব কি না জিজ্ঞেস করল।

কি সর্বনাশ! সেই 'নিষিদ্ধ' মাংস দিয়ে রান্না করা ভাত? তার চাইতে উপোস থাকা ভাল!

আমি বল্লাম, আমি ভাত চাই না, 'চিকেনে'র কোনো কিছু থাকে দিতে পার।

বল্ল, 'চিকেন ফ্রাই' আছে। বল্লাম, তাই দাও। তারপর এমন এক মাংসপিণ্ড একটি থালায় ক'রে আমার সামনে এনে হাজির করল যে তা' আমি আমার দাঁত দিয়ে ছিঁড়্‌তে পারলাম না, ছুরি কাঁটা দিয়ে কাটতে পারলাম না, তার হাড় থেকে মাংস কোনো রকমেই আলাদা কর্‌তে

পারলাম না। এর নাম 'চিকেন ফ্রাই' ?

পরিচারকেরা ইংরেজি জানে না, সুতরাং মনের দুঃখ কা'কে কি ভাবে জানাই। আমাকে উদ্ধার করবার জন্য শৈবলিনীর মত প্রতাপের কথা বার বার স্মরণ করতে লাগলাম।

অবশেষে বল্লাম, আমাকে এক গ্লাস দুধ দাও। তাড়াতাড়ি খানিকটা গুঁড়ো দুধ গরম জলে গুলে দুধের চাইতে চিনির পরিমাণ বেশি দিয়ে আমার সামনে এনে ক্ষিপ্র হস্তে পরিবেষণ করল।

ডাক্তারের পরামর্শে চিনি খাওয়া আমার বারণ। মুখে দিয়েই বুঝতে পারলাম, তা'তে দুধের বিন্দুমাত্রও স্বাদ নেই, যে টুকুন স্বাদ মুখে লাগছে তা' চিনির। স্মরণ হ'লো যবদ্বীপে চিনির উৎপাদন 'সারপ্লাস' বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হ'য়ে থাকে। অনেক কষ্টে আমাকে বুঝাতে হলো, আমি চিনি ছাড়া দুধ খাব। সবাই আকাশ থেকে পড়ল, যেন আমি উপহাস করছি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা হ'লো।

'প্রাতরাশ' শেষ ক'রে আবার উন্মুক্ত স্থানটিতে এসে চুপ ক'রে বসলাম। রৌদ্রের তেজ কিছু কিছু ক'রে বাড়ছে, কিন্তু তবুও অসহ্য বোধ হ'চ্ছে না, আমি চোখ বুজে সেই রৌদ্রের তাপটুকু সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম।

এমন সময় শ্রীপ্রতাপ এসে হাজির। হাতে একটা বেশ বড় ফলের ঝুড়ি। তা'তে কমলালেবু, আপেল, কলা, আঙ্গুর ভর্তি। বল্লেন, এটা আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি, এটা কাছে রাখবেন, কারণ, হোটেলের খাওয়া দাওয়া যে কি হবে আমি বুঝতে পারছি না।

আমি বল্লাম, আমি এরই মধ্যে খানিকটা বুঝতে পেরেছি। ফলের ঝুড়িটার সত্যই প্রয়োজন হবে, ঘরে রেখে যান, ফুরিয়ে গেলে সংবাদ নিবেন।

শ্রীপ্রতাপ হাসতে লাগলো, বললেন, কেন কি হ'য়েছে ? আজ প্রাতরাশ বুঝি মনোমত হয় নি। আমি আপনার জন্য ভাবি না ; কারণ, আপনি সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরে এসেছেন, কিন্তু কথাকলি দলের কথাই আমি বেশী ক'রে ভাবছি। তাদের ত নিরামিষ ছাড়া কিছুই চলবে না। এই মাত্র জানিয়ে দিল যে তাদের দই চাই। তা' হলেও তাদের চলতে পারে। কিন্তু দই ত এখানে নেই। আমি দুধ যোগাড় ক'রে দিব ব'লেছি, দই তারাই পাতবে। আপনি একটু বসুন, ফলের ঝুড়িটা আপনার ঘরে রেখে এসে

আপনাকে নিয়ে এখন ডক্টর শ্রীমতী বাৎস্যায়নের কাছে যাব, শুনেছি তিনি নাকি খুব রেগে গেছেন। কাল রাত্রে তাঁর ঘুম হয় নি।

আমি বল্লাম, সে কি?

তিনি বল্লেন, আমি ঝুড়িটা রেখে আসি, তারপর সব বল্‌ব।

আমি তাকে পিছু ডেকে বল্লাম, দুটো কলা ওখান থেকে দিয়ে যান, খাই। প্রাতরাশটা, বুঝ্‌তেই ত পাচ্ছেন, মনোমত হয় নি।

ঝুড়ি থেকে ২।৩ টা কলা তুলে নিয়ে সেখানে ব'সেই খেতে লাগ্‌লাম, খোসাগুলো যেখানে সেখানে ফেলে জায়গাটা নোংরা কর্‌তে চাইলাম না, পকেটের মধ্যে পুরে রাখ্‌লাম; ভাবলাম, কোনো 'ডাস্টবিন,' পেলে ফেলে দিব। বিদেশে গেলে আপনা থেকেই আমরা সভ্য ভব্য হ'য়ে যাই, দেশে এলেই সে চৈতন্য লুপ্ত হ'য়ে যায়। ফলের ঝুড়িটা আমার ঘরে রেখে শ্রীপ্রতাপ আমার কাছে ফিরে এলেন। এসে প্রথমেই বল্লেন, কাল রাত্রে এক কাণ্ড হ'য়েছে, চলুন যেতে যেতে বলি, ডক্টর বাৎস্যায়ন তাঁর দল নিয়ে কি অবস্থায় আছেন একবার দেখে আসি।

তিনি একটা গাড়ী সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে তা'তে চ'ড়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। উৎরাই পথে কিছুক্ষণ নীচে নেমে গাড়ী একটা পাহাড়ের মোড় ঘুরল, তারপরই চোখে পড়্‌ল গত রাত্রের হোটেল তানুজুং, তার আশেপাশে অনেক বাড়ীঘর, আর আধুনিক কায়দায় সাজানো নানা জিনিসের দোকানপাট। কতকটা সমতল ভূমির উপর সে-গুলো স্থাপিত। সেখান থেকে আরও একটু নীচে নেমে একটা লম্বা কাঠের ব্যারাকের মত বাড়ীতে গোয়ালিয়রের লিট্‌ল ব্যালে গ্রুপকে থাক্‌তে দেওয়া হ'য়েছে। সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেই শ্রীযুক্তা বাৎস্যায়ন অভিযোগের সুরে তাঁদের থাক্‌বার অব্যবস্থার কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। কি ভাবে কাল রাত্রের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মাত্র একখানি ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে তিনি যে রাত কাটিয়েছেন, সে কথা উল্লেখ ক'রে বার বার তিনি ক্রুদ্ধ অভি-যোগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। শ্রীপ্রতাপ অত্যন্ত সহিষ্ণু ব্যক্তি। সব দোষ নিজের মাথায় নিয়ে অভিযোগগুলো নিজেই হজম ক'রে নিলেন এবং ব্যবস্থার উন্নতি হয় কি না, তা দেখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে নিয়ে সেখান থেকে বিদায় হ'লেন। গাড়ীতে উঠে আমাকে বল্লেন, দেখুন, আমার কিংবা এদেশের কারো কোনো দোষ নেই। দোষ বরং তাঁর নিজেরই। কারণ,

পাঁচ দিন আগে থেকেই এখানে অভ্যাগতদের জন্য ক্যাম্প খোলা হ'য়েছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশেরই নিমন্ত্রিত শিল্পীসংস্থাগুলো দল-বল নিয়ে হাজির হ'য়ে গিয়ে ভাল ভাল বাড়ীঘর বিছানা-পত্র দখল ক'রে নিয়েছে। ভারতের দু'টি দলই এসেছে একেবারে শেষের দিন, তাই বাধ্য হ'য়ে তাদের থাকবার ব্যবস্থা সব চাইতে নিকৃষ্ট হ'য়েছে। তবে ছেঁড়া কম্বলগুলো বদ্‌লে দেওয়া ছাড়া আমি যে আর কিছু কর্‌তে পারব, তা' মনে হয় না। কারণ, সব জায়গা আগে থেকেই ভর্তি হ'য়ে আছে। অতি কষ্টে কথাকলি দলকে আমি ওদিকে সরিয়ে নিয়েছি।

আমি আমার নিজের জন্য একটি মনোমত স্থান পেয়ে গিয়ে আর কারো জন্য কোনো উদ্বেগ প্রকাশ কর্‌তে গেলাম না। আমাকে একটি চমৎকার হোটেলে স্থান দেবার জন্য শ্রীপ্রতাপকে আমি ধন্যবাদ জানালাম।

তিনি বল্লেন, ওটা আপনার প্রাপ্য ; ডক্টর লোকেশচন্দ্র কাল রাত্রে এলেন না, আজ এলে তাকে যে কোথায় স্থান দিব, বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। সব হোটেলগুলোই এখানে ভর্তি হ'য়ে গেছে।

গাড়ী ক'রে আঁকাবাঁকা পথে সুন্দর শৈলনগরটি ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌-লাম। শ্রীপ্রতাপ ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয় দূতাবাসে অনেক দিন থ'রেই জন-সংযোগ অধিকর্তা (Public Relations Officer) রূপে কাজ ক'চ্ছেন। এসব জায়গায় তিনি অনেক বার যাতায়াত ক'রেছেন, পথ-ঘাট বাড়ী-ঘর তাঁর সবই চেনা। কোন্ কোন্ দেশের কোন্ নিমন্ত্রিত অভ্যাগত-দল কোন্ হোটেলে আছে, তা' আমাকে দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। শহরটির প্রায় সর্বত্রই গাড়ী চল্‌বার মত রাস্তা আছে। পরিচ্ছন্ন পথঘাট, ছবির মত সাজানো কাঠের বাড়ীঘর, জানালায় জানালায় রঙ বেরঙের জাপানি পর্দা, সামনে ছোট ছোট মৌসুমী ফুলের বাগান। কোনো কোনো বাড়ীর গায়ে লতানো গোলাপ, এতক্ষণে সারা শৈলনগরের উপরে মধ্যাহ্ন সূর্যের ঈষত্তপ্ত রৌদ্রটুকু এসে পড়েছে, তা'তে শহরটির বাড়ীঘর, গাছপালা বাগান যেন ঝলমল কর্‌ছে।

শহরটি বড় নয়, ঘুরে বেড়াতে খুব বেশি দেরী হ'লো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই হোটেল দীর্ঘায়ুতে ফিরে এলাম। এসেই দেখ্‌তে পেলাম, স্নান-সরোবরে (Swimming Pool) স্নানার্থী বিভিন্ন বয়সী নরনারীর ভীড় জমে গেছে। বাইরের লোকও টিকিট ক'রে সেখানে স্নান করবার জন্য

আস্‌ছে। হোটেলের ফটকের সামনে তাদের গাড়ীগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে র'য়েছে। সেখানেই হোটেলের বাইরের ফটকের কাছে একটি ফলের বাজারও ব'সে গেছে, তা'তে কলা, কমলালেবু, আপেলের প্রচুর আমদানি।

৩১ শে আগস্ট সন্ধ্যা ৬ টার সময় পাণ্ডানের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে আনুষ্ঠানিক ভাবে রামায়ণ উৎসবের উদ্বোধন হবে ব'লে আগে থেকেই ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ দিন আগে থেকেই বিদেশী অভ্যাগতদিগকে সেখানে এসে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হ'য়েছিল। তার অবশ্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল। পাণ্ডানের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চটি ২০০ ফুট চওড়া এবং ২০০ ফুট লম্বা, অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে তা' মোট ৪০,০০০ বর্গ ফুট। বিভিন্ন দেশ থেকে যে শিল্পী সংস্থাগুলোকে আমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল, তাদের প্রত্যেককেই এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে তাদের অনুষ্ঠান ক'রতে হবে ব'লে তাদের কয়েকদিন আগে থেকে এখানে এসে রিহার্সাল দেবার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছিল। নতুবা এত বিশাল রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠান কর্‌তে অনভ্যস্ত শিল্পীরা উৎসবে কৃতিত্ব দেখাতে পারবে না। বিভিন্ন দেশ থেকে সব দলগুলোই ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে প্রতিদিন ২।৩ টা দল ক'রে সেখানে রিহার্সাল দিতে আরম্ভ ক'রেছিল। ভারতবর্ষের দল দুটোই সর্বশেষে গতকাল মাত্র দু'দিন আগে সেখানে এসে পৌঁছেছে। সেইজন্য দু'দিন ধ'রে অর্থাৎ আজ ২৯ শে আগস্ট এবং আগামী কাল ৩০ শে আগস্ট ১৯৭১ এই দু'দিন সেখানে একদিন ভারতের কথাকলি এবং আর একদিন গোয়ালিয়রের লিট্‌ল ব্যালে গ্রুপের পুতুল সাজে রামায়ণ-নৃত্যের রিহার্সাল হবে। তারা আগে এসে সেখানে আরো বেশিদিন রিহার্সাল না দেওয়ার জন্য উৎসবের কর্তৃপক্ষ তাদের বেশ তিরস্কার ক'রলেন, তা আমি নিজেই শুন্‌তে পেয়েছিলাম। কারণ, তাদের বিশ্বাস প্রত্যেকটা দলের পক্ষে মাত্র একদিনের রিহার্সালে সেখানে কিছু করা কঠিন।

শ্রীপ্রতাপ আমাকে আমার হোটেলে নামিয়ে দিয়ে বল্লেন, আপনি দুপুরের খাওয়ার পর তৈরী হ'য়ে থাক্‌বেন, আমি আবার গাড়ী নিয়ে আস্‌ব, আপনাকে নিয়ে পাণ্ডান যেখানে রামায়ণোৎসব হবে সেখানে যাব। আজ কথাকলি দলের রিহার্সাল হবে। তারা আলাদা বাসে ক'রে বারোটার মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাবে।

আমি বল্লাম, বেশ, আমি তাই থাকব। কিন্তু আপনি আমাকে আমার ঘর থেকে ডেকে নিবেন, কারণ, খেয়ে দেয়ে যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তবে আপনার আগমন আমি টের পাব না।

তিনি বল্লেন, আপনাকে না নিয়ে আমি যাব না। স্নান-সরোবরে (swimming pool)-র পাশ দিয়ে নিজের ঘরে যাবার সময় দেখ্‌লাম, কয়েকটি ইন্দোনেশিয়ান দম্পতি নেমে স্নান কর্‌ছে, সাঁতার কাটছে, স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের ভিতরে তাদের সুস্থ সুন্দর দেহের প্রতিটি রেখা পর্যন্ত যেন দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। সকাল থেকেই রেকর্ডে যে বিলিতি বাজনার সুর বাজছিল, তা তেমনই অবিশ্রাম বেজে চলেছে।

ঘরে এসে স্নান কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌লাম, চৌবাচ্চার জল বরফের মত ঠাণ্ডা, স্নানাগারে গরম জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। একবার ভাবলাম, স্নান-সরোবরে (swimming pool) গিয়ে স্নান ক'রে আসি, সেখানকার জল নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধ'রে রৌদ্রে বেশ গরম হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তখনই আবার মনে হ'লো, আমার ত স্নানের পোশাক (swimming costume) নেই, আর তা যদি থাকত, তবে তা প'রে এই বয়সে জলে নাম্‌তে কি শোভন দেখাত? হয়ত আমি আমাদের গাঁয়ের পুকুরে স্নান কর্‌তে গিয়ে যে ভাবে মালকোঁচা মেরে কাপড় প'রে জলে লাফিয়ে পড়ি, সেখানেও সে ভাবে লাফিয়ে পর্‌তে পারি. কিন্তু এই দেখে বিদেশী লোকগুলো কি ভাববে? ভাব্‌বে বাঙাল। আমি যে বাঙাল, সে কথাটাই ত সব চাইতে আগে গোপন কর্‌তে চাই। স্বদেশে বাঙাল ব'লে গাল খাই, বিদেশেও এ' জন্য গাল খাব? ভেবে সেখানে গিয়ে স্নান কর্‌বার সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম।

অন্যান্য হোটেল হ'লে বোতাম টিপে হোটেলের পরিচারককে ডেকে এক বাল্‌তি গরম জল চেয়ে নিতাম। কিন্তু এখানে হোটেলের রান্নাঘর এবং পরিচারকদিগের সংসর্গ থেকে বহু দূরে আমি এক রকম নির্জনে বাস ক'রছি। সেখান থেকে কাউকে ডাকা যেমন কঠিন, গরম জলের বাল্‌তি নিয়ে ধাপে ধাপে উপরে ওঠাও তেম্‌নই কঠিন। সুতরাং সে সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌তে হ'লো।

ভেবে আবার স্নানাগারের মধ্যে ঢুক্‌লাম। বিলাল জল ভর্তি চৌবাচ্চা; কিন্তু জল বরফ। কোনোমতে তার মধ্যেই মাথাটা ধুয়ে গা'টা মুছে তাড়া-

তাড়ি গরম জামাকাপড় প'রে ফেল্‌লাম। তারপর ভোজনাগারে এসে খাবার জন্য ব'সে প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম। শুনতে পেলাম, কথাকলির দল আগে থেকেই খেয়ে দেয়ে সকলে মিলে রিহার্সাল দিবার জন্য পাণ্ডান চ'লে গেছে। আমার ভাগ্যে আজ কি 'লাঞ্চ' জুটে, তাই দেখ্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলাম।

বিলিতি ধরনের 'লাঞ্চ' পাওয়া গেল, খেতে কোনো অসুবিধা হ'লো না। খাওয়া শেষ ক'রে উঠে যাচ্ছি, এমন সময় পরিচারক এক গ্লাস ভর্তি চুনগোলা ঘোলা জলের মত তরল একটা কি পদার্থ আমার হাতে দিল। আমি কিছু বুঝ্‌তে পারলাম না, পরিচারক ইংরেজি জানে না, আমার কোনো ভাষাই সে বুঝে না, তার ভাষা আমি বুঝি না, সুতরাং এ কি পদার্থ বুঝ্‌তে পারলাম না। পরিচারকের ভুল ইংরেজির ভিতর থেকে দু'টি শব্দ আমি উদ্ধার ক'রে বিষয়টার খানিকটা আন্দাজ ক'রে নিলাম। কথা দু'টো 'কার্ড' (curd) আর 'ইণ্ডিয়ান'। এতক্ষণে আমি বুঝ্‌তে পারলাম, ইতিপূর্বে যে ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয়েরা এখানে খেয়ে গেছে, তারা আমার জন্য কিছু 'কার্ড' (curd) বা ঘোল রেখে গেছে। অবশ্য তা মাথায় ঢালবার জন্য নয়, খাবার জন্য। আমার মনে হ'লো, গত রাত্রে কথাকলি দলের পরিচালক শ্রীওয়ারিয়র আমাকে ব'লেছিল, ঘোল না হ'লে তাদের খাওয়া হয় না, কিছু দুধ যোগাড় ক'রে যদি তারা ঘোল তৈরী কর্‌তে পারে, তবে তা থেকে আমাকেও বঞ্চিত কর্‌বে না। আমি বুঝ্‌তে পারলাম, তারা খেয়ে যাবার পর আমার জন্যও এক গ্লাস এখানে রেখে গেছে। তখন আমি সেই গ্লাস থেকে জলের চাইতেও তরল ঘোল নামক দক্ষিণী পানীয় গলায় ঢেলে তা দিয়ে খাবার পর জল পান ক'রলাম। মনে হ'লো দইয়ের অভাবে নেবু দিয়ে তা জমানো হ'য়েছিল, তাই তা থেকে নেবু নেবু গন্ধ দূর হয় নি। যাক্‌ মনে মনে শ্রীওয়ারিয়রকে ধন্যবাদ জানালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীপ্রতাপ তাঁর গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হ'লেন, বল্লেন, আর দেরী নয়, শীঘ্র চলুন। ওদের রিহার্সাল আমাদের দেখ্‌তে হবে।

আমি প্রস্তুত হ'য়েই ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। জেতস থেকে পাণ্ডান মাত্র দু' মাইল পথ। আসবার সময় চড়াই,

যাবার সময় উৎরাই। সুতরাং যাবার সময় অনেক কম সময় লাগে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমরা গিয়ে পাণ্ডানে পৌঁছে গেলাম। দু'দিন পরেই সেখানে বিশ্ব রামায়ণ উৎসব আরম্ভ হবে। সেইজন্য সেখানে তার তোড়-জোড় চল্‌ছে। আমরা সোজাসুজি গিয়ে রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে যেখানে শিল্পীদিগের প্রশস্ত সাজঘরগুলো ছিল, সেখানে পৌঁছলাম। তখন ১ টা বেজে গেছে।

গিয়ে দেখি, কথাকলির শিল্পীরা সাজ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, একেবারে পুরো 'ড্রেস রিহার্সাল' হবে। তাই নিখুঁত সাজসজ্জা নিয়েই তারা আসরে নেমে রিহার্সাল দিবে। সবাই নাকি তাই দিয়েছে। কিন্তু দেখ্‌লাম, কথাকলি নাচের সাজসজ্জা নেওয়া বড় জটিল ব্যাপার। তা'তে বহুক্ষণ ধ'রে নৃত্যকারীর চোখমুখ চিত্রিত করবার প্রয়োজন হয়। সজ্জাগ্রহণ-কারীরা মাটির উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকে, তারপর যারা রূপদক্ষ অর্থাৎ ইংরেজিতে যাদের make up men বলে, তারা বহুক্ষণ ধরে সূক্ষ্ম তুলির সাহায্যে মুখের উপর, চোখের পাতায়, ভুরুতে, চিবুকে, গালপাট্টায় রঙ কর্‌তে থাকে। গিয়ে দেখলাম, বিশাল সাজ-ঘরের বিস্তৃত মেঝের উপর নৃত্যে অংশগ্রহণকারীরা সারি সারি মাটির উপর চিৎ হ'য়ে নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে আছে, আর কয়েকজন চিত্রকর তাদের মুখ চিত্রিত কর্‌ছে। মুখের চিত্রকর্ম হ'য়ে গেলে পর তারা যে ঘেরাটোপ দেওয়া এক একটি পোশাক পরে, তাও পরা তাদের পক্ষে প্রচুর সময় সাপেক্ষ।

আমি বল্লাম, সন্ধ্যার আগে রিহার্সাল আরম্ভ হ'তে পারবে না। শ্রীপ্রতাপ বল্লেন, তা হোক, দরকার হ'লে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত রিহার্সাল চল্‌তে পারবে। দেখ্‌ছেন ত রঙ্গমঞ্চের অবস্থা, ভালো ক'রে রিহার্সাল না দিলে, কোথায় কি কর্‌বে তা বুঝ্‌তেও পারবে না।

কথাকলির দল যে নৃত্যটির অনুষ্ঠান কর্‌বে বলে স্থির ক'রেছিল, তা রামায়ণের সুপরিচিত কাহিনী 'বালী বধ। তা তাদের এক ঘণ্টার অনুষ্ঠান। তা'তে রাম-লক্ষ্মণ চরিত্র ছাড়াও কিষ্কিন্ধ্যার বড় বড় বানরের চরিত্র আছে। তার উপর দু'টি স্ত্রী চরিত্রও আছে—বালীর স্ত্রী তারা ও সুগ্রীবের স্ত্রী। সুতরাং এদের প্রত্যেকের রূপ-সজ্জা গ্রহণ যেমন জটিল, তেমনই সময়-সাপেক্ষ। আমি সাজঘরের ব্যবস্থাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, দেখলাম, বিভিন্ন দলের বাদ্য যন্ত্রগুলো সেখানে এনে রাখা

হ'য়েছে। তারপর ক্রমে মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালাম। আগেই বলেছি, মঞ্চটি বিশাল; ২০০ ফুট চওড়া এবং ২০০ ফুট লম্বা, সুতরাং চৌকোণা আকৃতি। সিমেন্টে বাঁধানো; মাটি থেকে বড় জোর তিন ফুট উঁচু। চল্লিশ ফুট জুড়ে এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে বালী বধের যে নৃত্যানুষ্ঠান হ'তে চ'লেছে, তা'তে এক সঙ্গে বড় জোর ৫।৬ টি চরিত্র নাচ্‌তে পারে। সারা মঞ্চ খালি প'ড়ে থাকবে। দেখ্‌তে যে কি রকম হবে তা আমি বুঝেই উঠ্‌তে পারলাম না।

যাই হোক, আমি মঞ্চটি এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখ্‌লাম। মঞ্চটি বেশী দিনের পুরানো নয়, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হবারও পরে নির্মিত হ'য়েছে, সে মাত্র ৫।৬ বছরের আগেকার কথা। আন্তর্জাতিক উৎসব করবার পরিকল্পনা যে দিন থেকে এ জাতির মনের মধ্যে জেগেছিল, সেদিনই এই রকম একটি মঞ্চ তৈরীর পরিকল্পনাও সঙ্গে সঙ্গেই এদের মনে হ'য়েছিল। তারপর জাতি বহু অর্থব্যয় ক'রে তাকে রূপ দিয়েছে। এখানে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় রামায়ণ উৎসব প্রতি বৎসর হ'য়ে এলেও সেবারই প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসবের আয়োজন হ'য়েছিল, মঞ্চটিকে কেন এত বৃহৎ ক'রে নির্মাণ করা হ'য়েছিল, তা এদেশের শিল্পী-সংস্থাগুলোর নৃত্যানুষ্ঠান যেদিন প্রথম দেখ্‌লাম, সেদিনই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, তার আগে বুঝ্‌তে পারি নি।

রঙ্গমঞ্চের চার কোণে চারটি বিশাল প্রস্তর মূর্তি। খুব পরিচিত হিন্দুদেরদেবীর মূর্তি ব'লে মনে হ'লো না। কি কারণেই বা রঙ্গমঞ্চের চার কোণে চারটি মূর্তি এমনই ভাবে তৈরী ক'রে স্থাপিত করা হ'য়েছে, তাও বুঝ্‌তে পারলাম না। পরে এই মঞ্চ নির্মাণের ইতিহাস যখন এদেরই প্রকাশিত একটি পুস্তিকার মধ্যে পড়েছিলাম, তখন জান্‌তে পারলাম যে মূর্তিগুলো কুবেরের মূর্তি। নৃত্যানুষ্ঠানকালে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে যাতে কোনো অশুভ দৃষ্টি কেউ নিক্ষেপ কর্‌তে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই কুবেরের মূর্তি চার কোণে স্থাপন করা হ'য়েছে। কুবের অশুভ দৃষ্টির প্রতিষেধক। ভারতীয় হিন্দু মন্দিরের দ্বারদেশে দ্বারপাল ভৈরব মূর্তি থাকে, তিনি মন্দিরের দ্বার রক্ষক এবং মন্দিরের মধ্যে অশুভ এবং অশুচি স্পর্শের প্রতিষেধক, ইন্দোনেশিয়াতেও এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, কুবের সম্পর্কে এই সংস্কার ভারতবর্ষ থেকেই ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিল, ইন্দোনেশিয়ায় তা আজো অবিচল হ'য়ে আছে, ভারতে তা [illegible]

পরিবর্তনের ধারায় কুবের থেকে ভৈরবে রূপান্তরিত হ'য়েছে। কুবের কুৎসিত দর্শন, সে জন্যই তার নাম কুবের, কুৎসিত জীবই কুৎসিত জীবের অশুভ দৃষ্টি প্রতিরোধ করতে পারে। ভৈরবের বাহন কুকুর, তিনিও কুৎসিত দর্শন। সেইজন্য মনে হয়, গোড়াতে উভয়েই এক ছিলেন। প্রস্তরে গঠিত বিশাল কুবের মূর্তি কয়েকটি কুৎসিত ভাবে আসীন, দেবদেবী যেমন ধ্যানাসন, লীলাসন, পদ্মাসন ইত্যাদি ভঙ্গিতে বসেন, কুবের সেভাবে বসেন না, তাঁর আসনও কুৎসিত। তার ভয়ে কোনো অশুভ শক্তি রঙ্গমঞ্চের চতুঃসীমায় প্রবেশ করতে পারে না।

যে সকল সংস্কার আমরা ভারতবর্ষে হিন্দুর জীবনে ইতিমধ্যেই বিসর্জন দিয়েছি, সেগুলো একদিন ভারতবর্ষ থেকে ইন্দোনেশিয়ার গিয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে আজো বেঁচে আছে। তাই ইন্দোনেশিয়ার মুসল-মান রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভারতীয় হিন্দুর বহু বিস্মৃত আচার-আচরণের কথা জানতে পারি। আমরা মূঢ়তা বশতঃ যা পরিত্যাগ ক'রেছি, তারা বিজ্ঞতা বশতঃ তা জাতির সম্পদ ব'লে রক্ষা ক'রেছে। কুবেরের মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে এই কথাই আমি ভাবতে লাগলাম।

এই বিশাল মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থেকেই ইন্দো-নেশিয়ায় জাতীয় উৎসব (National Festival) হিসাবে রামায়ণ নৃত্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে আসছে। তখন সাধারণতঃ প্রাম্বানামের শিবমন্দিরের সামনে যে বিশাল উন্মুক্ত আঙ্গিনা ছিল, তা'তেই রাষ্ট্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় রামায়ণ নৃত্যোৎসবের আয়োজন হ'তো। ক্রমাগতই এই উৎসব কেবল-মাত্র ইন্দোনেশিয়ায় নয়, বাইরের জগতেও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। প্রতি বৎসর এই উৎসব উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ (একমাত্র ভারত উপমহাদেশ ছাড়া) থেকে পর্যটকেরা ইন্দোনেশিয়ায় অধিক থেকে অধি-কতর সংখ্যায় আসতে লাগল। তার ফলে বিপুলতর জনসংখ্যার সামনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করবার আবশ্যকতা দেখা দিল। তারই প্রয়ো-জনে পাণ্ডানের এই বিশাল রঙ্গমঞ্চটি নির্মিত হ'য়েছে। এর মধ্যে প্রাম্বা-নামের মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্গুণ দর্শকের বসবার স্থান হয়।

এই রঙ্গমঞ্চটি নির্মাণের সময় এই নৃত্যানুষ্ঠান বিষয়ে যে জাতীয় ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠেছিল, তা পরিত্যাগ করা হয় নি। অর্থাৎ মন্দির প্রাঙ্গণে যে এক-দিন এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হ'তো তার ধারা রক্ষা করবার জন্য পাণ্ডানের এই

রঙ্গমঞ্চটিও একটি কৃত্রিম মন্দির নির্মাণ ক'রে তার সামনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র রামায়ণের কাহিনীটি প্রাম্বানামের প্রস্তর-মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ আছে, কিন্তু এখানে তা করা আর সম্ভব হ'য়ে উঠেনি। তথাপি মন্দিরটি আকারে ছোট হলেও তা' যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের আদর্শে'ই গড়া হ'য়েছে। বলাই বাহুল্য, এ' মন্দিরে কোনো দিন দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দেবতা-পূজার প্রয়োজনে এই মন্দির নির্মাণ করা হয় নি, মন্দিরের সামনে নৃত্য হয়, এই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে নৃত্যাঙ্গিনাকে একটি কৃত্রিম মন্দিরের সামনে স্থাপন করা হ'য়েছে।

একটি স্বাভাবিক বিস্তৃত ঢালু জায়গার মধ্যে মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চটি স্থাপিত হ'য়েছে। ঢালের সুযোগ নিয়ে দর্শকদিগের আসনগুলো অর্ধবৃত্তাকারে ক্রমশঃ নীচে থেকে উপরের দিকে তুলে দেওয়া হ'য়েছে, তা'তে বহুদূরের দর্শকেরা পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চটির সামনে ব'সে বসেই তা দেখ্‌বার সুযোগ পায়। আসনগুলো স্থায়ী ভাবে সিমেন্টে বাঁধাই ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, উন্মুক্ত স্থানে রৌদ্রবৃষ্টিতে তাদের কোনো ক্ষতি হবার উপায় নেই।

সেই উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের একটা দিক জুড়ে একটা লম্বা ব্যারাকের মত, তা'তে ছোট বড় নানা সাজঘর, গুদামঘর, আপিস ঘর এ'সব। তার সংলগ্ন রঙ্গমঞ্চের তিনটি প্রবেশ দ্বার—একটি উত্তর-পশ্চিম কোণে, একটি মধ্যস্থলে এবং একটি উত্তর-পূর্ব কোণে। প্রয়োজন মত অভিনেতারা যে-কোনো দিক দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করতে এবং মঞ্চ থেকে বের হয়ে যেতে পারে। মাঝখানের প্রবেশ দ্বারটি, যে মন্দিরের কথা আগে উল্লেখ ক'রেছি, সেই মন্দিরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, এই প্রবেশ পথটিই সাধারণ ভাবে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে, বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে কোণের প্রবেশপথগুলো ব্যবহার করা হয় না। একমাত্র ইন্দোনেশিয়ার দলের রামায়ণ-নৃত্যের মধ্যেই কোণের প্রবেশ পথগুলো ব্যবহার করা হ'য়েছিল, কিন্তু অন্য কোনো দেশের নৃত্যে কেবলমাত্র মাঝখানের পথটিই প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

মঞ্চটি পাণ্ডান শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, সেখান থেকে বহুদূর উত্তর দিকে অনুর্বর উচ্চনীচ ভূমি, জন-বসতির চিহ্ন নেই, বহুদূরে একটি পাহাড়ের অস্পষ্ট ছায়া আকাশের গায়ে লেগে আছে।

প্রায় দু ঘণ্টা ধরে এমনি ভাবে ঘুরে ঘুরে দেখার পর যখন আবার

গিয়ে সাজঘরে প্রবেশ কর্‌লাম, তখনো দেখি, কথাকলির শিল্পীদের সাজ নেওয়া শেষ হয় নি। এখনো কয়েকজন শিল্পী মাটির উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে, তাদের মুখের উপর চিত্রকর্ম্ম চল্‌ছে। শিল্পীরা বল্‌লে, কথাকলির সাজ নিতে এক একজন শিল্পীর পুরো তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগে। সুতরাং আরো এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

বিকাল পাঁচটার সময় কথাকলির রিহার্স্যাল আরম্ভ হ'লো। তখনো প্রচণ্ড রোদ, তার মধ্যেই বাদ্যভাণ্ড সহ শিল্পীরা উন্মুক্ত মঞ্চে গিয়ে, আবির্ভূত হ'য়ে তাদের অনুষ্ঠানের মহড়া দিতে আরম্ভ ক'রল। বিশাল উন্মুক্ত মঞ্চের মধ্যে বিচিত্র পোশাকে মুখ চিত্রিত ক'রে সুগ্রীব আর বালী যখন আবির্ভূত হ'লো, তখন তারা মঞ্চের উপর যেন হারিয়ে গেল ব'লে বোধ হ'লো। তবু তারা তাদের মত নেচে চল্‌লে।

এদিকে আজ সন্ধ্যা ৬৷৷০ টার সময় পূর্ব যবদ্বীপের রাজ্যপাল এবং তাঁর পত্নী সুরাবইর রাজভবনে ভারতীয় প্রতিনিধি এবং শিল্পীদের এক নৈশ ভোজে মিলিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের ইতিপূর্বেই আপ্যায়িত করা হ'য়েছে, ভারতীয় প্রতিনিধিরা বিলম্বে এসে পৌঁছেছে ব'লে তাদের জন্য সে দিন বিশেষ ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার মধ্যে আমাদের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর সুরাবইয়ে গিয়ে পৌঁছান আবশ্যক। আমাদের সেখানে যাবার জন্য একটি বিশাল ডি-ল্যুক্স বাস পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল।

যখন ছ' টা বেজে গেল তখন আমি শ্রীপ্রতাপকে জিজ্ঞাসা করলাম, যারা মুখে রঙ মেখে রিহার্স্যাল দিচ্ছে, তারা কি ক'রে রিহার্স্যাল ছেড়ে গিয়ে এখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে ?

শ্রীপ্রতাপ বল্লেন, যারা রঙ মাখে নি, তারাই যাবে, রিহার্স্যালও ততক্ষণ বন্ধ থাক্‌বে। রাজ্যপালের আমন্ত্রণে আমাদের সকলেরই সাড়া দেওয়া আবশ্যক।

ইতিমধ্যে আলোচনা-চক্রের অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি দিল্লীর ডক্টর লোকেশচন্দ্র এসে পৌঁছেছেন। তিনিও নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে সুরাবই যাবার পথে পাণ্ডানে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছেন। তাঁর সঙ্গে তিনি তাঁর এক বিবাহিতা ভগ্নীকেও নিয়ে এসেছেন। তিনি এসেই তাঁকে থাক্‌বার জন্য ভাল জায়গা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

শ্রীপ্রতাপ বল্লেন, আপনারা দু'জন আস্‌বেন আগে জান্‌তে পারি নি, আপনার একার জন্য ভাল জায়গাই রাখা হ'য়েছিল। যদি দু' দিন আগে আস্‌তেন, তবু ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু এখন সব ভাল জায়গাগুলোই পূর্ণ হ'য়ে গেছে।

তিনি তা'তে খুশী হলেন না, নানা ভাবে তিনি এবং তাঁর বিবাহিতা ভগ্নী অসন্তোষ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর কথাবার্তা আচার আচরণে এমন মনে হ'তে লাগ্‌ল যে তাঁর ভাল জায়গা না পাওয়ার জন্য আমিও দায়ী। কারণ, আমি একটা ভাল জায়গা আগে থেকেই দখল ক'রে নিয়েছি।

যাই হোক, মুখে রঙ মাখা শিল্পী ছাড়া আর সবাই সংখ্যায় প্রায় ৫০ জন মত হবে, সুরাবইয়ের রাজভবনে রাজ্যপালের নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে চল্‌লাম।

সুরাবইর রাজভবনে পৌঁছুতে প্রায় ৬৷৷০ টা হ'য়ে গেল। গিয়ে দেখি, স্বয়ং রাজ্যপাল তাঁর কয়েকজন মন্ত্রী এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য রাজভবনের দ্বারদেশে অপেক্ষা ক'রছেন। প্রথমেই আমি গিয়ে রাজ্যপালের সামনে হাজির হ'য়ে নিজের পরিচয় দিলাম, তারপর একে একে সকলকেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলাম, সকলের সঙ্গেই তিনি এবং অন্যান্যরা করমর্দন ক'রে ভিতরে গিয়ে বস্‌বার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল।

যবদ্বীপে আমোদ-প্রমোদ বল্‌তেই বুঝায় নৃত্য। কারণ, সেদিন রাজভবনে আমাদের 'সম্বর্ধনা' সভায় যে অনুষ্ঠান-লিপিটি বিতরণ করা হ'য়েছিল, তা'তে একটি বিষয় ছিল, বালীদ্বীপের নৃত্য। প্রথম নৃত্যে চারিটি ৮ থেকে ১০ বছর বয়সের বালিকা এক সঙ্গে অংশ গ্রহণ ক'রেছিল। বালীদ্বীপের বিশ্ববিখ্যাত নৃত্য আমি সেই প্রথম দেখ্‌তে পাই। সেই নৃত্য দেখে সেদিন আমি অনুভব ক'রেছিলাম, এক মুহূর্তে আমার চার-দিককার মর্ত্য পরিবেশ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে, আমার চারদিক যেন এক স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত হ'য়ে প'ড়েছে, আমার সমগ্র দেহমন কেমন যেন এক ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ ক'রেছে; আমি যেন আর পৃথিবীর কেউ নই, সমগ্র বিশ্বের ভাবসৌন্দর্যের মধ্যে লীন হ'য়ে আছি। তার কথা এবং

তা আমার মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল, তা আজো আমি অনুভব করি। এই সৌন্দর্যের রহস্য আমি এখনো সন্ধান কর্‌তে যাই। বারবারই আমার মনে হয়, বালিকার সহজাত সৌন্দর্যের মধ্যে যে স্বর্গীয়তার স্পর্শ আছে, তাই এই নৃত্যকে সুন্দর এবং মধুর ক'রে তুলে। যেখানে পবিত্রতা, সেখানেই সৌন্দর্যের সহজ আবেদন। আমাদের দেশে বহু নৃত্যের অনুষ্ঠান ত আমি দেখি, কিন্তু এমনটি কোথাও দেখি না।

চারিটি বালিকার সমবেত নৃত্যের পর রাবণের একটি একক নৃত্য দেখ্‌লাম। রাবণের নৃত্যও যে দর্শনীয় এবং এমন উপভোগ্য হ'তে পারে, তা আগে কল্পনাও ক'রতে পারি নি।

নৃত্যশেষে প্রচুর আমিষ খাদ্য, মাছ এবং মাংস, সহযোগে নৈশভোজন পরিতৃপ্তির সঙ্গে সম্পন্ন করা হ'লো। আমিষ খাদ্যের প্রাচুর্যের কারণ, দক্ষিণ ভারতীয় প্রতিনিধি বা কেরলের কথাকলির শিল্পীরা সকলেই নিরামিষভোজী। সুতরাং তাদের উদ্বৃত্ত আমিষ খাদ্য আমাদেরই সদ্ব্যবহার ক'রতে হ'লো। আমাদের এ বিষয়ে দক্ষতার কিছু মাত্র অভাব দেখা গেল না।

নৈশভোজন শেষ ক'রে যখন গাড়ীতে ক'রে হোটেল দীর্ঘায়ুতে ফিরে এলাম, তখন অনেক রাত্রি।

বিশ্ব রামায়ণ উৎসব, পাণ্ডান, পূর্ব যবদ্বীপ

আজ ৩১শে আগস্ট ১৯৭১ সন। আজ পূর্ব যবদ্বীপের অন্তর্গত পাণ্ডান নামক স্থানে জান্দ্রা উইলওয়াটিকার উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে (amphi-theatre) সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় প্রথম বিশ্ব রামায়ণ উৎসবের উদ্বোধন হবে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিকট যে আমন্ত্রণ পত্রটি বিতরণ করা হ'য়েছিল, তা লক্ষ্য করবার মত। তা'তে লেখা ছিল,

The Chairman of the National Committee of the First International Ramayana Festival Sri Sultan Hamangku Buwono IX has the honour to invite the Chiefs of Festival Contingents, Participants and observers of the Seminar and non-performing Artists to the opening Ceremony of the First International Ramayana Festival at the Amphi-theatre Tjandra Wilwatika, Pandaan, East Java, on Tuesday, 31 August 1971, at 19 : 30 hrs (WIB).

Kindly requested to be present 30 minutes earlier.

Dress : lounge suit, national dress

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ইন্দোনেশিয়ার প্রথম বিশ্ব রামায়ণ উৎসবের জাতীয় কর্মপরিষদের যিনি সভাপতি তাঁর নাম নবম শ্রীসুলতান হেমাঙ্গ ভূষণ (ইন্দোনেশিয়ার উচ্চারণে সামান্য পরিবর্তিত) ব'লে উল্লেখ করছেন। বলাই বাহুল্য, তিনি ধর্মে মুসলমান এবং তাঁর নামের আগে সুলতান কথাটির মধ্য দিয়ে তাঁর মুস্লিম পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তথাপি তিনি একটি আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ পত্রে নিজের নামের পূর্বে 'শ্রী' শব্দটি ব্যবহার ক'রেছেন। ইন্দোনেশীয় ভাষায় মুদ্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট প্রেরিত আরও একটি নিমন্ত্রণ পত্রেও তিনি নিজেকে 'শ্রীসুলতান হেমাঙ্গ ভূষণ নবম' ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। সুলতান শব্দটি তাঁর আভিজাত্যের মর্যাদা সূচক, কিন্তু মূল নামের মধ্যে তিনি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার ক'চ্ছেন।

পাণ্ডান নামক যে ক্ষুদ্র গ্রামটিতে এই বিশাল উৎসবের জন্য উন্মুক্ত

রঙ্গমঞ্চটি স্থাপিত হ'য়েছিল, তা একদিন ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। সেই জন্য সেখানেই রঙ্গমঞ্চের স্থান নির্বাচন করা হ'য়েছিল। এই বিশাল রঙ্গমঞ্চটি একসঙ্গে অন্ততঃ ৪০০ চার শ' শিল্পীর নৃত্যের উপযোগী ছিল। ইন্দোনেশীয় সরকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠান করবার জন্যই মঞ্চটি নির্মাণ করেছিলেন। মঞ্চটির নাম দেওয়া হ'য়েছিল তামন চন্দ্র উইলওয়াতিক্তা (Taman Chandra Wılwatıkta), তার অর্থ উইলওয়াতিক্তার প্রফুল্ল কানন (Glowıng garden of Wılwatıkta)। ইন্দোনেশিয়ার মধ্যযুগের ইতিহাসের মজাপহিত রাজবংশের কুলপদবী ছিল উইলওয়াতিক্তা। মজাপহিত রাজবংশের রাজত্বকালে ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি সর্ববিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ ক'রেছিল। তার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের তুলনা করা যায়। সেইজন্য ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ সেই বংশের নামেই চিহ্নিত করা হ'য়েছিল।

সেই উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের সুদূর পটভূমিকা যেন দিগন্তে আকাশের সঙ্গে সংলগ্ন। সে দেশের একটি অষ্টকূট পবিত্র পর্বত, তার নাম পেনাঙ্গুংগান্ (Penangungan), তার ঢাল এবং সানু দেশে মোট ৮১টি মন্দির। যবদ্বীপের অধিবাসীরা পর্বতটিকে সুমেরু পর্বত ব'লে মনে ক'রে থাকে। এ' বিষয়ে তাদের মধ্যে যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে, তা এই—দেবতারা সুমেরু পর্বতটিকে ভারতবর্ষ থেকে যবদ্বীপে নিয়ে আসবার সময় তার অন্যান্য অংশ ভেঙ্গে সমুদ্রের জলে প'ড়ে যায়, কেবলমাত্র আটটি চূড়া যবদ্বীপে এসে পৌঁছায়। দেবতারা সেই অষ্টচূড়া-যুক্ত অংশটিই সেখানে স্থাপন ক'রে দেন। সেখানকার অধিবাসীর বিশ্বাস, সেই পর্বতের চূড়াগুলোতে অমৃত-ভাণ্ডার আছে, তাই তা থেকে প্রবাহিত নদী ও ঝর্ণাগুলোর জল পান করলে অমরত্ব লাভ করা যায়।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, মজাপহিত রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা উদয়নের দেহাবশেষ সেখানেই চিতায় ভস্মীভূত হওয়ার পর তার উপর চৈত্য বা স্মৃতিমন্দির নির্মিত হ'য়েছে। রাজা উদয়নকে পাণ্ডব বংশের সর্বশেষ রাজা ব'লে উল্লেখ করা হয়।

এই উৎসব উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ার ডাক ও তার বিভাগ রামায়ণের দু'টি দৃশ্য নিয়ে দু'রকম ডাক টিকিট মুদ্রিত ক'রেছিলেন, একটিতে ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব ভঙ্গিতে রামচন্দ্রের মায়ামৃগ বধ দৃশ্যটি চিত্রিত ছিল, আর

একটিতে সুগ্রীব-মিতালির দৃশ্যটি চিত্রিত ছিল। এই দু'টি ডাকটিকিট দিয়েই ইন্দোনেশীয় সরকার বিশ্বের পণ্ডিত সমাজকে রামায়ণ উৎসবে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছিলেন।

আজ সন্ধ্যা ৬॥০ টার সময় ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহর্তা আনুষ্ঠানিক ভাবে পাণ্ডানের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে প্রায় ত্রিশ হাজার স্থানীয় ও বিদেশী দর্শকের সামনে বিশ্ব রামায়ণ উৎসবের উদ্বোধন করবেন। সেদিনকার যে অনুষ্ঠান-লিপি বিতরণ করা হ'য়েছিল, তা'তে দেখা গেল, রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণের পর উৎসবে অংশ গ্রহণ করবার জন্য বিভিন্ন দেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যে সকল শিল্পীদলগুলো এসেছে, রাষ্ট্রপতির সামনে তাদের প্রত্যেকেরই সেই রঙ্গমঞ্চের উপর মাত্র দশ মিনিট ক'রে নৃত্যের অনুষ্ঠান হবে। তার পরদিন থেকে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা ক'রে প্রত্যেক দেশ বা ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের দু'টি ক'রে অনুষ্ঠান হবে। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ, এমন কি, একই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী তা'তে এসে যোগদান ক'রেছিল। তার ফলে দ্বিতীয় দিন থেকে প্রতি সন্ধ্যাতেই একটি ক'রে বিদেশী দল, আর একটি ক'রে ইন্দোনেশিয়ারই বিভিন্ন প্রদেশ বা আঞ্চলিক দলের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। পাণ্ডানে অনুষ্ঠান শেষ হবার পর ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থানেও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'য়েছিল। তিন সপ্তাহের জন্য প্রতিদিনের অনুষ্ঠানকে এই ভাবে বিন্যাস করা হ'য়েছিল—

তারিখ	স্থান	দেশ
৩১. ৮. ৭১	পাণ্ডান	যোগদানকারী সকল দেশ
১. ৯. ৭১	”	ব্রহ্মদেশ
		ভারত (কথাকলি)
২. ৯. ৭১	”	খেমর্
		বালীদ্বীপ
৩. ৯. ৭১	”	মালয়েসিয়া
		যোগজাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া)
৪. ৯. ৭১	”	থাইল্যাণ্ড
		সুরকর্তা (ইন্দোনেশিয়া)

স্থান	দেশ
পাণ্ডান	নেপাল
	সুন্দা (ইন্দোনেশিয়া)
,,	খেমর্
	পূর্ব যবদ্বীপ (ইন্দোনেশিয়া)
,,	ব্রহ্মদেশ
	ভারত (কথাকলি)
,,	নেপাল
	মালয়েশিয়া
,,	থাইল্যাণ্ড
দেনপাসার (বালীদ্বীপ)	ভারত (আধুনিক)
	বালীদ্বীপ
,,	মালয়েশিয়া
	বালীদ্বীপ
,,	থাইল্যাণ্ড
	বালীদ্বীপ
,,	ব্রহ্মদেশ
	বালীদ্বীপ
জাকার্তা	ভারত
	মালয়েশিয়া
,,	ব্রহ্মদেশ
	খেমর্
,,	থাইল্যাণ্ড
	নেপাল
,,	সুন্দা (ইন্দোনেশিয়া)

১০ই আগস্ট থেকে ১২ই আগস্ট কয়েকটি গোষ্ঠী যখন বালীদ্বীপে নৃত্যের অনুষ্ঠান করছিল, তখন ভারতের কথাকলি এবং মধ্য যবদ্বীপের একটি সম্প্রদায় পূর্ব যবদ্বীপের য়োগজাকার্তা শহরের অনতিদূরে প্রাম্বা-নাম্ শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে উক্ত তিন দিন ব্যাপী নিজেদের অনুষ্ঠান ক'রে চ'লেছিল। অর্থাৎ তখন দলগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে দু'জায়গায়

অনুষ্ঠান ক'রেছে। সর্ব শেষে রাজধানী শহর জাকার্তায় সবগুলো দল একত্র হ'য়ে শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রল। তিন সপ্তাহ ব্যাপী এইভাবে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান করবার ফলে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের দেশের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সব দেশেরই অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ পেল।

৩১শে আগস্ট ১৯৭১ উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহর্তো নির্দিষ্ট সময় সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় উৎসব ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'ন। তিনি উন্মুক্ত স্থানে দেশী এবং বিদেশী অতিথিদিগের সঙ্গে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করবার পর প্রথমেই উৎসব সমিতির সভাপতি শ্রীসুলতান হেমাঙ্গভূষণ নবম, ইংরেজি ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ পাঠ ক'রে অভ্যাগতদিগকে স্বাগত জানান। তিনি তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন,

I sincerely hope that this occasion will stimulate each and all of us to attain a better appreciation of each other and to probe deeper into the values of our Culture as an essential part of men's integrity. I wish that this festival will be helpful in creating an inspiration to explore the potentialities in our Culture which can lead to a greater happiness, peace and prosperity.

অর্থাৎ তিনি বল্লেন, আমি আন্তরিক ভাবে আশা করি যে এই উপলক্ষে আমরা পরস্পরকে আরো ভালো ক'রে বুঝবার সুযোগ পাব এবং যে সংস্কৃতি মানব-চরিত্রের মৌলিক সদ্গুণগুলো বিকাশ করতে সাহায্য করে, তার সম্পর্কে গভীরতর চেতনা লাভ কর্‌তে পারব। আমি আশা করব যে এই উৎসব আমাদের সংস্কৃতির সম্ভাবনাগুলোকে অনুসন্ধান ক'রে দেখবার প্রেরণা দিবে, তার ফলে আমরা সুখ, শান্তি এবং সম্পদ লাভ ক'রতে পারব।

উৎসব সমিতির কর্ম পরিষদের সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর নাম শ্রীমহাশূরী। তিনি তারপর তাঁর একটি লিখিত ভাষণ পাঠ ক'রলেন, সে'টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর ইংরেজি ভাষণ-প্রসঙ্গে যা বল্‌লেন, তার অর্থ—

আমরা যে আজকে এই উৎসবে উপস্থিত হ'য়েছি, তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মেলামেশা কিংবা কোনো কিছু দেখাশোনা নয়। তার উপরেও আর একটি লক্ষ্য আছে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দেশ তার নিজস্ব প্রয়োগ-রীতির সমস্যাগুলো সক্রিয় সদিচ্ছা নিয়ে পরস্পরকে বুঝাবার এখানে সুযোগ পাবে। এ' বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে আমাদের মধ্যে অতীত-কালে বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধন ছিল, ইতিহাসের ঘটনার ক্রমবিবর্তনের ফলে সেই বন্ধুত্বের ভাব আজ অনেকটা শিথিল হ'য়ে এসেছে। নিজস্ব রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর স্বাতন্ত্র্যের জন্যই আজ আমরা পরস্পর পরস্পর থেকে পৃথক্ হ'য়ে প'ড়েছি। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে আজ আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জীবনের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চ'লেছে। তাই আমাদের মধ্যে যে সহৃদয় সম্পর্ক একদিন গ'ড়ে উঠেছিল, তার পুনরুদ্ধারের সময় এসে গেছে। তার জন্য উপযুক্ত ভিত্তি ভূমি নির্বাচন কর্তে হবে। এই আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসবের মধ্যে তারই একটি সম্ভাব্য ভিত্তির সন্ধান করা যেতে পারে। ... ...

... ... আমাদের জাতীয় জীবনের শিল্পগত রূপায়ণের মধ্য দিয়ে বিষয়গত কতকগুলো ঐক্য আছে। বিশেষতঃ রামায়ণের কাহিনীর নানা আঞ্চলিক বৈষম্য থাক্লেও ভারতবর্ষ, নেপাল এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এখনো তা অত্যন্ত জনপ্রিয়। আমরা যে এখানে আজ রামায়ণের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য এসেছি এবং একটি উৎসব, আলোচনা-চক্র এবং নানা শিল্প-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাকে রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছি, তার কারণ, তা আমাদের মধ্য দিয়ে একটি যোগসূত্র রচনা ক'রে দিয়েছিল।

আমরা আশা করছি, এই আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসবের মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া গভীরতর হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে এক অখণ্ড ঐক্য আছে, তার সন্ধান পাব।

রাষ্ট্রপতি সুহর্তা তাঁর সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে এ'সব কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে ইংরেজিতে যা বলেছিলেন, তার বাংলা সংক্ষিপ্তসার এই—

আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আজ যে কারণেই হোক, বাইরের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে যে যোগসূত্র আপাততঃ

বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে বলে অনুভব করা যায়, তাই প্রকৃত সত্য কথা নয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই মনের দিক থেকে এক অখণ্ড ঐক্য আছে। তাই গভীরতর ভাবে উপলব্ধি করবার জন্য আমরা আজ এখানে আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসবের আয়োজন ক'রেছি। একমাত্র রামায়ণের মধ্য দিয়েই আমরা পরস্পরের যে কত নিকট, তা' অনুভব করতে পারব। রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে আমাদের যে পার্থক্যই থাক না কেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই ঐক্যের যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তবে আমরা অনেক সমস্যার হাত থেকেই পরিত্রাণ পেতে পারি। আশা করি এই রামায়ণ উৎসব আমাদেরে সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

ইন্দোনেশিয়ার এই সকল বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের এই উদার অভিভাষণ গুলোর সামান্যতম অংশও ভারতবর্ষের কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। যদি তা' হ'তো, তা'হলে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের ব্যবধান দূর হ'বার পক্ষে সহায়ক হতো। সেই উদ্দেশ্যেই আমি তাঁদের অভিভাষণের কিছু কিছু অংশ এখানে বাংলায় অনুবাদ ক'রে দিলাম। মূল ইংরেজি অভিভাষণগুলো বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা ক'রেই পরিশিষ্টে মুদ্রিত ক'রে দিলাম।

রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণ শেষ হওয়ার পরই বিভিন্ন দেশ এবং ইন্দোনেশিয়ারও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সেখানে আগত শিল্পীসংস্থাগুলো তাদের প্রত্যেকের নিজেদের দেশের কিংবা অঞ্চলের রামায়ণ বিষয়ক নৃত্য-নাট্যের মাত্র দশ মিনিট ক'রে মঞ্চের উপর অনুষ্ঠান ক'রে দেখাল।

তাদের সবার অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সব দেশের শিল্পীরা দীর্ঘ সারি বেঁধে মঞ্চের উপর পাশাপাশি দাঁড়ালেন। রাষ্ট্রপতি সুহর্তো মঞ্চে আরোহণ ক'রে একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেখানেই সমাপ্ত হ'লো।

আজ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সন। আজ সকালে ৯টার সময় পাণ্ডানে বিশেষ ভাবে তৈরী মণ্ডপে আন্তর্জাতিক রামায়ণ আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন হ'য়ে গেল, সে কথা পরে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ ক'রব। আজ সন্ধ্যায় ৬॥০ টার সময় পাণ্ডানের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে দু'টি দেশের রামায়ণ নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে বিশ্ব রামায়ণ উৎসব আরম্ভ হবে। দেশ দু'টি প্রথমতঃ

ব্রহ্মদেশ, তারপর ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের দু'টি দলের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের কথাকলি দলটির আজ অনুষ্ঠান।

এ দিকে সকালে পাণ্ডানে আলোচনা-চক্রে যোগদান ক'রে প্রতিনিধিগণ দুপুরেই ত্রেতস শৈলনগরীতে ফিরে গিয়ে দ্বিপ্রাহরিক আহার সমাধা করলেন, তারপর তেনজুং হোটেলে আলোচনা-চক্রের প্রথম দিনের দ্বিপ্রাহরিক বৈঠক শেষ ক'রলেন, তারপর সন্ধ্যার পূর্বেই উৎসব ক্ষেত্রে আসবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রইলেন। সরকারী বাসে সকলকেই সেখান থেকে পাণ্ডানে নিয়ে যাবার জন্য তেনজুং হোটেলের সামনে কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। কথাকলির শিল্পীরা আগে থেকেই সাজ-সজ্জা নিয়ে তৈরী হবার জন্য দুপুরেই সেখানে চলে গেছে। সন্ধ্যার আগেই আমরা বাসে ক'রে পাণ্ডানের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের সামনে এসে পৌঁছলাম। দেখি, সেখানে ইতিপূর্বেই লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেছে। এমন কি, বিদেশী প্রতিনিধিদের বিশেষ প্রবেশ পথটির ভিতরেও দর্শনপ্রার্থীর এত ভিড় যে কোনো মতে সামনে এগোবার উপায় নেই।

যাই হোক, আমরা বিদেশী প্রতিনিধি ব'লে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকের বিশেষ সহায়তায় ভিড় ঠেলে ভিতরে প্রবেশ ক'রলাম এবং বিশেষ সম্মানিত অতিথিরূপে একেবারে সামনের সারিতে V. I. P. দিগের সঙ্গেই বসবার সুযোগ পেলাম। সেখানকার অন্ততঃ ২৫ ফুট দূর থেকে রঙ্গমঞ্চের বেদী আরম্ভ হ'য়েছে। মাঝখানে একটি ২০ ফুটের মত চওড়া দীর্ঘ জলাশয়ের মত জলাধার। তার এক তীরে দর্শকেরা আসীন, অপর তীরের কিছু দূরেই মঞ্চের সম্মুখ দিকটি এসে শেষ হ'য়েছে।

আমরা বিদেশী প্রতিনিধিরা যখন সবাই সেখানকার প্রথম সারিতে বেশ সুখে এবং আরামে সমাসীন হ'য়ে মনে মনে গভীর সন্তোষ প্রকাশ কচ্ছি, সে সময় দেখা গেল, পূর্ব যবদ্বীপের রাজ্যপাল সপরিবারে এসে সেখানে উপস্থিত হ'য়েছেন। তিনি ইতিপূর্বে আমাদেরে এক নৈশভোজে আপ্যায়িত ক'রেছিলেন, সেজন্য তাঁকে দেখবা মাত্রই চিনতে পারলাম। কিন্তু তাঁর পরিবারটি ছোট ছিল না, অন্ততঃ ১৪।১৫ জন যবদ্বীপীয় পোশাক-পরিহিতা বিভিন্ন বয়স্কা কন্যা এবং বধূ তাঁর সঙ্গে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। রাজ্যপালের অনুচরেরা আমাদের সামনে একটা সারি তৈরী ক'রে তাঁদের বসবার জন্য চেয়ার পেতে দিতে

লাগল। প্রথম সারিতে বস্‌বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার ফলে মনে মনে আমরা সবাই অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লাম, কিন্তু মুখে কিছুই বল্‌বার উপায় নেই। এমন সময় দেখ্‌লাম, রাজ্যপাল আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন, আমার দিকে তঁার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হ'লো, কারণ, আমার পরিধানে সেদিন পুরোপুরি বাঙালীর পোশাক ছিল—ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর, চটিজুতো। বিদেশী অতিথি ব'লে আমাদের তিনি সহজেই বুঝ্‌তে পারলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরেজি ভাষায় বল্‌তে লাগ্‌লেন, না না, এঁরা বিদেশী অতিথি, এঁদের সামনে আমাদের বসা উচিত নয়, আমাদের চেয়ারগুলো বরং পিছনের সারিতে দাও, আমরা সেখানেই বস্‌ব, এঁদের সামনে আমরা বস্‌তে পারি না।

ব'লে নিজেই সামনের সারি থেকে একটি চেয়ার তুলে নিয়ে পিছনের সারিতে রাখ্‌লেন, তঁার অনুচরেরাও কথামত ব্যবস্থা ক'রল। পরিবারস্থ সকলকে নিয়ে তিনি আমাদের পেছনের সারিতে বসে উৎসব দেখ্‌বার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লেন। তঁার সৌজন্যের পরিচয় পেয়ে আমরা সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। ঠিক আমার পিছনের আসনটিতেই রাজ্যপাল ব'সেছিলেন, আমার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌ল, আমাদের দিক থেকেও তঁার প্রতি কিছুটা সৌজন্য প্রকাশ করা আবশ্যক ব'লে বোধ হ'তে লাগ্‌ল; আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে তঁার প্রতি লক্ষ্য ক'রে বল্লাম, আপনি সামনে এসে বসুন, তা'তে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বল্‌লেন, তা কি হয়? আপনারা রাষ্ট্রের সম্মানিত অতিথি!

আমি চুপ ক'রে নিজের যায়গায় ব'সে প'ড়লাম।

ব্রহ্মদেশ

যে কোনো কারণেই হোক, প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ এমন একটি দুর্জয় প্রাণশক্তির অধিকারী হ'য়ে উঠেছিল, যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তার প্রচার অব্যাহত রাখতে সক্ষম হ'য়েছিল। এমনই একটি দেশ ব্রহ্মদেশ। ব্রহ্মদেশ

বহুকাল ধ'রেই বৌদ্ধধর্মাশ্রিত। প্রাত্যহিক-জীবনের আচারে আজ পর্যন্তও ব্রহ্মদেশবাসী বৌদ্ধ। এই বৌদ্ধধর্ম সেখানে খৃস্টপূর্ব কাল থেকেই প্রচারিত হ'য়েছিল এবং তা সেখানকার সমাজ এবং ধর্মীয় জীবনে দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনে বাল্মীকি রচিত রামায়ণের প্রভাব বহুদূর বিস্তার লাভ ক'রেছিল এবং আজ পর্যন্ত তার ধারা অব্যাহত আছে। এমন কি, বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে রামায়ণ নিয়ে যত বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, একমাত্র ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া ব্যতীত অন্যত্র তত হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং রামায়ণ সেখানে কেবলমাত্র বিদ্যালয়-পাঠ্য বিষয় নয়, বরং তার পরিবর্তে বর্মী জাতির জীবনে প্রত্যক্ষ আচরণীয় ধর্ম স্বরূপ।

খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশ থেকে যে বর্মী রাজার দূত চীন দেশে গিয়েছিল, তারা সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক-গান ক'রেছিল ব'লে চীনা সূত্র থেকে জানতে পারা যায়। সুতরাং খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বেই সংস্কৃত ভাষা ব্রহ্মদেশে প্রচলিত হ'য়েছিল, সেই সূত্রেই রামায়ণও তাদের মধ্যে তখন প্রচার লাভ ক'রেছিল ব'লে জানা যায়। কিন্তু ব্রহ্মদেশে রামায়ণ সংস্কৃত ভাষার নিগড়েই যে আবদ্ধ থেকে মুষ্টিমেয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কৌতূহল নিবৃত্ত ক'রেছিল তাই নয়, তা ক্রমে বর্মীভাষায় অনুদিত হ'য়ে ব্রহ্মদেশের জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ ক'রে এক বর্মীরূপ লাভ ক'রেছিল। যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির হয়েও বাঙ্গালীর রামায়ণ হয়েছে, তেমনই বর্মী রামায়ণও বাল্মীকির হ'য়েও ব্রহ্মদেশের নিতান্ত আপনার জিনিস হ'য়ে আছে। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই রামায়ণের বর্মী ভাষায় গদ্যানুবাদ সেখানকার অল্পশিক্ষিত সমাজেও প্রচলিত হ'য়ে আছে।

বর্মী রামায়ণের নাম বর্মী ভাষায় রামসগীন; এর রচয়িতার নাম আউঙ ফিয়ো। কৃত্তিবাস যেমন বাঙ্গালীর রামায়ণের রচয়িতা, আউঙ ফিয়ো তেমনই বর্মী রামায়ণের রচয়িতা। কৃত্তিবাস যেমন বাল্মীকির রামায়ণকে ভিত্তিস্বরূপ ক'রেও বাঙালীর জীবনে প্রচলিত ধর্মীয় ও নানা সাংস্কৃতিক মনোভাবকে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন, আউঙ ফিয়ো তাই ক'রেছেন। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের অনুবাদে বাঙালীর সে যুগের ভক্তিরসকে অন্তর্নিবিষ্ট ক'রে দিয়ে বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণকে বাঙালীর

জন্য বাংলায় রামায়ণ রচনা ক'রেছিলেন, তেমনই আউঙ ফিয়ো তাঁর রামায়ণের বর্মীভাষার অনুবাদে বাল্মীকির রামায়ণকে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের উপযোগী ক'রে নিয়েছিলেন এবং তা ক'রতে গিয়ে কিছু কিছু বৌদ্ধ উপাদানকে তাঁর অনুবাদের অন্তর্নিবিষ্ট ক'রে নিয়েছিলেন। এ কাজ কৃত্তিবাসের পক্ষেও যেমন সহজ ছিল না, আউঙ ফিয়োর পক্ষেও তেমন সহজ ছিল না। তবে কৃত্তিবাস যেমন অতি সহজেই ভক্তির সুর তাঁর রামায়ণে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন, আউঙ ফিয়ো তেমনই শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য ত্যাগ ক'রে বনবাস যাত্রার মধ্যে বৌদ্ধধর্মসুলভ বৈরাগ্যের প্রেরণার সন্ধান ক'রেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্রকে বুদ্ধের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন ; অবশ্য এ কথা সকলেই জানেন যে কৃত্তিবাসের হাতে রামচন্দ্রও বিষ্ণুর অংশাবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিলেন।

খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন ক'রে বর্মী ভাষায় 'শিরিরাম' নামে এক নাটক রচিত হয়। নাট্যকারের নাম কিঅ গাউঙ্। বাংলা দেশে গিরিশচন্দ্র যে ভাবে তাঁর পৌরাণিক নাটক রচনায় মধ্যে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন ক'রেছিলেন, তিনিও তেমনই ভাবে পৌরাণিক নাটকের আকারে 'শিরিরাম' নামক নাটকখানি রচনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ব্রহ্মদেশীয় প্রচলিত ধারায় এই নাটক অভিনীত হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে রামায়ণের কাহিনী তা দ্বারাই প্রচারের ব্যাপক সহায়তা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বর্মী ভাষায় গদ্যসাহিত্যের রচনা বিকাশ লাভ ক'রতে থাকে ; বিংশ শতাব্দীতে তা পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করে, তা দিয়ে কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্য রচিত হ'তে থাকে। কিন্তু বর্মী গদ্য রচনার সূচনাতেই রামায়ণের কাহিনী নিয়ে 'মহারাম' নামে একটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। তার গ্রন্থকারের নাম কিংবা কোনও পরিচয় জানা যায় না সত্য, তবে গ্রন্থখানি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই রচিত হ'য়েছিল, তা বুঝ্‌তে পারা যায়।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত নৃত্যগীত-প্রিয় জাতি। বিশেষতঃ সেখানে স্ত্রীসমাজে নৃত্যানুষ্ঠান বিশেষ সমাদর লাভ ক'রে থাকে। সেইজন্য রামায়ণ কাহিনী নিয়ে তাঁরা কেবলমাত্র কাব্য, নাটক কিংবা গদ্য রচনা ক'রেই ক্ষান্ত থাকেন নি। বরং নানা ভাবে রামায়ণের কাহিনীকে তাঁরা

নৃত্যগীতানুষ্ঠানের ভিতর দিয়েও প্রকাশ ক'রে এসেছেন এবং আজ পর্যন্তও তার ধারা অব্যাহত হ'য়ে চলেছে। যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির নৃত্যগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রামায়ণ কাহিনী ব্রহ্মদেশে আজও জনসাধারণের মধ্যে পরিবেষণ করা হয়, তার বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আমাদের দেশে যেমন যাত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়ে রামায়ণ কাহিনী নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ ক'রেছে, ব্রহ্মদেশেও তাই হ'য়েছে, তাকে বর্মী ভাষায় 'জাত্‌গি' ব'লে উল্লেখ করা হয়। যাত্রা কথাটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে ব'লে মনে হয় না, তবে উভয়ের প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন। তার মধ্যে যাত্রার মতই নৃত্য, সঙ্গীত, বাদ্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে ঘটনা চরম (Climax) অবস্থার মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়, সেখানে নাটকীয় সংলাপ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। তার রূপটা অনেকটা কৃষ্ণযাত্রার মত। কৃষ্ণযাত্রায় যেমন সংলাপ অল্পই আছে, অথচ বাদ্য এবং সঙ্গীতের ভাগ বেশি, তেমনই 'জাত্‌গি'তেও সংলাপের অংশ অল্পই শুনতে পাওয়া যায়। তবে কাহিনী যেখানে চরম মুহূর্তে (Climax) পৌঁছায়, সেখানে নৃত্য এবং গীত বন্ধ হ'য়ে গিয়ে পুরোপুরি সংলাপ-নির্ভর নাটকের রূপ লাভ করে। তবে কৃষ্ণযাত্রা কিংবা যাত্রার সঙ্গে জাগ্‌তির প্রধান পার্থক্য এই যে এর মধ্যে প্রধান চরিত্রগুলো মুখোশ ব্যবহার করে, যাত্রায় তা করা হয় না। তবে মুখোস যে সব চরিত্রই ব্যবহার করে, তা নয়—যে সব চরিত্র মানুষ কিংবা দেবতা, তারা মুখোশ ব্যবহার করে না, কেবলমাত্র কিষ্কিন্ধ্যার বানর, লঙ্কার রাক্ষস, কিংবা অনুরূপ এই শ্রেণীর চরিত্রই মুখোশ ব্যবহার ক'রে থাকে। বলাই বাহুল্য, যে সব চরিত্র মুখোশ ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে কোনো সংলাপের ব্যবহার নেই।

যাত্রা ব্যতীতও ব্রহ্মদেশে বাংলাদের মত পুতুলনাচের মধ্য দিয়েও রামায়ণের কাহিনী প্রচার করা হ'য়ে থাকে। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানকে 'ইয়ক-থে' অথবা 'ইয়ক সন থবিন' বলা হয়। ভারতবর্ষেও নানা প্রকৃতির পুতুলনাচের ভিতর দিয়ে রামায়ণ কাহিনী দীর্ঘ দিন ধ'রে প্রচারিত হ'য়ে এসেছে। তাদের মধ্যে রাজস্থানের কাঠপুতুলী এবং পশ্চিম বঙ্গের দণ্ড পুতুল (rod puppet), অন্ধ্রপ্রদেশ ও উড়িষ্যার নানা শ্রেণীর পুতুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্মী পুতুলগুলো এদের মত কাঠে তৈরী নয়, বরং তার

পরিবর্তে কাপড় দিয়ে তৈরী হয়, পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর অঞ্চলে যে পুতুল-নাচের প্রচলন আছে, বর্মী পুতুলনাচের পুতুলগুলো সেই শ্রেণীর। ইংরেজিতে এগুলোকে (marionette) বলা হয়। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রহ্মদেশের রাজা সিংগুর উৎসব বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উ থ সর্বপ্রথম রামায়ণ-বিষয়ক পুতুলনাচের প্রবর্তন করেন। তারপর জন-সাধারণের মধ্যেও তার প্রচলন হয়।

আর এক শ্রেণীর নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মদেশে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে, তাকে বর্মী ভাষায় 'কাজত' বলে। এর মধ্যে কোনো সংলাপ নেই, তা মৌন নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানের মত। তা'তে অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে।

বিগত শতাব্দীতে পূর্বোল্লিখিত কিউ গাউঙ রচিত 'শিরিরাম' নামক নাটক ব্যাপক অভিনীত হ'লেও বিংশ শতাব্দীতে তার স্থলে উ নু রচিত 'পোল্টো রাম' নামক নাটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রেছে। আজ পর্যন্তও তার ব্যাপক অভিনয় হ'তে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ সাংস্কৃতিক দিক থেকে থাইল্যাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছে, এই শ্রেণীর রামায়ণ নাটকে থাই বাদ্য ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে কোনো ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, শাস্ত্রীয় কিংবা লৌকিক, কিছুই ব্যবহার করা হয় না।

বর্মী রামায়ণ-বিষয়ক নাটকের একটি বিশেষত্ব এই যে তাতে বানর এবং রাক্ষস চরিত্র (রাবণ ব্যতীত) সকলেই মুখোশ প'রে থাকে। কিন্তু যখন তাদের সংলাপ বলবার প্রয়োজন হয়, তখন মুখোশটিকে উঁচু ক'রে ধরে সংলাপ বলতে থাকে, সংলাপ বলা শেষ হ'য়ে গেলে আবার মুখোশটি প'রে নেয়। এই রীতি থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, সংলাপ বলবার রীতি পরবর্তী কালে এর সঙ্গে এসে যুক্ত হ'য়েছে; পূর্বে যা সংলাপবিহীন নৃত্য-নাট্য ছিল, তা ক্রমাবনতির পথ ধরবার ফলে তাতে সংলাপ এসে যুক্ত হ'য়েছে। কারণ, এই রীতি গ্রহণ করবার ফলে নৃত্য যে কৃত্রিম এবং স্বাচ্ছন্দ্যহীন হ'য়ে আসছে, তা বলাই বাহুল্য।

আগেই ব'লেছি, বর্মী রামায়ণের মধ্যে এমন সব ঘটনা আছে, যাদের সঙ্গে বাল্মীকি-রামায়ণের কোনো যোগ নেই। বাল্মীকি রামায়ণে যেমন তাড়কা রাক্ষসীর মুনিদের আশ্রমে গিয়ে অত্যাচার করবার কথা আছে, তেমনি বর্মী রামায়ণে একটি অত্যাচারী রাক্ষসীর চরিত্র আছে,

তার নাম কাকাবুন, প্রকৃত পক্ষে এটি একটি কাক, তার উপর দৈত্যদানব এবং রাক্ষসের শক্তি আরোপ করা হ'য়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় লৌকিক রামায়ণে এই চরিত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়, সুতরাং দেখা যায়, ভারতীয় লৌকিক ঐতিহ্যে এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ অপরিচিত নয় এবং মনে হয়, চরিত্রটি দক্ষিণ ভারত থেকে ব্রহ্মদেশে গিয়েছে।

বর্মী রামায়ণে একটি ঋষির চরিত্র আছে, তাঁর নাম বোদো। বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই নামটি পাওয়া যায় না। অথচ বর্মী রামায়ণে তার একটু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

বর্মী রামায়ণের কাহিনীতে শূর্পণখার নাম গাম্বী। রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত গাম্বী বর্মী রামায়ণে স্বর্ণমৃগীর রূপ ধারণ ক'রে রামচন্দ্রকে প্রতারিত ক'রেছিল, মারীচ কিংবা কালনেমি এ কাজ করে নি। তারপর আরও একটি প্রসঙ্গের মধ্যে বর্মী রামায়ণের সঙ্গে ভারতীয় রামায়ণের কতকটা পার্থক্য দেখা যায়; যেমন, সীতাকে যখন রাবণ হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন পথে সীতার সঙ্গে সুগ্রীবের সাক্ষাৎ হয়। সীতা তাঁর পথের নিশানা রূপে তাঁর গায়ের বহুমূল্য শালখানি সুগ্রীবের হাতে দিয়ে যান। সুগ্রীব সেখানি রামের হাতে তুলে দিয়ে সীতার পথের সন্ধান দেন এবং রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে মিতালী করেন।

ব্রহ্মদেশের নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হ'লো। তার রামায়ণ নৃত্যের প্রথম বিষয়টি হ'লো বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের অযোধ্যা যাত্রা। কাহিনীটি আমাদের দেশে সকলেরই পরিচিত, তথাপি ব্রহ্মদেশে তার সামান্য একটু ব্যতিক্রম আছে ব'লে তা এখানে উল্লেখ ক'রছি—

মুনি বোদো (ব্রহ্মদেশী রামায়ণে বিশ্বামিত্রের নাম বোদো) রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মিথিলার পথে যাত্রা ক'রেছেন। সেখানে পৃথিবীর সব চাইতে যে বড় ধনুটি ছিল, তা তাদের দেখাবেন। পথে বোদো লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি পরীক্ষা করবার জন্য লক্ষ্মণকে একটি পাকা আম খেতে দিলেন এবং তাকে বল্লেন যে রাম যেন এ কথা জানতে না পারে কিংবা তাকে যেন সে তার ভাগ না দেয়। কিন্তু লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে গোপন ক'রে কোনো কাজ করতে চাইলেন না। তিনি বোদোর নিষেধ সত্ত্বেও রাম-চন্দ্রকে একথা ব'লে দিলেন। রামচন্দ্র বোদোর এই আচরণে বিরক্ত

হ'লেন, বোদো তাঁর কথা অমান্য করবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি বিরক্ত হ'লেন এবং তাকে দণ্ড দিতে মনঃস্থ ক'রলেন।

এবার বোদো রামচন্দ্রকে দু'টি আম দিয়ে তাকে তা খেতে বল্‌লেন, লক্ষ্মণকে তা জানাতে কিংবা তার ভাগ দিতে নিষেধ করলেন। কিন্তু রামচন্দ্রও লক্ষ্মণকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু করতে চাইলেন না। তিনি বোদোর এ'কথা লক্ষ্মণের নিকট ব'লে দিলেন। শুনে লক্ষ্মণ বোদোর প্রতি বিরক্ত হ'লেন।

এই বিষয়টি অবলম্বন ক'রে ব্রহ্মদেশের প্রথম নৃত্যনাট্যটি উপস্থিত করা হ'লো। ব্রহ্মদেশীয় নিজস্ব বাদ্যভাণ্ডের তালে তালে কোনো কণ্ঠসঙ্গীতের সহায়তা ব্যতীতই অর্থাৎ পুরোপুরি 'ব্যালে'র বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে এই নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা করা হ'য়েছিল।

বোদো এবং রাম-লক্ষ্মণের রূপসজ্জা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত ছিল। তাদের মাথায় আমাদের দেশের বরের টোপরের মত মুকুট, বিশ্বামিত্রের মাথায় একটি সাধারণ বর্মী টুপীর মত, বিশ্বামিত্রের পরিধানে নানা কারুকার্য করা মূল্যবান বর্মী লুঙ্গি, গায়ে রঙ্গিন চাদর, এক হাতে দীর্ঘ লাঠি, আর এক হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, লক্ষ্মণের আপাদলম্বিত কারুকার্যকরা রাজবেশ, পায়ে জরির জুতো, রামচন্দ্রের আজানুলম্বিত রাজবেশ, জানুর নীচ থেকে পা পর্যন্ত খোলা, পায়ে জরির জুতো। কারো মুখে কোনো মুখোশ নেই।

সে দিন ব্রহ্মদেশ পর পর রামায়ণের চারটি দৃশ্যের নৃত্যানুষ্ঠান ক'রল। দ্বিতীয় দৃশ্যটি হরধনুভঙ্গ। রামায়ণের এই ঘটনাটি সুপরিচিত, তবু বিভিন্ন দেশ তার বিভিন্ন ভাবে রূপায়ণ ক'রেছে। ব্রহ্মদেশের রূপায়ণে দেখা গেল, মিথিলার রাজসভায় হরধনুতে জ্যা রোপণের প্রতিযোগিতায় মাত্র তিন জন যোগদান ক'রেছিল— রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং দশগিরি (রাবণ), প্রকৃতপক্ষে রাবণই রামচন্দ্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। দশগিরি অতি কষ্টে কোনো রকমে ধনুটি মাটি থেকে তুললেন, কিন্তু তাতে ছিলা পরাতে পারলেন না। তারপর লক্ষ্মণ ধনুটি তুললেন, তাতে ছিলাও পরালেন, তারপর তিনি ধনুটি জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের হাতে দিলেন। রামচন্দ্র তাতে তীর ছুঁড়তে চাইলেন, সেই তীর শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে নিলেন। বোদো এবং লক্ষ্মণ উভয়েরই অনুরোধে রামচন্দ্র সীতাকে ফিরে

ক'রলেন। এই কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্মণের বীরত্ব এবং মাহাত্ম্য প্রকাশ পেল, রামের নয়।

ব্রহ্মদেশ থেকে সেদিন যে তৃতীয় দৃশ্যটির নৃত্যানুষ্ঠান হ'লো, তার বিষয় সীতাহরণ। এ সম্পর্কে যে অনুষ্ঠান-লিপি বিতরণ করা হ'য়েছিল, তা'তে লেখা ছিল যে 'The object of the scene is to portray the human weakness in facing temptations'. লোভের সম্মুখীন হ'য়ে মানুষের যে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাই এর বিষয়। দশগিরির চক্রান্তে মায়ামৃগ সীতাকে প্রলুব্ধ করল, রাম সীতাকে বোঝাতে চাইলেন যে এ রাক্ষসের মায়া। কিন্তু সীতা শুনলেন না, সীতার প্রতি রামচন্দ্রের প্রেম শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'লো, নিজের বিবেক-বুদ্ধি তা দ্বারা আচ্ছন্ন ক'রে দিল, তিনি মায়ামৃগের পিছু ছুট্‌লেন, ক্রমে গভীর বনে প্রবেশ ক'রলেন।

চতুর্থ দৃশ্যটিতে দেখা গেল, সীতা দশগিরিকে প্রত্যাখ্যান ক'রছেন এবং তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তাঁর গায়ের শালটি দিয়ে কৌশলে বার বারই একটি অন্তরাল সৃষ্টি ক'রছেন, তার মধ্য দিয়ে দশগিরির সঙ্গে সীতার 'লুকোচুরি' অনেকক্ষণ ধ'রে চল্‌ল।

চারদিকে আলোকোজ্জ্বল বিশাল উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের উপর বর্মী বাদ্য-ভাণ্ড সহ নৃত্য চল্‌তে লাগ্‌ল। প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বর্মী বাদ্যরীতি একদিন উদ্ভূত হ'য়েছিল, তার সঙ্গে পরবর্তী কালে ভারতীয় এবং চীনা বাদ্যের সংমিশ্রণ হ'য়ে এক নূতন বাদ্যভাণ্ড সৃষ্টি হ'য়েছে, কিন্তু চীনা প্রভাব তাতে বেশী থাক্‌লেও তাতে কোনো পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র আজো প্রবেশ করতে পারে নি। দীর্ঘ সময় ধ'রে নৃত্য চল্‌তে লাগ্‌ল ব'লে ক্রমে তা একঘেয়ে হ'য়ে উঠ্‌ল, তবে বাদ্যভাণ্ডের একটি বিশেষ আকর্ষণ যে সৃষ্টি হ'য়েছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতবর্ষ—কথাকলি

প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী একই বর্মীনৃত্য চল্‌বার পর দক্ষিণ ভারতীয় কথাকলি নৃত্য আরম্ভ হ'লো। কথাকলির সেদিনকার বিষয়বস্তু দু'টি নিয়ে দু'টি দৃশ্যের অনুষ্ঠান হ'য়েছিল— একটি রামচন্দ্র ও পরশুরামের যুদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ অশোকবনে সীতা; প্রথমে রাবণকে তাঁর প্রত্যাখ্যান,

তারপর হনুমানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। ইন্দোনেশিয়ার কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রামায়ণ ব্যালে বল্‌তে যা বুঝায়, কথাকলি পুরোপুরি সে শ্রেণীর নৃত্য নয়। এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে রামায়ণ-নৃত্য প্রচলিত আছে, তাদের পট-ভূমিকায় কোনো কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেষণ করা হয় না। অথচ কথাকলি নৃত্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কখনো সংস্কৃত ভাষায়, কখনো বা মালয়ালাম ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চ বাদ্যভাণ্ড সহ কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেষণ করা হ'য়ে থাকে। বিদেশী দর্শকের নিকট এই কণ্ঠসঙ্গীতের কোনো আবেদন নেই, কেবলমাত্র রীতি রক্ষার প্রয়োজনে যে দর্শক-সমাজ তার একটি বর্ণও বুঝতে পারে না, তার কানের কাছে সেই সঙ্গীত উচ্চারিত হ'তে থাকে। স্ত্রীকণ্ঠে সেই সঙ্গীত পরিবেষণ করা হ'লেও তার স্বর এবং সুরগত যে মাধুর্যের একটু আবেদন থাকবার কথা ছিল, এখানে তা আনুপূর্বিক পুরুষের কণ্ঠে গীত হবার জন্য তারও অভাব দেখা দেয়। সুতরাং কণ্ঠ-সঙ্গীতের বিষয় বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নৃত্যগুণই বিদেশী দর্শকদের কাছে এখানে বিচার্য হ'য়েছিল।

তারপর নৃত্যকালে কথাকলি নৃত্যশিল্পীরা যে পোশাক ব্যবহার ক'রে, তা সর্বাংশেই কৃত্রিম, এ'রকম পোশাক কোনোকালে কেরলের সমাজে কেউ কোনোদিন কোনো উপলক্ষেই পরিধান ক'রত না। আমার স্মরণ আছে, আলোচনা-চক্রের একদিনকার অধিবেশনে কথাকলি নৃত্যের পোশা-কের কৃত্রিমতা নিয়েও কথা হ'য়েছিল। তা'তে মনে হ'য়েছিল যে বিদেশী দর্শকের কাছে তা নূতন ব'লে মনে হ'লেও তা তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেনি। সর্বশেষে কথাকলি নৃত্যের আঙ্গিক এমন কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা যে তাকে যেন লোহার ফ্রেমে আঁটা ব'লে মনে হয়। সর্বশেষে আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে বিশ্ব রামায়ণ উৎসবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যতগুলো দেশ নৃত্যানুষ্ঠান ক'রেছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র কথাকলি নৃত্য ব্যতীত আর কোনো দেশের নৃত্যে স্ত্রীর ভূমিকা পুরুষ অভিনেতা গ্রহণ করেনি; সুতরাং তাও কথাকলি নৃত্যের কৃত্রিমতার অন্যতম কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, তার ভিতর দিয়েই যে ভারতের স্বাতন্ত্র্যও প্রকাশ পেয়েছিল, তাও উপেক্ষা করা যায় না।

কথাকলি নৃত্যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়; চোখ, ভুরু, মুখ-মণ্ডল, মুখের পেশী

ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ভাবের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে। সুতরাং যারা তাঁদের ভাষা বুঝতে পারে, তারাই তার অর্থও গ্রহণ করতে পারে।

একমাত্র বালীদ্বীপ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর কোনো দেশের নৃত্যেই মুদ্রা কিংবা মুখের বিভিন্ন অংশ দিয়ে ভাব প্রকাশ করবার রীতি প্রচলিত নেই, বিদেশী দর্শকদের কাছে চোখমুখ বা মুদ্রার ভাষা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুতরাং এসব দর্শকের কাছে যে এই নৃত্য কিছুতেই কোনও আবেদন সৃষ্টি করতে পারবে না, তা খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে তা পারেও নি। চরিত্রগুলোর রূপসজ্জা প্রায় একই রকম; কে রাম, কে লক্ষ্মণ তা কেবলমাত্র তাদের মুখের এবং পোশাকের রঙ্ দেখে বুঝতে হয়, পোশাকের অন্যান্য বিষয়ে আর কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং তার অর্থ যারা জানে না, তাদের পক্ষে তা বিড়ম্বনা মাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্ত্য দর্শকের কাছে কথাকলি নৃত্যের আর একটি যে ত্রুটি ব'লে মনে হয়, তা তার মন্থর গতি। এক মাত্র পরশুরাম ও রামের যুদ্ধ এবং অশোকবনে সীতা বিষয় দু'টির পুরো দু'ঘণ্টা ধ'রে নৃত্য চলছিল, তার পটভূমিকায় এই দীর্ঘ সময় ধ'রে পুরুষ-কণ্ঠে ছেন্দা ও মণ্ডলম্ (কেরলের ঢোল) সহযোগে পুরুষ-কণ্ঠে সঙ্গীত অব্যাহত চলছিল। আগেই ব'লেছি, কথাকলি নৃত্যে স্ত্রীজাতির কোনো স্থান নেই, সেইজন্য যিনি সীতার অংশে নৃত্য ক'রেছিলেন, তিনি পুরুষ। তার রূপসজ্জা যে 'অপৌরুষেয়' হ'য়েছিল, একথা বলা যায় না।

যে বিশাল উন্মুক্ত মঞ্চের উপর তাদের নৃত্যের ব্যবস্থা হ'য়েছিল, তার ঠিক মাঝখানে দর্শকদের কাছ থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করবার জন্য তাদের আঙ্গিক অভিনয় কারো দৃষ্টিগোচর হয় নি, তার উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'য়েছে বলতে হয়, তার উপর তারা যেন মঞ্চের উপর হারিয়ে গিয়েছে ব'লে মনে হ'য়েছিল। কথাকলি নৃত্যের আর দু'একটি যা ত্রুটি আমার মনে হয়, তা একান্ত আঙ্গিক-নির্ভর হওয়ার জন্য যেমন তা অনেকটা কৃত্রিম, তেমনই ঘটনার মধ্যে নাটকীয় দ্রুততার অভাবের জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তা একঘেয়ে হ'য়ে উঠে। বিশেষতঃ যারা মুদ্রা, কিংবা মুখচোখের ভিতর দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তির অর্থ বুঝে না, কিংবা গানের ভাষা অনুসরণ ক'রতে পারে না, তাদের কাছে তা নূতনত্ব প্রকাশ করলেও কোনো রসগত আবেদন সৃষ্টি ক'রতে পারে না। লোক-নৃত্যের স্তর থেকে তা শাস্ত্রীয়

নৃত্যে উত্তীর্ণ হবার ফলে তার শাস্ত্রীয় চরিত্র যাতে সম্পূর্ণ অটুট থাকে, সেই বিষয়ে এর শিল্পীদের যত দৃষ্টি, স্বতঃস্ফূর্ত রস পরিবেষণের প্রতি তাদের তত লক্ষ্য নেই।

যাই হোক, সেদিনকার অনুষ্ঠান শেষ হ'য়ে যাবার পর আমি সাজ-ঘরে কথাকলি দলের নেতা শ্রীওয়ারিয়রকে অভিনন্দন জানাতে গেলাম। গিয়ে দেখি, সেখানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন, রাষ্ট্রদূত দক্ষিণ ভারতের কেরলেরই অধিবাসী ছিলেন।

রামচন্দ্রের সঙ্গে পরশুরামের যুদ্ধের বিষয়টি রামায়ণের একটি সুপরিচিত বিষয়। রামচন্দ্র জনকের সভায় হরধনু ভঙ্গ ক'রে সীতাকে লাভ করবার পর পরম ক্ষত্রিয়-বিদ্বেষী শিব-ভক্ত ব্রাহ্মণ পরশুরাম তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবের ধনু ভঙ্গ করবার জন্য রামচন্দ্রকে গিয়ে আক্রমণ করলেন, তারপর যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, তখন তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে তাঁকে প্রণাম ক'রে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

অশোকবনে সীতার রাবণকে প্রত্যাখ্যানের বৃত্তান্ত পুরোপুরি বাল্মীকি রামায়ণ থেকে গৃহীত হ'য়েছিল, তারপর হনুমান কর্তৃক সীতার হাতে রাম-চন্দ্রের অঙ্গুরী দানের কাহিনীও পুরোপুরি সংস্কৃত রামায়ণ-সম্মত, তবে সীতা নিজের খোঁপা থেকে একটি চুলের কাঁটা তুলে নিয়ে হনুমানের হাতে অভিজ্ঞান স্বরূপ যে রামচন্দ্রকে দিবার জন্য পাঠালেন, তা বাল্মীকির কাহিনী বহির্ভূত।

পাশ্চাত্ত্য দর্শকেরা ভারতীয় নৃত্যের মধ্যে দু'টি অভাবের উল্লেখ ক'রে থাকেন; প্রথমতঃ গতি, দ্বিতীয়তঃ পৌরুষ। কথাকলি নৃত্যে গতির অভাব থাকলেও তা'তে অন্ততঃ পৌরুষের অভাব নেই। কথাকলি কাহিনী-ভিত্তিক (Thematic) নৃত্য; তার কাহিনী রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনীগুলো থেকেই সংগৃহীত হ'য়ে থাকে। সেইজন্য তা'তে পৌরুষের অভাব দেখা যায় না। বিশেষতঃ কথাকলি নৃত্য পশ্চিম বাংলার ছৌ নৃত্যের মত পুরুষেরই নৃত্য, তা'তে কোনো নারী অংশ গ্রহণ করে না। সুতরাং কোনো দিক থেকেই তা'তে পৌরুষের অভাব হ'বার কথা নয়। কিন্তু তা'তে গতির অভাব পূর্ণ হয় না।

খেমর্ (কম্বোডিয়া)

আজ রামায়ণ উৎসবে দু'টি দেশ অংশ গ্রহণ করবে, প্রথমতঃ খেমর্ বা কম্বোডিয়া, দ্বিতীয়তঃ বালীদ্বীপ। সুতরাং আজ দু'টি নূতন দেশের অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে, বিশেষতঃ আজ বালীদ্বীপের অনুষ্ঠান হবে ব'লে সকাল থেকে খুব উৎসাহ অনুভব করতে লাগলাম।

খেমর্ বা কম্বোডিয়ার ব্যালে নৃত্য অত্যন্ত প্রাচীন। অতি প্রাচীন কাল থেকেই তাতে রামায়ণের বিষয়-বস্তু গৃহীত হ'য়ে আসছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগেই সেদেশে ভারতবর্ষ থেকে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারক এবং বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায় রামায়ণের কাহিনী সেখানে নীত হয়। তারপর থেকেই রামায়ণের কাহিনী কেন্দ্র ক'রেই সেদেশের নৃত্যগীত বিশেষতঃ ব্যালে নৃত্য সেদেশে গ'ড়ে উঠতে থাকে। তার ধারা আজ পর্যন্ত সেখানে অব্যাহত ভাবে চ'লে আসছে। আজও সেদেশে রামায়ণ বিষয়ক ব্যালে নৃত্য সব চাইতে জনপ্রিয়। কঠিন পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ভিতর দিয়ে তা সে দেশের তরুণ-তরুণী আজো অনুশীলন ক'রে থাকে।

ছ' বছর বয়স থেকেই কম্বোডিয়ার ছেলেমেয়েরা নৃত্য শিখতে আরম্ভ করে। তারপর দীর্ঘদিন ধ'রে তার অনুশীলন চলতে থাকে। শারীরিক ব্যায়াম, হাতের আঙ্গুলগুলো নিয়ে নানা ভাবে নাড়াচাড়ার অভ্যাস এগুলোর ভিতর দিয়ে তাদের নৃত্যশিক্ষা আরম্ভ হয়, তারপর হাঁটুর উপর বসা, কোমর সামনে পিছনে নানা ভাবে সঞ্চালন করা এসবের উপরই নৃত্যের ভিত্তি গড়া হয়। তারপর শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনীর শরীরটা যখন বেশ মজবুত হয়, তখন নৃত্যের মূল ভঙ্গি যেমন নমস্কার, উত্থান, চলা, দেখা এ'সব শেখানো হ'তে থাকে। তারপর ভাবের অভিব্যক্তি যেমন দুঃখ, আনন্দ, অনুতাপ, বিস্ময় ইত্যাদি শেখানো হয়। ক্রমাগত এগুলো অভ্যাস করবার পর শিল্পী নৃত্যের উপযোগী ব'লে গণ্য হয়। নৃত্য কম্বোডিয়ার জাতীয় জীবনে একটি বিশিষ্ট সাধনার বিষয়।

আজ সন্ধ্যা ৬৷৷০ টার আগেই গিয়ে আমরা পাণ্ডালের মুক্তাঙ্গনে

উপস্থিত হ'য়ে নির্দিষ্ট আসনে ব'সে অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'বার জন্য অপেক্ষা ক'রতে লাগলাম। সেদিনও অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার দর্শক সেখানে সমবেত হ'য়েছেন। তাদের মধ্যে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রায় অর্ধেক লোক এসেছে।

কম্বোডিয়ার নৃত্যে সেদিন রামায়ণের যে চারটি দৃশ্যের অনুষ্ঠান করবার কথা, তা রাম-বনবাস, রাবণের প্রাসাদে (অশোক বনে নয়) সীতার হস্তে হনুমানের শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরী দান, হনুমানের সঙ্গে মৎস্য-রানীর সাক্ষাৎ ও লঙ্কা যুদ্ধ।

নৃত্যের রূপসজ্জা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত ছিল। যদিও রাম-লক্ষণ-সীতা এঁরা সবাই বনবাসে এসেছিলেন, তথাপি তাদের সকলেরই পরিধানে রাজবেশ। প্রত্যেকেরই মাথায় উচ্চচূড় মুকুট। মুকুটগুলো কম্বোডিয়ার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির আঙ্কোর বটে খোদিত মূর্তিগুলোর মাথার মুকুটের মত কিংবা আমাদের দেশের বরের মাথার টোপরগুলো যদি মাথার দিকে আরো কিছুটা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হ'য়ে উঠে, তবে দেখ্‌তে যেমন হয়, তেমনি। রাম-লক্ষ্মণের রাজবেশ নানা কারুকার্য খচিত, গায়ে আঁটজামা, হাঁটুর সামান্য নীচ পর্যন্ত লম্বিত পা-জামা। সীতার পরিধানে বহুমূল্য বিচিত্রিত লুঙ্গি। গায়ে কোনো জামা নাই, কেবলমাত্র একটি নানা কারুকার্য খচিত কাঁচুলি বক্ষ-আচ্ছাদনীর কাজ করছে। রাম-লক্ষ্মণের হাতে ধনু।

নাচের গতি অত্যন্ত মৃদু। বাদ্যটি সুমিষ্ট। প্রথম দৃশ্যটির বিষয়বস্তু দণ্ডকারণ্যে রামের বনবাস-জীবন এবং শেষ পর্যন্ত রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ; কাহিনীটির সংস্কৃত রামায়ণ থেকে সামান্য একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। তা এই—দণ্ডকারণ্যে একদিন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় রাবণ সেখানে এসে অন্তরাল থেকে সীতাকে দেখ্‌তে পেয়ে তার প্রতি প্রলুব্ধ হ'লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি সোনার হরিণের রূপ ধারণ ক'রে সীতার সামনে এলেন। সীতা রামচন্দ্রকে সেটি ধ'রে দিতে বল্লেন, রামচন্দ্র এবং পরে লক্ষ্মণ তার অনুসরণ ক'রে দৃশ্য থেকে নিক্রান্ত হ'লেন। হরিণ-রূপী রাবণ গভীর বনে পালিয়ে গেলেন। এবার রাবণ এক যোগীর বেশ ধ'রে সীতার সামনে হাজির হ'লেন, তিনি কপট গণনা ক'রে সীতাকে বল্‌লেন, তিনি দানব-রাজের ঘরণী হবেন। শুনে সীতা ক্রুদ্ধ হ'রে ছদ্মবেশী রাবণকে প্রহার ক'রলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাবণ নিজমূর্তি

ধারণ ক'রে সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেলেন। শূন্য কুটিরে ফিরে এসে রামচন্দ্র সীতার বিচ্ছেদে কাতর হ'য়ে প'ড়লেন। লক্ষ্মণ পরামর্শ দিলেন যে সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য হনুমানের সাহায্য প্রয়োজন, সেজন্য দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। দেবতাদের সহায়তায় তাঁরা হনুমানকে সহায়করূপে পেয়ে তার হাতে রামের অঙ্গুরীটি দিয়ে তাকে সীতাকে খুঁজবার জন্য পাঠালেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যটির স্থান রাবণের প্রাসাদ, সেখানে সীতা বন্দিনী (অশোক বনে নয়)। রাবণ সেখানে সীতাকে তাঁর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করবার জন্য প্রথমতঃ অনুরোধ, তারপর ভয়, তারপর গায়ের জোর দেখাতে চাইলেন। কিন্তু এক দিব্য জ্যোতি দ্বারা সীতার দেহ সংরক্ষিত ছিল ব'লে রাবণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারলেন না। রাবণ ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে সীতাকে নিরন্তর উৎপীড়ন করবার জন্য দু'জন রাক্ষসীকে নিযুক্ত ক'রে গেলেন। এমন সময় হনুমান আবির্ভূত হ'য়ে সীতার হাতে রামচন্দ্রের অঙ্গুরী দিল।

তৃতীয় দৃশ্যটির বিষয়বস্তু বাল্মীকি-রামায়ণে নেই, কম্বোডিয়ার রামায়ণে স্থানীয় কোনো কাহিনী থেকে প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকবে। তা হ'লো হনুমানের সঙ্গে মৎস্যরানীর সাক্ষাৎকার। মৎস্যরানী অর্ধ নারী, অর্ধ মৎস্য। কি ভাবে সেতু বন্ধন হ'তে পারে, তিনি হনুমানকে তার পরামর্শ দিলেন।

সেদিনকার কম্বোডিয়ার রামায়ণ নৃত্যের শেষ বিষয়টি ছিল, লঙ্কা-যুদ্ধ। মুখোশ পরা রাক্ষস ও বানর সৈন্যদলের যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র এবং মুখোশ পরা রাবণের দ্বৈত যুদ্ধে এসে সমাপ্ত হ'লো। রামচন্দ্র এক দিব্য অস্ত্রের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত রাবণকে বধ করলেন। রামচন্দ্র এবং সীতার মিলন হ'লো, দু'জনের দীর্ঘকাল ব্যাপী যুগ্ম নৃত্যের ভিতর দিয়ে কম্বোডিয়ার রামায়ণ-নৃত্যের অনুষ্ঠান সে দিন শেষ হ'লো। রামসীতার মিলনের পূর্বে এখানে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ব'লে কিছু দেখতে পাওয়া গেল না।

বালীদ্বীপ

বালীদ্বীপের নৃত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাভাযাত্রীর পথে লিখেছেন যে সে নৃত্যের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে তিনি অক্ষম। সমস্ত জীবন-সাধনায় যিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বিশ্ব সৌন্দর্যের বিচিত্র রূপের

স্তবগান ক'রেছেন, তিনি যে বিষয় বর্ণনা করতে অক্ষমতা প্রকাশ ক'রেছেন, সে বিষয়ে আমার কিছু লিখ্‌বার প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। রাজ্যপালের নৈশভোজ সভায় প্রথম দিনই বালীদ্বীপের নৃত্যের সামান্য একটু অংশ দেখেই তা বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। আজ সেই বালীদ্বীপের নৃত্য এই বিশাল উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের উপর বিস্তৃততর রূপে দেখ্‌বার সুযোগ পাওয়া গেল। এই সৌভাগ্য কোনোদিন জীবনে আস্‌তে পারে, তা আগে কোনোদিন কল্পনাও ক'রতে পারি নি। সুতরাং সে দিনটি জীবনে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

কম্বোডিয়ার নৃত্য শেষ হ'তে রাত্রি ৮॥ টা বেজে গেল, এবার আজকের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান রূপে বালীদ্বীপের নৃত্য আরম্ভ হওয়ার পালা। অনুষ্ঠান লিপিতে আজকে বালীদ্বীপের নৃত্যের বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা ছিল,— The story of the performance danced continuously, starts from the exile of Rama in the forest until the meeting of Rama and Sinta after the death of Rahwana. অর্থাৎ রামচন্দ্রের বনগমন থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমান্বয়ে রাম-সীতা (সীতার নাম এখানে সিন্তা)-র মিলন পর্যন্ত সমগ্র কাহিনীরই নৃত্যানুষ্ঠান হবে।

রামায়ণের বিভিন্ন অংশ থেকে নানা রকম ঘটনা নির্বাচন ক'রে পর পর অনুষ্ঠান ক'রলে কাহিনীর ধারা বিসর্জিত হয়, তার ফলে তা দিয়ে যেমন কোনো অখণ্ড রস সৃষ্টি হ'তে পারে না, এখানে তা হয় নি। এখানে দৃশ্যের পর দৃশ্য ঘটনার পরম্পরা রক্ষা ক'রে অগ্রসর হ'য়ে যাওয়ার ফলে দর্শক-মনের উপর তার প্রভাব সক্রিয় হ'য়েছে ব'লে প্রত্যক্ষই অনুভব করা গেল।

প্রথমই রামচন্দ্রের বনগমন দৃশ্যটির নৃত্যানুষ্ঠান হ'লো। চল্লিশ হাজার বর্গফুট জুড়ে যে রঙ্গমঞ্চটির উপর এতদিন কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ নৃত্যের জন্য ব্যবহৃত হ'য়ে আস্‌ছিল, আজ তার বিশালতার প্রয়োজনটি যথার্থ বুঝ্‌তে পারা গেল। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাসে চ'লেছেন, সমগ্র রঙ্গমঞ্চটি জুড়ে অগণিত অযোধ্যাবাসী স্ত্রীপুরুষ এক করুণ নৃত্যভঙ্গি সহকারে তাদের অনুগমন করছেন। একটি করুণ রসের প্রবাহ যেন রঙ্গমঞ্চটির উপর দিয়ে ব'য়ে চ'লেছে। রামায়ণের বিশালতা, লোকের

গভীরতা, রাজপরিবারের বিপুল জনপ্রিয়তা সব কিছুই যেন রঙ্গমঞ্চের উপর মূর্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তখন বুঝ্‌তে পারা গেল, এই বিশাল রঙ্গমঞ্চই এই বিশাল এবং সুগভীর কোনো বিষয়ের প্রকাশের এক মাত্র ক্ষেত্র। একে কোনো দিক থেকে ছোট কর্‌লে, সমগ্র পরিবেশ এবং তার উপর সংঘটিত বিষয়টিকেও ছোট করা হয়।

তারপরই গুহক মিলনের একটি দৃশ্যের পর দণ্ডকারণ্যের দৃশ্য। সমগ্র মঞ্চটি এই দৃশ্যটি অধিকার ক'রে নিয়েছে, একটি মাত্র অংশে অভিনয় কেন্দ্রীভূত হয় নি। বিশাল অরণ্যের মধ্য থেকে লক্ষ্মণ বনফল আহরণ ক'রে রাম-সীতার চরণে সমর্পণ করছেন। বনের বিস্তার, তার গভীরতা, তার পথ-সঙ্কট, সব যেন তাঁর নৃত্যের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে, আর এক দিকে অরণ্য-প্রকৃতির সাহচর্যে রাম-সীতার প্রসন্নতাও তাদের নৃত্যভঙ্গির ভিতর দিয়ে গোপন হ'য়ে নেই। সেই মুহূর্তে শূর্পণখার আবির্ভাব। তার নৃত্যের মধ্য দিয়েও রাক্ষসী-সুলভ অশালীনতা প্রায় কিছুই নেই, রামচন্দ্র কিংবা লক্ষ্মণকে ভুলাবার প্রয়াসের মধ্যে কোনো হীন আবেদনও নেই। রামায়ণ জীবনের কাব্য; সে জীবন যেমন পবিত্র, তেমনই সত্য। রামায়ণের কবি তা যেমন রচনা ক'রেছেন, পরম সৌন্দর্যের অভিসারী শিল্পীরাও তেমন তার মর্যাদা রক্ষা ক'রেছেন। লক্ষ্মণ নৃত্য-ভঙ্গিতে তীর নিক্ষেপ ক'রে শূর্পণখার নাসিকা ছেদন ক'রলেন। অপমানিতা যন্ত্রণাকাতর শূর্পণখা বিশাল রঙ্গমঞ্চের সুদীর্ঘ পথ বহুদূর অতিক্রম ক'রে ক্রমে মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। রঙ্গমঞ্চের সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঘটনাস্থানের দূরত্ব আমরা কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারি না, এ বিষয়ে কোনো দৃষ্টি-বিভ্রম (illusion) সৃষ্টি হবারও কোনো অবকাশ হয় না। কিন্তু এই বিশাল রঙ্গমঞ্চের উপর সে বিষয়ে কিছুমাত্র ভুল হয় না। অপমানিতা শূর্পণখা দূরে আরো দূরে বহুদূরে শেষ পর্যন্ত একটি রেখার অন্ত মিলিয়ে গেল। এই বিশাল রঙ্গমঞ্চেই এই দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি হ'তে পারে, বাঁধা-ধরা সঙ্কীর্ণ নাট্যমঞ্চে তা কখনো হ'তে পারে না।

আপাতত বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেও শূর্পণখার ঘটনা যে ভবিষ্যৎ কঠিনতর বিপদের ইঙ্গিত দিয়ে গেল, তা তখনকার রাম-লক্ষ্মণের নৃত্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল। সীতার নৃত্য প্রধানতঃ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্থির হ'য়ে আছে, পদক্ষেপে তার ক্ষিপ্রতা কিংবা দ্রুত সঞ্চরণ

শালতা নেই, তা একান্ত ভাবে দেহ-ভঙ্গি নির্ভর। ভগবৎ-প্রদত্ত এই নর-দেহটি বিশেষ যে একটি ভঙ্গির মধ্য দিয়ে একটি মহাকাব্যের ভাব ব্যক্ত ক'রতে পারে, সেদিন সীতার নৃত্য দেখে তা বুঝেছিলাম। সে নৃত্যে বহির্মুখী চপলতা ছিল না, অতলস্পর্শী গভীরতা ছিল, সে যে কি জিনিস আমিও ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না।

রাম-লক্ষ্মণের কি নিখুঁত রূপসজ্জা! আমাদের দেশে যাত্রায়, রাম-যাত্রায়, নাট্যাভিনয়ে, রামলীলায়, রাম-লক্ষ্মণের কত রকম রূপসজ্জা দেখেছি, এমনটি ত কোথাও দেখি নি! অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের বিলাস-জীবন সুলভ কমনীয়তা দেহ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে, যেন তপঃক্লিষ্ট বনবাসীর মূর্তি কেবল মাত্র কঠিন পাষাণের উপাদানে গঠিত হয়েছে। প্রাম্বানামের শিবমন্দিরের গায়ে চারদিক ঘিরে যে রামায়ণ কাহিনী পাথরে খোদাই করা আছে, সেখান থেকেই যেন রাম-লক্ষ্মণের মূর্তি দু'টি সজীব হ'য়ে উঠে এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের অনুষ্ঠান করছে। অর্থাৎ রূপকারদের চোখের সামনে যে একটি আদর্শ ছিল, সেই আদর্শটি লক্ষ্য রেখেই এখানে রাম-লক্ষণের রূপসজ্জা করা হ'য়েছে।

রাম-লক্ষ্মণের পরিধানে কটিবাস, পৃষ্ঠে তূণ, হাতে ধনু, মাথায় ঊর্ধ্ব-মুখী জটা, কাঁধে বিলম্বিত যজ্ঞোপবীত। সীতার রূপ-সজ্জার মধ্যে ইন্দোনেশীয় নারীর রূপ-সজ্জার বৈশিষ্ট্যটুকু সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, পরিধানে বিচিত্রিত লুঙ্গি, বক্ষ কাঁচুলিবদ্ধ, তার উপর ওড়না, মাথায় ফুলের মুকুট।

এমন সময় সোনার হরিণ এসে সেই দৃশ্যে প্রবেশ করল। সারা মঞ্চটি জুড়ে সোনার হরিণ নেচে বেড়াতে লাগল, তার মুখে হরিণের মুখোশ, গায়ে চিত্রা হরিণের রূপ-সজ্জা। তার নৃত্যের মধ্য দিয়ে সমস্ত বনটি যেন আবার জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তারপর যথারীতি কাহিনী। সীতার বিভ্রম সৃষ্টি হ'লো। তিনি হরিণটিকে জীবন্ত ধ'রে দেবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ জানালেন। সেই অনুরোধ জানানোর মধ্যেও যেন একটা শিশুসুলভ অদম্য ব্যগ্রতা নেই, কোনো অর্থহীন চাপল্য নেই। মনে হ'লো যেন তাঁর নিয়তি এসে হরিণের রূপ ধ'রে সেখানে আবির্ভূত হ'য়েছে এবং ধীরে ধীরে তিনি নিয়তির ছড়ানো জালে পা বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তা থেকে যেন কিছুতেই বিরত থাক্‌তে পাচ্ছেন না। লক্ষণের নিষেধ সত্ত্বেও রামচন্দ্র হরিণের পশ্চাদ্ধাবন ক'রলেন। বিশাল মঞ্চের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে রামচন্দ্র

হরিণকে অনুসরণ ক'রে দূর থেকে দূরে আরো দূর থেকে আরো দূরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন বহু দূর হতে রামচন্দ্রের কণ্ঠে এক আর্তনাদ শোনা গেল, সীতা তা'তে চমকে উঠ্‌লেন, কিন্তু লক্ষ্মণ স্থির হ'য়ে রইলেন, সীতাকে আশ্বাস দিলেন, এ রামের কণ্ঠ নয়, এ কোনো মায়াবী রাক্ষসের কণ্ঠ। কিন্তু সীতার চঞ্চলতা দূর হ'লো না। তিনি উৎকর্ণ হ'য়ে বহু দূরাগত রামচন্দ্রের কণ্ঠে আর্তনাদ শুন্‌তে লাগলেন, লক্ষ্মণকে তার সাহায্যে যাবার জন্য প্রথমত স্নেহের ভঙ্গিতে মিনতি, তারপর কর্তব্য পালনে অনুরোধ, শেষ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠের অধিকার নিয়ে আদেশ ক'রলেন। কিন্তু তথাপি লক্ষ্মণ অবিচলিত রইলেন, সীতার বিপদ আসন্ন বুঝ্‌তে পেরে তিনি সেখানে স্থির হ'য়ে রইলেন। তারপর সীতা লক্ষ্মণকে কঠিন বাক্যে বিদ্ধ ক'রে যখন অভিশাপ দিতে উদ্যত হ'লেন, তখন লক্ষ্মণ তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে মঞ্চ থেকে তেমনই দূর থেকে দূরে আরো দূরে যেন বিলীন হ'য়ে গেলেন, একে যেন যথার্থ নিষ্ক্রান্ত হওয়াও বলা যায় না।

বিশাল দৃশ্যের মধ্যে সীতা নিঃসঙ্গিনী, তাঁর চোখমুখ এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্য দিয়েই সেই বিশাল অরণ্যে তার অসহায় অবস্থাটুকু ফুটে উঠেছে, চোখে মুখে আশঙ্কা এবং ভয়ের ছাপ প'ড়েছে। নিষ্ঠুর নিয়তির খেলা তার জীবনে আরম্ভ হ'য়েছে, তাই তার মধ্যে আর যেন সেই প্রফুল্লতা, দৃপ্ত আত্মবিশ্বাস নেই। বাদ্যভাণ্ডের সুরে এবং সীতার মূক নৃত্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই ভাবটি সুন্দর প্রকাশ পেলো। পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক দেশী বিদেশী জনতা ভারতীয় কবি বাল্মীকির অমর কাব্যের এক অভাবনীয় রূপায়ণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্তব্ধ হ'য়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

প্রতিটি মুহূর্ত যখন আশঙ্কায় অনিশ্চয়তায় কাটছে তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে যোগী বেশী রাবণের প্রবেশ। বহুদূর প্রবেশ পথ দিয়ে ধীর লয়ে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে অরণ্য পথের নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে ক'রে তিনি একেবারে সীতার সামনে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌লেন। আশঙ্কায় সীতার বুক কেঁপে উঠ্‌ল। নৃত্যের মধ্য দিয়েই তিনি তাকে ক্ষণিক অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌লেন, তিনি বুঝাতে চাইলেন, তাঁর স্বামী, তাঁর দেবর এখনই ফিরবেন, তাঁরা ফিরে এ'লেই তিনি তাঁকে তাঁর মনোমতো ভিক্ষা দেবেন। কিন্তু তিনি বাইরে আস্‌তে পাচ্ছেন না। যোগীবেশী রাবণের

নৃত্য চল্‌তে লাগ্‌ল। নৃত্য যে কথা বলে তা অনেকক্ষণ ধ'রেই বুঝেছি, যোগীবেশী রাবণের নৃত্যও যেন কথা বল্‌তে লাগ্‌ল, বোঝাতে লাগ্‌ল, আমি ভিক্ষুক, দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ, তোমার কুটীর দ্বারে আবদ্ধ হ'য়ে থাকলে আমার অন্য দ্বারে যাওয়া হয় না। তুমি আমাকে সত্বর বিদায় কর। সীতাকে তথাপি নিরুত্তর দেখে, তিনি তাঁকে ক্রুদ্ধ হ'য়ে অভিশাপ দিতে উদ্যত হ'লেন ; সীতা ভীতা হ'য়ে ভিক্ষা'পাত্র নিয়ে অগ্রসর হ'তেই রাবণ স্বমূর্তি ধারণ ক'রলেন, কিন্তু সীতাকে স্পর্শ ক'রলেন না, বরং সীতাকে বেষ্টন ক'রে একবার মাত্র বীরদর্পে বলিষ্ঠ পদ-ক্ষেপে বৃত্তাকারে নৃত্য ক'রলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, সীতা যেন মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছেন, মাথাটি তাঁর বাম কাঁধের উপর হেলে পড়েছে। চোখে মুখে যে উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কার ভাব এতক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল, তা নিমেষে অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়ে চক্ষু নিমীলিত হ'য়ে প'ড়েছে, দু হাত বক্ষের উপর স্থাপন ক'রে নিমীলিত নেত্রে, বাঁ কাঁধের উপর মাথাটি ঈষৎ হেলিয়ে দিয়ে তিনি এক হতাশার ভঙ্গিতে সেখানে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, রাজবেশী রাবণ তাকে ঘুরে ঘুরে বীরত্ব ব্যঞ্জক ভঙ্গিতে অপূর্ব নৃত্য করতে লাগ্‌লেন।

রাবণের 'নিজ মূর্তি' অর্থে আমাদের দেশের মূর্তি নয়, অর্থাৎ তার দশমুণ্ডও নেই, কিংবা কুড়ি হাতও নেই, কিংবা তার আকৃতিতে দানব কিংবা রাক্ষসের রূপ বল্‌তে আমরা যা বুঝি, তাও কিছু নেই। তিনি সুন্দর নবযৌবনোদ্দীপ্ত সুপুরুষ, মাথায় রাজমুকুট, খোলা গায়ে বাম কাঁধের উপর থেকে ডান দিককার কোমরের উপর বিলম্বিত রত্নখচিত একখণ্ড পট্টাবরণ, হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত মালকোঁচা দিয়ে পরা রক্তিম পট্টবস্ত্র। অপূর্ব সুন্দর পুরুষ মূর্তি। সাধারণ ইন্দোনেশীয় পুরুষের চাইতেও আকারে দীর্ঘতর। মোহাচ্ছন্ন সীতাকে বেষ্টন ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে চক্রাকারে তাঁর নৃত্য চল্‌তে লাগ্‌ল। সেই নৃত্যে কঠিন কোমল, পৌরুষ ও লাবণ্যের যেন একত্র সংমিশ্রণ হ'য়েছিল। রাবণের নৃত্যও যে দর্শনীয় উপভোগ্য হ'তে পারে, আমি আগে তা কোনোদিন বুঝ্‌তে পারি নি।

অনেকক্ষণ নৃত্য করবার পর রাবণ এবার নিষ্ক্রমণের পথ লক্ষ্য ক'রে ধীরে ধীরে নৃত্যভঙ্গিসহ অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। মোহাচ্ছন্ন সীতা তেমনই মাথাটি বাঁ কাঁধের উপর ন্যস্ত ক'রে নিয়ে তার পিছন পিছন চললেন।

রাবণ সীতাকে হাত দিয়ে স্পর্শও কর্‌লেন না, তবু সীতা যেন মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে তাকে অনুসরণ ক'রে চল্‌তে লাগ্‌লেন, রাবণের পথ চলার নৃত্যে বিজয়ের উল্লাস ব্যক্ত হ'তে লাগ্‌ল ; সীতার এক মোহাচ্ছন্ন ভাব, তাঁর যেন কোনো জ্ঞান নেই। এইভাবে বাইরে যাবার পথ ধ'রে নৃত্যভঙ্গিসহ রাবণ মঞ্চের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম কর্‌তে লাগ্‌লেন, পিছনে সীতা যেন কি এক অদৃশ্য শক্তির বন্ধনে রাবণের পিছন পিছন চল্‌লেন।

তারপর তারা দূর থেকে দূরে চলে গেলেন, শেষ পর্যন্ত মনে হ'লো, তারা যেন আর মাটির উপর দিয়ে পা ফেলে চল্‌ছেন না, পা তাদের শূন্যে উঠে গেছে, আলো ও ছায়ায় এমনই দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি হ'লো, এইভাবেই মঞ্চের শেষ প্রান্তে গিয়ে তারা কতকটা অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

আমাদের দেশে যখন আমরা কোনো যাত্রায়ই হোক, কিংবা নাটকেই হোক, সীতাহরণের দৃশ্য দেখেছি, তখনই দেখেছি যে হরণ ক'রে নিয়ে যাবার পূর্বে রাবণ দৃঢ় মুষ্টিতে সীতার হাত ধ'রেছেন, তারপর তাকে এক রকম হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়েছেন। কিন্তু রাবণ সীতার দেহ স্পর্শ কর্‌লেই যে সীতার মধ্যে পাপ স্পর্শ করে, তা কেউ কোনোদিন চিন্তা ক'রেও দেখবার অবকাশ পান না। কিন্তু এখানে সীতাকে রাবণের স্পর্শ না করার মধ্যে সীতার পবিত্রতা রক্ষা পেয়েছে। রাবণ সীতাকে তাঁর বীরত্ব দিয়েই হোক, গুণ দিয়েই হোক, কিংবা ঐন্দ্রজালিক শক্তি দিয়েই হোক মোহাচ্ছন্ন ক'রেছেন। তাকে বশ কর্‌বার জন্য তাঁর নিজের দৈহিক বল যে প্রকাশ করেননি, তাতে রামায়ণ কাহিনীর পবিত্রতা রক্ষা পেয়েছে। সীতাহরণ ঘটনার নির্মমতার মধ্যেও এই ইঙ্গিতটুকু সীতাচরিত্রকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছে। সীতাচরিত্রের পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে রাবণের চরিত্রের গৌরবও তাতে বৃদ্ধি পেয়েছে; কারণ, তার মধ্যে শৌর্য বীর্য বুদ্ধি কিংবা কৌশল প্রকাশ পেলেও কোনও নীচতা কিংবা ইতরতা প্রকাশ পায় নি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে বলেছিলেন, Ravana is a grand man, এখানে যেন রাবণের সেই grandeur বা মহত্ত্বের সন্ধান পেলাম।

আমি আগেও ব'লেছি, আবারও এখানে অনুভব ক'রেছি, আমাদের [illegible] আবদ্ধ রঙ্গমঞ্চগুলো আমাদের ক্ষুদ্র এবং অপরিসর জীবন-

নাট্যের অভিনয়েরই উপযোগী ; কিন্তু যা যুগ-যুগান্তর ব্যাপী জাতির মহা-কাব্য তা অভিনয়ের উপযুক্ত নয়। সুতরাং এই বিশাল মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চটিই যেন তার অভিনয়ের যোগ্য স্থান।

আগেই ব'লেছি, এই বিশাল রঙ্গমঞ্চের উত্তর সীমানায় তিনটি প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের দ্বার। পশ্চিম-উত্তর কোণের দ্বারপথে রাবণ সীতাকে নিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছেন, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তর-পূর্ব দ্বারপথে আবার তেমনই ভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রলেন। নৃত্যে তার পথ চলার ভঙ্গি, পিছনে অনুসরণকারিণী মোহাচ্ছন্না সীতা, বাম কাঁধের উপর মাথাটি ঈষৎ বিন্যস্ত।

মঞ্চের মধ্যভাগে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের ভিতর থেকে এক বিশাল পক্ষী যেন উড়ে এসে রাবণের পথ রোধ করল। সে জটায়ু। সেই বিশাল পক্ষীর রূপসজ্জা বর্ণনা করবার আমার ভাষা নেই। উচ্চতায় ৬ | ৭ ফুট হবে, গায়ের রং টিয়া পাখীর মত সবুজ, বিশাল ঠোঁট ও তীক্ষ্ণ নখাগ্র দিয়ে সে রাবণকে আঘাত করতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে যেন সীতার সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি রাবণের পিছন থেকে মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে এসে যেন পরম নির্ভয়ে জটায়ুর পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেন। রাবণ জটায়ুকে প্রত্যাঘাত করতে লাগলেন। হাতে কোনো অস্ত্র নেই, তবু 'অস্ত্র' দিয়ে সদর্পে আঘাত ক'রে নৃত্য করতে লাগলেন। গ্যামেলিনের বাদ্য সময়োচিত হ'য়ে উঠে সমগ্র পরিবেশটিকে একটি যেন রণাঙ্গন ক'রে তুলল। ক্রোধে আক্রোশে বিশাল দেহ জটায়ু পক্ষী বার বার তার ডানা বিস্তার ক'রে ঠোঁট এবং নখ দিয়ে রাবণকে আঘাত করতে লাগল। এ যুদ্ধ অনেকক্ষণ ধ'রে চলল। সহসা জটায়ু ধরাশায়ী হ'য়ে প'ড়ল। তার একটি ডানা কেটে গেল। রাবণ তৎক্ষণাৎ সীতাকে ঘিরে আবার নৃত্য করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ নৃত্য করবার পর সীতার আবার সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হ'লো। রাবণ আবার তাকে নিয়ে তেমনই ভাবে মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

বালীদ্বীপের নৃত্যানুষ্ঠান সে দিনকার মত এখানেই শেষ হ'য়ে গেল। এই নৃত্য ছাড়াও বালীদ্বীপের আরও যে কয়েক প্রকার রামায়ণ নৃত্য আছে এখানে তার পরিচয় দেওয়া যাক।

ইন্দোনেশিয়ার মোট ১১ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১০ কোটিই এখন

জাতিতে মুসলমান, কেবলমাত্র অবশিষ্ট এক কোটি বালীদ্বীপের অধিবাসী নিজেদের হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং বহুলাংশেই সমাজ-জীবনে হিন্দু আচার অনুসরণ ক'রে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় উৎসব এখন পর্যন্তও রামায়ণ উৎসব। রামায়ণোৎসব কোনো ধর্মোৎসব নয়, বরং বলা যায় নৃত্যনাট্যোৎসব। তা থেকেই বুঝতে পারা যাবে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ দেশের ১১ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ১০ কোটি অধিবাসী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যে তার জাতীয় উৎসব রামায়ণকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে, তাতে সেদেশে রামায়ণের জনপ্রিয়তা আজও কত বেশী। আমাদের ভারতবর্ষে সামগ্রিক ভাবে জাতীয় উৎসব ব'লতে কিছু নেই, তবে উত্তর ভারত অঞ্চলের জাতীয় উৎসব যে এখনো রামলীলা তা মনে হতে পারে। কিন্তু যে অর্থে ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণকে কেন্দ্র ক'রে জাতীয় উৎসব গ'ড়ে উঠেছে, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তার মধ্যে যে ভাবে সে দেশ আত্মসমর্পণ ক'রে আছে, উত্তর ভারতে রামলীলায় তা হ'তে পারেনি। তা একটা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র সীমাবদ্ধ। ইন্দোনেশিয়ার মত জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলে তা সমান ভাবে গ্রহণ করে নি।

মনে হয়, খৃস্টীয় নবম শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষ থেকে ভট্টিকাব্যের রামায়ণ কাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় নীত হ'য়েছিল। অবশ্য তার পূর্বে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারের আমলে বিচ্ছিন্নভাবে রামায়ণের কোনো কোনো কাহিনী সে দেশে গিয়ে প্রচারিত হ'য়ে থাকতে পারে, কিন্তু সমগ্র রামায়ণের কাহিনী একসঙ্গে খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর আগে যে সেখানে যায় নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতেই পূর্ব যাভার প্রাম্বানাম নামক স্থানে একটি শিবমন্দির স্থাপিত হ'য়েছিল, মন্দিরটিকে সে দেশের ভাষায় ব'লত ররজংগ্রং মন্দির। এই মন্দিরের বহির্দিকে সমগ্র রামায়ণের কাহিনী প্রস্তরে উৎকীর্ণ করা আছে। খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল ব'লে এ' কথাও মনে করা যেতে পারে যে হয়ত তারও কিছুকাল আগে রামায়ণের কাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে প্রচারিত হয়েছিল, কারণ, এই মন্দিরই যে ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ প্রচারের একমাত্র উৎস এ' কথা মনে করা হয় না। বিশেষতঃ দেখা যায়, অল্পকালের মধ্যেই রামায়ণ ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছে। খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর একটি শিলালিপি থেকে জানতে

পাওয়া যায় যে একটি রাজকীয় উৎসবের মঙ্গলাচরণ রূপে রামায়ণের সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করা হ'চ্ছে। সুতরাং খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মন্দির গাত্রে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ হ'য়ে তা পাষাণের বন্ধনে নির্বাক কিংবা অবিচল হ'য়ে রইল না, ক্রমে জনসাধারণের মুখে মুখে কিংবা সমাজ-জীবনের নানা আচার এবং আচরণের মধ্যে তা প্রচারিত হ'তে লাগল। সেইজন্যই দেখা যায়, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকেই ইন্দোনেশিয়ার শিল্পে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে এবং লোকাচারে রামায়ণের কাহিনী আত্মপ্রকাশ ক'রতে লাগল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল রাজবংশ সেখানে রাজত্ব ক'রেছে, তারা নানাভাবে রামায়ণ কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে তাঁদের সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন ক'রেছেন, তাই সে দেশের জনসাধারণের মধ্যে রামায়ণের কাহিনী ব্যাপক প্রচার লাভ ক'রে ক্রমে তাদের জাতীয় রস-সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছে। তার ফলে ক্রমে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যখন মুসলমান ধর্ম প্রচার ক'রল তখন রামায়ণের জাতীয় রস-সংস্কারের প্রভাব থেকে তারা মুক্তি পেল না, তার ধারা অনুসরণ ক'রে আজো তারা অগ্রসর হ'য়ে চ'লেছে। তার ধারা যে কেবল মাত্র সে দেশের অভিজাত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, যদিও ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ ক'রবার আগে কতকটা তাই ছিল, তথাপি ১৯৪৯ সনে ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠবার পর জনসাধারণের যোগ তার সঙ্গে গভীরতর ভাবে স্থাপিত হ'য়েছে। যে সকল অঞ্চলে নৃত্যনাট্য এবং অভিনয়ের সংস্কার গ'ড়ে উঠেছিল, সেখানে কালক্রমে রামায়ণের কাহিনী আজ মুখ্য স্থান গ্রহণ ক'রেছে।

প্রথমতঃ বালীদ্বীপের কথাই বলা যাক। আগেই ব'লেছি, বালীদ্বীপে এখনো এক কোটি হিন্দু বাস করে। তারা হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তি তৈরী ক'রে ভারতীয় হিন্দুর মত পূজো করে, তাতে সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং ভারতীয় হিন্দুর মত বর্ণাশ্রম ধর্মও স্বীকার করে। ভারতবর্ষের বাইরে এত সংখ্যক হিন্দু পৃথিবীর আর কোথাও নেই। নৃত্য বালীদ্বীপের হিন্দুসংস্কৃতির প্রাণ স্বরূপ। তাদের ধর্মকর্ম, সামাজিক অনুষ্ঠান সব কিছুই নৃত্য-সম্বলিত। এমন কি, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় তাদের বিশেষ এক শ্রেণীর পুরুষের নৃত্য প্রচলিত আছে। শবদেহ দাহ করতে নিয়ে যাবার

সময় শ্মশানের পথেও নৃত্যদল তার সঙ্গী হয়, দাহকালেও নৃত্যের অনুষ্ঠান চলতে থাকে। ভারতবর্ষে সামাজিক এবং আচার জীবনে নৃত্য যে স্থানই অধিকার করুক, এর নিদর্শন কোথাও নেই। তবে কোনো কোনো ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় কেবলমাত্র করুণ সুরে বাদ্যভাণ্ড বাজাতে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা'তে কোনো নৃত্য সংযুক্ত থাকে না। উড়িষ্যার কোরাপুট জিলার শবর জাতি তার প্রমাণ। সুতরাং যে জাতির জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নৃত্যের সংস্কার এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে, তার জাতীয় উৎসব নৃত্যভিত্তিক হবে, তা' বলাই বাহুল্য। বহু পূর্ব থেকে এই জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নৃত্যের অনুষ্ঠান হলেও কালক্রমে রামায়ণের কাহিনী সেই সকল বহুমুখী বৈচিত্র্য দূর ক'রে দিয়ে একটি অখণ্ড আদর্শ তার সামনে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল, তাই রামায়ণ উৎসব সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান জাতির বালীদ্বীপের মত জাতীয় উৎসব এবং এই জাতীয়তাবোধের দিক থেকে বালীদ্বীপ ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তথাপি যবদ্বীপের বিভিন্ন অংশ এই বিষয়ে বালীদ্বীপ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এক অখণ্ড প্রাচীন সংস্কারের উপর নিজেদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও রক্ষা করেছে।

বালীদ্বীপে প্রকৃতপক্ষে সারা বছরই কোনো না কোনো উপলক্ষে নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে। যদি কোনো উপলক্ষ না-ও থাকে, তথাপি গ্রামের মন্দির-প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাকালীন অবসর বিনোদন কিংবা অন্ততঃ নৃত্যশিক্ষা উপলক্ষেও নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের স্থান গ্রামের বারোয়ারি মন্দির-প্রাঙ্গণ। কোনো কোনো বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ-বাড়ীর মন্দির-প্রাঙ্গণেও মধ্যে মধ্যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রত্যেক মন্দিরের সামনেই একটি নাটঘর থাকে, তা' প্রকৃত অর্থেই সেখানে নাটঘর। অর্থাৎ তা'তে বর্ষা গ্রীষ্ম সর্ব ঋতুতেই নৃত্যানুষ্ঠান হবার কোনো বাধা হয় না। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার কোনো চর্চা নেই; নৃত্যচর্চাই তাঁদের জীবনের একমাত্র চর্চার বিষয়। প্রত্যেক গ্রামেই নৃত্যশিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, আধুনিক ধরণে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা-দানের কোনো বিশেষ ব্যবস্থা কোথাও নেই। বর্তমানে দু'এক ক্ষেত্রে দু'একটি মাত্র আধুনিক ধরণের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু গ্রাম্য মেয়েদের বিয়ের বাজারে বিদ্যার মাপকাঠিতে বিচার করা হয় না, একমাত্র

যাতে বিচার করা হয়, তা' তার নৃত্যগুণ। উত্তম নৃত্যশিল্পী হ'লে তার বিয়ে হ'তে কোনো বাধা হয় না, পরিণত বয়সের আগেই অর্থাৎ ১৩।১৪ বছর বয়সে সহজেই বিয়ে হয়ে যায়। আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের পণপ্রথা সেখানে থাক্‌লেও যে মেয়ে নৃত্যগুণে পটীয়সী তার জন্য কোনো পণ দিবারও আবশ্যক হয় না। সুতরাং মাতাপিতা শিশু বয়স থেকেই কন্যাদের নৃত্যশিক্ষা দিয়ে থাকেন। তার ফলে বালীদ্বীপের প্রত্যেক বালিকাই নৃত্যগুণ-পটীয়সী; নৃত্যগুণে তার জন্মগত অধিকার। সুতরাং সেখানে শিল্পীসন্ধান ক'রে নৃত্যনাট্যের দল গঠন করার কোনো প্রশ্নই আসে না। কারণ, শিল্পী সেখানে সুলভ।

রামায়ণের কাহিনী নিয়ে যে সকল নৃত্যনাট্য বালীদ্বীপে গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই; কেবলমাত্র কয়েকটির নাম করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ ওয়েঙ্‌ ওঙ্‌ নৃত্য। বালীদ্বীপের বিশেষ প্রকৃতির এই নৃত্যে নৃত্যশিল্পীরা প্রত্যেকেই মুখোস পরে থাকে। পশ্চিম বাংলার ছৌনৃত্যের মুখোস পরবার পদ্ধতির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই এবং ছৌনৃত্যের কাহিনী সাধারণতঃ যেমন রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও অন্যান্য পুরাণ কিংবা মহাভারত থেকেও গৃহীত হতে পারে, বালীদ্বীপের ওয়েঙ্‌ ওঙ্‌ নৃত্যের কাহিনী কেবলমাত্র রামায়ণ থেকেই গৃহীত হয়। গেমেলিন নামক ধাতুনির্মিত এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র এই নৃত্য উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়, সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যনাট্যে এই একমাত্র বাদ্য যন্ত্র।

এই নৃত্যের দুটি ধারা, একটিতে রামায়ণের কাহিনী আনুপূর্বিক গৃহীত হয়ে থাকে, তাকে তোপেঙ্‌ রামায়ণ বলা হয়, আর আর একটি ধারার মধ্যে এখনো বালীদ্বীপ কিংবা যবদ্বীপের ঐতিহাসিক কোনো রাজা বা বীর চরিত্রের কাহিনী অবলম্বন করা হয়, তাকে তোপেঙ্‌ বাবাড় বলা হয়। মনে হয়, রামায়ণের কাহিনী এ'দেশে প্রবর্তনের আগে তোপেঙ্‌ বাবাড়ই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু রামায়ণ কাহিনী এদেশে প্রচারের পর থেকে তার জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার ফলে আজ সর্বত্রই প্রায় তোপেঙ্‌ রামায়ণেরই অনুষ্ঠান হয়, তোপেঙ্‌ বাবাড়ের অনুষ্ঠান অর্থাৎ সে দেশের ঐতিহাসিক চরিত্রের কাহিনী অবলম্বন ক'রে মুখোস নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান আর বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না।

তোপেঙ্ বাবাড়ের সঙ্গে তোপেঙ্ রামায়ণের আরও সামান্য কয়েকটি বিষয়ে এক আধটু পার্থক্য আছে, তা' থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে তোপেঙ্ বাবাড় তোপেঙ্ রামায়ণের চাইতে প্রাচীনতর ছিল ; এমন কি, পরবর্তী কালেও তোপেঙ্ রামায়ণের কোনো প্রভাব তার উপর পড়েনি। এ' বিষয়ে তোপেঙ্ বাবাড় অধিকতর রক্ষণশীল। বালীদ্বীপে এখনো যে সকল তোপেঙ্ বাবাড়ের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাতে কোনো স্ত্রীলোক অংশ গ্রহণ করে না। কেরলের কথাকলি এবং পশ্চিম বাংলার ছৌনৃত্যের মত পুরুষই স্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু বালীদ্বীপে বিশেষতঃ বালীদ্বীপের দক্ষিণ অংশে তার ব্যতিক্রম করা হয়, সেখানে সীতার চরিত্রে নারীই অংশ গ্রহণ করে। তবে বালীদ্বীপের সর্বত্র এখনো এই রীতি প্রসার লাভ করেনি। বালীদ্বীপের অধিবাসীরা নৃত্যের প্রাচীন ধারা রক্ষা করবার জন্য যে রকম সতর্ক, তাতে মনে হয়, বালীদ্বীপের অন্যত্র এই রীতি সহজে প্রসার লাভ করতে পারবে না, এমন কি, এমনও মনে হতে পারে যে, আজ পরীক্ষামূলকভাবে দক্ষিণ বালীদ্বীপে যে নূতন রীতি প্রবর্তিত হয়েছে, তা'ও রক্ষণশীলতার চাপে পড়ে পরিত্যক্ত হ'তে পারে।

তোপেঙ্ বাবাড়ের সঙ্গে তোপেঙ্ রামায়ণের আর একটি প্রধান পার্থক্য এই যে তোপেঙ্ বাবাড়ে প্রত্যেকটি চরিত্রকেই মুখোস পরতে হয়, কিন্তু তোপেঙ্ রামায়ণে দক্ষিণ বালীদ্বীপে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ব্যতীত আর সকলে মুখোস পরে থাকে।

তার একটি কারণ আছে। মনে হয়, কারণটি এই — প্রাম্বানাম্ মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ রামায়ণের কাহিনীতে রাম-লক্ষ্মণের যে মূর্তিগুলো উৎকীর্ণ আছে সাধারণতঃ সেই আদর্শে বালী এবং যবদ্বীপের রামায়ণ নৃত্যনাট্যে রাম-লক্ষ্মণের রূপসজ্জা করা হয়, তার এক তিলও ব্যতিক্রম করা হয় না। তার ফলে রূপসজ্জার একটি অবিচল আদর্শ যেমন নৃত্যশিল্পীদের চোখের সামনে থেকে তা'কে বিকৃতি কিংবা পরিবর্তন থেকে রক্ষা করছে, তেমনই রূপসজ্জার একটি উচ্চ শিল্পসম্মত আদর্শেরও প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং এ কথা মনে হতে পারে যে, সেই আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়েই রাম-লক্ষ্মণের পক্ষে মুখোস ব্যবহারের রীতিটি পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে তোপেঙ্ বাবাড়ের এমন কোনো স্থাপত্য কিংবা ভাস্কর্যভিত্তিক আদর্শ নেই, সেইজন্য সে ক্ষেত্রে সর্বত্র মুখোস ব্যবহারেও কোনো বাধা নেই।

এই নৃত্যনাট্য সম্পর্কে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এ'তে এমন একটি রীতি প্রচলিত আছে, যাতে মনে হতে পারে যে এই নৃত্যে মুখোস ব্যবহারের রীতি পরে প্রবর্তিত হয়েছে। কারণ, অনেক সময় কোনো কোনো চরিত্রকে হয় মুখোসের ভিতর থেকেই, নয়ত বা মুখোস হাত দিয়ে মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। তার অর্থ এই, একদিন নৃত্যকালে চরিত্রগুলো স্বাধীনভাবে সংক্ষিপ্ত সংলাপ ব্যবহার করত, তারপর যখন কোনো কারণে তার উপর মুখোস ব্যবহার করবার রীতি প্রবর্তিত হলো, তখন মুখোসের ভিতর থেকে সংলাপ বলা চলতে লাগ্‌ল। কিন্তু ক্রমে তার অস্বাভাবিকতা যখন আরো প্রকট হয়ে উঠবে, তখন সংলাপের ব্যবহার একেবারেই পরিত্যক্ত হবে। ইন্দোনেশিয়ার অন্যত্রও নৃত্যকালে কোনো সংলাপ শুন্‌তে পাওয়া যায় না।

ওয়েঙ্‌ ওঙ্‌ নৃত্যই বালীদ্বীপের নিজস্ব প্রাচীন নৃত্য। তার ধারা প্রাচীনতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। একদিন তার মধ্যে কোনো কাহিনীই ছিল না, কেবলমাত্র আদিম সমাজ-জীবনের কোনো ভাব অবলম্বন করে তার অনুষ্ঠান হতো, ক্রমে তার মধ্যে দেশের ইতিহাস ও বীরচরিত্রের কাহিনী এসে যুক্ত হ'লো, তারপর একদিন যখন সমুদ্র পার থেকে রামায়ণের কাহিনী গিয়ে সেখানে পৌঁছল, সে দিন তার আকর্ষণে সে দেশের অধিবাসীরা তাই তাদের জাতীয় নৃত্যোৎসবের কাহিনী রূপে গ্রহণ করল।

রামায়ণের বিষয়বস্তু নিয়ে তারপর আর যে বিশেষ এক প্রকৃতির নৃত্যনাট্য বালীদ্বীপে গড়ে উঠেছে, তার নাম কেচক নৃত্য। তা'কে চক্‌ বা চেক নৃত্যও বলা হয়। চেক নৃত্য এক অভিনব পদ্ধতির শিল্পরূপ, অন্যান্য কোনো নৃত্যরূপের সঙ্গেই তার একমাত্র কাহিনী ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে মিল নেই। তাতে প্রায় দু'শ পুরুষ অংশগ্রহণকারী বৃত্তাকারে আসরের মধ্যে বসে, একটি বৃত্তের মধ্যে দু'শ ব্যক্তির স্থান সঙ্কুলান হয় না, সেইজন্য একটি বৃত্তের পিছনে আর একটি বৃত্ত, তার পিছনে আরও একটি বৃত্ত অন্ততঃ এই প্রকার তিনটি বৃত্ত রচিত হয়। তা'তে সকলেই গায়ে গায়ে মিশে আসন করে বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে একটি ক্ষুদ্র আসর রচনা করে। এই দু'শো ব্যক্তি একসঙ্গে মুখে 'চক্‌ চক্‌ চক্‌ চক্‌' এই প্রকার এক শব্দ করে। দু'শ ব্যক্তির এক সঙ্গে এই শব্দ দ্বারা বাদ্যের

তালের মত একটি তাল সৃষ্টি হয় ; মুখের শব্দের মধ্য দিয়েই নানা বোল এবং তাল সৃষ্টি করা হয়। আর কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যতীতই কেবলমাত্র মুখের শব্দে সৃষ্ট তালের মধ্য দিয়েই নৃত্য পরিচালিত হয়। যে কোনো প্রকারের বাদ্যযন্ত্রই যে নৃত্যের পক্ষে অপরিহার্য নয়, এই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তাই দেখতে পাওয়া যায়। কেবল মাত্র মুখ দিয়ে বিচিত্র তাল সৃষ্টি করেও যে তার উপর নৃত্যানুষ্ঠান সম্ভব হতে পারে, বোধ হয় এই নিদর্শন পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

দু'শ লোক মুখে একভাবে শব্দ করে বলেই যে সেই শব্দ গগন-বিদারী হয়ে উঠে দর্শকদের কর্ণপীড়ার সৃষ্টি করে, তা নয়। প্রত্যেকেই তাদের উচ্চারণকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নেয় যে সমগ্র কণ্ঠের মিলিত উচ্চারণ কোনোভাবেই অসংযতভাবে উচ্চ গ্রামে উঠ্‌তে পারে না। তার সংযত গীতিসুর রক্ষা পায়।

বিষয়টি ঠিক কানে না শুনলে বুঝিয়ে বলা খুব কঠিন। আমাদের দেশে যেখানে বাদ্যযন্ত্র থাকে না, সেখানে আমরা হাতে তালি দিয়ে নৃত্যের তাল রক্ষা করতে জানি, কিন্তু তাদের এই নৃত্যে হাতে তালি দিয়ে তাল রক্ষা করবার রীতির প্রচলন নেই। দু'শ লোক একসঙ্গে এক প্রকার শব্দ উচ্চারণ ক'রে, সুরের দিক থেকে তাকে আবার নানা দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে একদিক দিয়ে তার সাঙ্গীতিক গুণ, আর একদিক দিয়ে তার নৃত্যের তাল রক্ষার উপায় দুই-ই সম্ভব করে তুলে। বিষয়টিকে ঐকতান বাদন না বলে ঐকতান বাচন বলা যেতে পারে। তবে তা' দীর্ঘ অভ্যাসের ফল, কারণ, দু'শ' অংশগ্রহণকারী আনুপূর্বিক উচ্চারণের নিখুঁত ঐক্য রক্ষা ক'রে (chorus) তাকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে সক্ষম হয়েছে। যে যার খুসী মত এলোমেলো উচ্চারণ করলেই যা কোলাহল মাত্র হয়ে যেত, তা' একটি সুপরিচ্ছন্ন ঐক্য সূত্রে গ্রথিত হয়ে একটি সুন্দর নৃত্যের তাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

'চক্‌ চক্‌ চক্‌ চক্‌'—এই শব্দটি সমগ্র তালের ভিত্তি, তা' নিয়েই নানাভাবে তালের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয় ; কখনো দ্রুত উচ্চারণ ক'রে, কোথাও বিলম্বিত উচ্চারণ ক'রে, কিছুক্ষণ কতক অংশ দ্রুত, কিছু অংশ বিলম্বিত এভাবে উচ্চারণ করে, উচ্চারণের মাত্রা (pitch) কমিয়ে বাড়িয়ে সুর এবং তালের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। সে প্রয়াস

কোথাও ব্যর্থ হয় নি; কারণ, সুদীর্ঘ অভ্যাসের ফলে তা'দের মধ্যে শিক্ষার বাঁধুনি শক্ত হয়েছে।

'চক্ চক্ চক্ চক্'—শব্দটিরও একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। অন্য কোনো ভাবে সহজ ও সুন্দরতর উপায়ে মুখে শব্দ ক'রে তালসৃষ্টির পরিবর্তে এই নিতান্ত আদিম এবং বন্য একটি উচ্চারণ যে এই নৃত্যের ভিত্তি হয়েছে, তার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, রামায়ণের মধ্যে বহুসংখ্যক চরিত্রই হচ্ছে বানর। প্রধান চরিত্র হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল এরাও বানর। এই শব্দ বানরের মুখের শব্দ। বানর-জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি করে সমগ্র পটভূমিকার মধ্যে তা' স্থাপন করে রামায়ণ কাহিনী প্রকাশ করতে না পারলে তার যথার্থ ভাবটি প্রকাশ পায় না। সেইজন্য বানরের মুখের শব্দ রামায়ণ-নৃত্যের এখানে পটভূমিকা রচনা করেছে।

এই দু'শ অংশগ্রহণকারীদের অনেককে এই নৃত্যানুষ্ঠানে আরো বিভিন্নভাবে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এদের মধ্যেই প্রয়োজন মত উঠে কেউ এসে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে, কেউ বা ঢোলকের মত একটি বাদ্যযন্ত্র বাজায়, কেউ বা দৃশ্যের শোভা বর্ধন করবার জন্যও মধ্যে মধ্যে অপ্রধান ভূমিকায় নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। এই সকল অংশগ্রহণকারী ব্যতীত কেচক-নৃত্যে আর কেউ কোনো রূপ বাদ্যভাণ্ড ব্যবহার করে না।

তিন বা চারটি বৃত্ত রচনা ক'রে তারা আসরের মধ্যে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বসে। প্রত্যেকের সামনের বৃত্তে যারা বসে থাকে, তাদের দু'পাশ দিয়ে পেছনের বৃত্তে উপবেশনকারী শিল্পীদের পা প্রসারিত হয়ে যায়। বৃত্তের ঠিক মাঝখানে একটি উঁচু বেদীতে একটি তেলের সুবৃহৎ প্রদীপ জ্বলতে থাকে। তেলের প্রদীপটি যে বেদীর উপর স্থাপিত থাকে তার চারপাশ ঘিরে যে বৃত্তাকার খোলা জায়গাটি থাকে এবং যা' ঘিরে তিনচারটি বৃত্ত রচনা ক'রে অন্যান্য শিল্পীরা বসে থাকে, সেখানেই নৃত্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে। আগেই বলেছি, নৃত্যের বিষয়বস্তু রামায়ণ।

যদিও রামায়ণের সমগ্র কাহিনীটি দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত ক'রে অনুষ্ঠান করাই রীতি, তথাপি দু'ঘন্টার মধ্যে রামায়ণ-কাহিনী পরিবেশন করতে গিয়ে তার কতক অংশ মাত্র গ্রহণ ক'রে বিদেশী পর্যটকদের দেখানো হয়ে থাকে। বালীদ্বীপের গ্রামে মন্দিরের আঙ্গিনা ব্যতীত এই অনুষ্ঠান অন্যত্র কোথাও হয় না। বিদেশী পর্যটকদের সেখানে বসবার সুবিধার জন্য

উপরে আচ্ছাদনী দেওয়া চারদিক খোলা একটি ঘর তৈরী ক'রে তাতে বেতের চেয়ার পেতে দেওয়া হয়। দু'ঘন্টার নৃত্যানুষ্ঠানে এইভাবে কাহিনী পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত হ'য়ে থাকে—

প্রথম অঙ্ক : সীতা, রাম, লক্ষ্মণ ও সোনার হরিণ। সোনার হরিণকে বালীদ্বীপীয় ভাষায় 'কিজাং ইমাস্' বলা হয়। 'কিজাং' অর্থ সোনালী, 'ইমাস্' অর্থে হরিণ। সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ দৃশ্যে প্রবেশ করলেন, সহসা সীতা একটি সোনার হরিণ সেখানে দেখ্‌তে পেলেন। সীতা রামকে হরিণটি ধ'রে দিতে বল্লেন, রামচন্দ্র হরিণটিকে অনুসরণ ক'রে দৃশ্য থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে থেকে রামের কণ্ঠে এক আর্তনাদ শুন্‌তে পাওয়া গেল— লক্ষ্মণ, ভাই লক্ষ্মণ, আমাকে বাঁচাও। লক্ষ্মণ বুঝলেন, এ' কোনো রাক্ষসের মায়া। যিনি বিশ্বের রক্ষক, তাঁকে রক্ষা করবার কোনো আবশ্যক নেই। কিন্তু সীতা অধীর হ'য়ে উঠ্‌লেন, রামের সাহায্যে যাবার জন্য প্রথমে লক্ষ্মণকে অনুনয়-বিনয় করলেন, লক্ষ্মণ সীতাকে একা রেখে যেতে অস্বীকার কর্‌লেন, শেষ পর্যন্ত সীতার কঠিন বাক্যে ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হ'য়ে যেতে বাধ্য হলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক : সীতা ও রাবণ।

রাবণ আবির্ভূত হ'লেন। সীতাকে হস্ত দ্বারা ধারণ ক'রে নিজের কাঁধে বসিয়ে দৃশ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন। রাবণের কাঁধে সীতা স্থির হ'য়ে ব'সে রইলেন।

তৃতীয় অঙ্ক : সীতা, ত্রিজটা ও হনুমান। রাবণের প্রাসাদের পার্শ্বে অশোকবন, তাতে সীতা বন্দিনী, ত্রিজটা রাবণের ভ্রাতৃকন্যা, তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত। পতিবিরহিনী সীতা বিষাদিনী, দুঃখে মলিনা। এমন সময় সেখানে হনুমানের আবির্ভাব হ'লো। হনুমান রামচন্দ্রের আংটি সীতার হাতে দিয়ে নিজের পরিচয় দিল। রামচন্দ্রের নিকট পৌঁছে দিবার জন্য সীতাও একটি অভিজ্ঞান তার হাতে তুলে দিলেন। তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়ে পাঠালেন।

চতুর্থ অঙ্ক : রাম, মেঘনাদ, গরুড়।

লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্র। মেঘনাদ তাঁর সম্মুখীন হ'য়েছেন। মেঘনাদ তাঁর মায়া-ধনু থেকে তীর ছুঁড়্‌লেন, তীর ক্রমে একটি সাপে পরিণত হ'য়ে

গিয়ে রামচন্দ্রকে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল্‌ল। রামচন্দ্র গরুড়কে আহ্বান করলেন, গরুড় প্রবেশ করল, তারপর সেই সাপকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেরে ফেলে রামচন্দ্রকে তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিল।

পঞ্চম অঙ্ক : রাম, সুগ্রীব ও মেঘনাদ। সুগ্রীব রামচন্দ্রকে একদিনের জন্য যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নিতে বল্‌লেন, তিনি নিজে মেঘনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সুগ্রীব বানর-সৈন্যদিগকে সমবেত করলেন, তারপর মেঘনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মেঘনাদকে মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য আহ্বান জানালেন। বৃত্তাকারে উপবিষ্ট শিল্পীরা দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে মুখে দু'রকম শব্দ করতে লাগ্‌ল, একরকম শব্দ রাক্ষসের শব্দ বুঝাল, আর একরকম শব্দ বানরের শব্দ বা পূর্বোল্লিখিত 'চক্ চক্ চক্ চক্' শব্দ ক'রে বানরের শব্দ বুঝাতে লাগ্‌ল। দু'রকম মুখের শব্দের মধ্য দিয়ে দু'দলের সংগ্রামের চিত্রটি মূর্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তার উপর সুগ্রীব ও মেঘনাদের যুদ্ধনৃত্য চল্‌ল।

এই দৃশ্যে সুগ্রীব শেষ পর্যন্ত মেঘনাদকে পরাজিত ক'রে বধ করল। অবশেষে রামচন্দ্রের হস্তে রাবণ নিহত হল। সীতাকে উদ্ধার ক'রে রামচন্দ্র দৃশ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন।

কেচক নৃত্যে সাজসজ্জার বিশেষ কোনো বাহুল্য থাকে না, তবে সীতা ভিন্ন অন্যান্য চরিত্র মুখোস পরে। যারা বৃত্তাকারে বসে মুখে 'চক্ চক্ চক্ চক্' শব্দ করে তারা মোটা কালো ডোরাযুক্ত লুঙ্গি পরে, গা খালিই থাকে। মুখে 'চক্ চক্ চক্ চক্' শব্দ করবার সময় হাতের তালু দুটি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে। এই রকম শব্দ করতে করতে কখনো কখনো সকলে মিলে এক সঙ্গে হঠাৎ কখনো ডান দিকে, আবার হঠাৎ কখনো বাঁ দিকে পার্শ্ববর্তী অংশগ্রহণকারীর শুয়ে পড়া গায়ের উপর কাৎ হ'য়ে শুয়ে পড়ে, অবশ্য সেও তার পার্শ্ববর্তী অংশগ্রহণকারীর শুয়ে পড়া গায়ের উপর তেমনি ভাবে নিজে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে। এক সঙ্গে তা করা হয় ব'লে বৃত্ত কয়টি যেমন সহসা মুদিত অবস্থা থেকে সহসা বিকশিত হ'য়ে পড়ে ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ যখন তিন চার সারি অংশগ্রহণকারী বসে বসেই হাত তুলে মুখে 'চক্ চক্ চক্ চক্' শব্দ করতে থাকে, তখন সমগ্র বৃত্ত কয়টি দেখতে এক রকম হয়, আবার যখন একসঙ্গে পরস্পর গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে,

তখন দেখতে সমগ্র দৃশ্যটি অন্য একরূপ ধারণ করে। একটি পদ্মের কলি মুকুলিত হ'য়ে যেন ক্রমে দলগুলো বিস্তার করে।

তৃতীয় যে আর এক শ্রেণীর বালীদ্বীপীয় রামায়ণ নৃত্য আছে, তার নাম আর্য নৃত্য। রামায়ণের কাহিনী তা'র মধ্যে বেশীদিন আগে প্রবেশ করেনি। আগে দহ এবং কহুরীপন রাজবংশের রাজাদিগের কীর্তিকাহিনী অবলম্বন ক'রে নৃত্য এবং গীত সম্বলিত যে নাট্য রচিত হ'তো, তাকেই আর্য নৃত্য বল্‌ত। কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর জনপ্রিয়তার জন্য কালক্রমে তা অন্যান্য বিষয়বস্তুর পরিবর্তে তার একমাত্র কাহিনীরূপে ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ করেছে। এখন আর্য নৃত্যে রামায়ণ-কাহিনী ব্যতীত আর কোনো বিষয়-বস্তু গৃহীত হয় না। এই নৃত্যনাট্যে মুখোসের ব্যবহার নেই। কারণ, নৃত্যের সঙ্গে এর মধ্যে সঙ্গীত এবং সংলাপও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গানের উপরই এর মধ্যে জোর দেওয়া হয় এবং এ'র বাদ্যভাণ্ডও কোনো দিক দিয়েই জটিল নয়। একটি বাঁশী ও ছোট একটি ঢোলক মাত্র; তাই দিয়েই বাদ্য সৃষ্টি করা হয়।

বালীদ্বীপের চতুর্থ প্রকৃতির রামায়ণ নৃত্যনাট্যের নাম প্রেম্বন্। তাই সর্বাধুনিক বালীদ্বীপীয় নৃত্যনাট্য। বালীদ্বীপে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্য-নাট্য থেকে নানা উপকরণ এক সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে এই নৃত্যনাট্য-রীতির উদ্ভাবন করা হ'য়েছে, তবে তার বিষয়-বস্তু রামায়ণ ব্যতীত আর কিছুই হ'তে পারে না। এ'র ভিতর দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যায় যে বালীদ্বীপের সর্বাধুনিক নৃত্যনাট্যেরও বিষয়-বস্তু রামায়ণ। অর্থাৎ সেখানে আধুনিকতা পাশ্চাত্ত্য জীবনের অনুকরণ নয়, বরং জাতীয় জীবনেরই পুনরুজ্জীবন; নানাভাবে তার ব্যবহার এবং পরীক্ষার-নিরীক্ষা। রামায়ণকে বাদ দিয়ে তাদের জীবনে আজো যে কোনো রসশিল্প সৃষ্টি হ'তে পারে না, এ'কথা বালীদ্বীপবাসী অনুভব ক'রে থাকে। তাই রামায়ণকে ভিত্তি ক'রেই তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে থাকে। মাত্র ১৯৬৫ সন থেকে প্রেম্বন্ রামায়ণ নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে আস্‌ছে। তার আগে সর্বপ্রথম ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বালীদ্বীপে সর্বপ্রথম মৌখিক সংলাপহীন নৃত্যনাট্য প্রচলিত হয়, তার আগে সকল নৃত্যনাট্যেই কিছু না কিছু সংলাপ ব্যবহৃত হ'তো। প্রেম্বন্ রামায়ণ নৃত্যের নূতন প্রচেষ্টা মাত্র, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় স্বীকৃতি লাভ ক'রেছে, কারণ ঐ বছরই তা ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়

উৎসবে সরকারী ভাবে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন শ্রেণীর রামায়ণ নৃত্যনাট্যের মধ্যে বালীদ্বীপের নৃত্যনাট্যের নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত জটিল এবং তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালন করা হয়। তার পদক্ষেপের মৌলিক বিশেষত্বের কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তা' দেখেই বালীদ্বীপের নৃত্যনাট্য সহজে চিনতে পারা যায়। ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ নৃত্যনাট্যের মধ্যে একমাত্র বালীদ্বীপেই ভাব-প্রকাশে চক্ষুর ব্যবহার করা হয়, মুখেরও ব্যবহার হয়ে থাকে। অন্যত্র চক্ষু এবং মুখের কোনো ভাব প্রকাশ করা হয় না, একদিন এসব মুখে যে মুখোশ পরা হ'তো এ তারই প্রমাণ, কারণ, তাদের মুখ মুখোসের মত স্থির, কিন্তু বালীদ্বীপে যে তা' নয়, তার অর্থ সেখানে ভরতনাট্যমের প্রভাব বেশী হয়েছিল ব'লে মনে হয়।

মালয়েশিয়া

আজ ৩ রা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সন। আজ পাণ্ডানের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্য যবদ্বীপের অন্তর্গত যোগজাকার্তার রামায়ণ নৃত্যের অনুষ্ঠান হবে।

মালয়েশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেই মৌখিক এবং লিখিত ভাবে রামায়ণ কাহিনীর ব্যাপক প্রচলন আছে। লিখিত ভাবে রামাণের যে কাহিনী পাণ্ডুলিপিতে আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তার নাম 'হিকায়াত সিরি রাম'। আমাদের দেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণের যেমন বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়, 'হিকায়াত সিরি রামে'রও তেমনই বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, 'হিকায়াত সিরি রাম' কৃত্তিবাসের মত বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ নয়, বরং তার পরিবর্তে নানা সময় নানা ভাবে ভারতবর্ষ থেকে রামায়ণের নানা কাহিনী যে ভাবে প্রচারিত হ'য়েছিল, তার উপর ভিত্তি ক'রেই রচিত হ'য়েছে। বাল্মীকির কাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে তার বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করবার মত।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই 'হিকায়ত সিরি রামে'র কাহিনীর বিভিন্ন অংশ ভারতবর্ষ থেকে নানা ভাবে মালয়েশিয়ায় নীত হ'তে থাকে; তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতেই (অর্থাৎ বাংলা দেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচিত হ'বার আগেই) তা' সেখানে মুখে মুখে একটি বিশেষ রূপ লাভ ক'রে

ক্রমে তা' লিখিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময়ে রামায়ণ সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী মুখে মুখে সে দেশে প্রচারিত হ'য়েছিল বলে, কৃত্তিবাস পণ্ডিত যেমন রামায়ণকে ভিত্তি ক'রেই তাঁর অনুবাদ রচনা করেছিলেন সেখানে তা' সেভাবে রচিত হ'তে পারেনি।

যাই হোক, বিশ্ব রামায়ণ উৎসবে মালয়েশিয়ার যে চারটি নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হ'য়েছিল,তাদের মধ্য দিয়ে রামায়ণের কাহিনী সে দেশে কি ভাবে গৃহীত হ'য়েছিল, তার একটু আভাস পাওয়া যেতে পারে।

মালয়েশিয়ায় ছায়া-নাটকের (shadow play) মধ্য দিয়েই রামায়ণের কাহিনী সর্বাধিক প্রচার লাভ করেছে এবং এখনো এই পদ্ধতিতেই তার প্রচার সর্বাধিক হয়ে থাকে। সে দেশের ভাষায় তাকে ওয়েয়েঙ্ কুলিত (wayang kulit) বলে। রামায়ণ-বিষয়ক ছায়া-নাটককে 'ওয়েয়েঙ্ সিয়ম্'(wayang siam) বলা হয়। তার ভিতর দিয়ে রামায়ণের কাহিনী যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, মালয়েশিয়ায় তাই প্রধানতঃ রামায়ণ-বিষয়ক নানা মৌখিক এবং লিখিত কাব্য, নাটক, নৃত্যনাট্য ইত্যাদির ভিত্তি রূপে ব্যবহার করা হয় : রামায়ণ কাহিনীর ঐতিহ্য তা' দিয়েই সৃষ্টি হ'য়েছে। তাই প্রথমেই মালয়েশিয়ার ছায়া-নাটকের অনুষ্ঠান দিয়েই সে দেশের রামায়ণের শিল্পরূপায়ণের সূচনা করা হ'লো।

ছায়া-নাটকের একজন মাত্র পরিচালক থাকে, তাকে সে দেশের ভাষায় বলে দালাঙ্। দালাঙ্ তার ছায়া-নাটকের ভিতর দিয়ে কেবল মাত্র যে রাম-কাহিনী পাঁচালীর মত সুর ক'রে গেয়ে যায়, তাই নয়, সে একা এই বিষয়ে আরও অনেক দায়িত্ব পালন করে। সে প্রত্যেকটী চরিত্রের হ'য়ে সংলাপ বলে যায়, তার উপর সে নিজে পরিচালক রূপে অনেক কিছু ঘটনার ব্যাখ্যাও ক'রে যায়। কারণ, ছায়ার মধ্য দিয়ে রামায়ণে সব কাহিনী এবং তার সবগুলো চরিত্রই যে স্পষ্ট হ'য়ে প্রকাশ পায়, তা নয়। অনেক কিছু বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং যে তার হাত দিয়ে একটী ছোট্ট পর্দার পিছন থেকে ছায়া-পুতুল (puppet) গুলো যথাযথ ভাবে নাড়াচাড়া ক'রে একটি কাহিনী প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপ সে নিজের মুখেই বলে, তেমনই যখন যেখানে যা বুঝিয়ে বল্‌বার প্রয়োজন হয়, তা' সে বুঝিয়েও যায়। সুতরাং সে একাই অভিনেতা, গায়ক, ব্যাখ্যাতা এবং পুতুলগুলোর সূত্রধার।

শুধু তাই নয়, তা'তে যে একটি বাদ্যভাণ্ড আছে, তারও সে পরিচালনা ক'রে থাকে। এই বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে নানা রকমের ঢোল, কাঁসা (gong) এবং সানাইয়ের মত একটি বাঁশীও থাকে। এতগুলো বাদ্যযন্ত্রের মধ্যেও যাতে কোনটিতেই তাল-লয় এবং মাত্রার কোনো ভুলচুক না হয়, সে দিকেও সে লক্ষ্য রাখে। সে ছোট্ট একটি পর্দার উপর ছবিগুলো পর পর দেখিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেরই সংলাপ, ব্যাখ্যা, এবং বাদ্য চল্‌তে থাকে। তার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মধ্যে মধ্যে সে হাস্যরস পরিবেষণ ক'রে তার বক্তব্য বিষয়কে একঘেয়েমি থেকে মুক্ত রাখবার প্রয়াস পায়। দালাঙেরা নিরক্ষর, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের এই ব্যবসায় অর্থাৎ রাম-কাহিনী ভিত্তিক ছায়া-নাটকের পরিবেষণ করা কুলক্রমাগত বৃত্তি। অনেক সময় তারা এই বিষয় অসাধারণ দক্ষতা লাভ ক'রে থাকে।

যাই হোক, পাণ্ডানের বিশাল উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের একেবারে সামনের দিকে এ'সে দালাঙ্ তার সবকিছু সরঞ্জাম নিয়ে ছায়া-পুতুলগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের ভাষায় রামায়ণের কাহিনী ব'লে যেতে লাগ্‌ল। একটি বেশ বড় কাঠের বাক্সের একদিকে পর্দার মত, বাক্সের পিছনে একটি আলো জ্বলছিল, আলো আর পর্দার মধ্যবর্তী স্থানটুকুতে সে চাম্‌ড়ার তৈরী লম্বা লম্বা হাত-পা ওয়ালা পুতুলগুলো নাড়াচাড়া ক'রে চল্‌ছিল, তা'তে পর্দার উপর যে ছায়া পড়্‌ছিল, তারই সে বাদ্যভাণ্ড সহকারে ব্যাখ্যা ক'রে চলেছিল। তার ভাষা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না, ছায়া ছবির মূর্তিগুলোও কেমন কেমন ঠেক্‌ছিল, এই ধরণের রাম-লক্ষ্মণ সীতার চেহারার সঙ্গে আমাদের ইতিপূর্বে পরিচয় হয়নি, তাই অল্পক্ষণের মধ্যে আমার নিকট অনুষ্ঠানটি একঘেয়ে হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সমাজেও অনুরূপ রামায়ণ বিষয়ক ছায়া-নাটকের ব্যাপক প্রচার আছে বলে সে দেশের দর্শকদের কাছে তা' বিরক্তির কারণ হ'চ্ছে ব'লে মনে হ'লো না। তারা গভীর আগ্রহের সঙ্গে তা' দেখ্‌তে লাগল। তবে একটা বিষয় আমার নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হ'লো—তা' ছায়া নাটক পরিচালনা বা অনুষ্ঠান বিষয়ে দালাঙের দক্ষতা। আগেই বলেছি, সে নিরক্ষর, অথচ প্রত্যেকবারই সে যা অনুষ্ঠান করে, তা' তাকে নূতন করেই কর্‌তে হয়, কারণ, তা' এত জটিল যে আগাগোড়া মুখস্থ ক'রে রাখবার উপায় নেই। কখনো সে অভিনয় করে, কখনো গান গায়,

কখনো বাঁশী বাজায়, অথচ তার দু'টি হাত পুতুলগুলো নাড়াচাড়াতেও সর্বদাই ব্যস্ত। পুতুলগুলোর আকৃতি প্রায় একই রকম—এমন কি, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও বিশেষ কোনো পার্থক্য অন্ততঃ আমি অনুভব করতে পারিনি। অথচ সে নিজে এ বিষয়ে ভুল ক'রে না, যখনই যে চরিত্রটির আবশ্যক তখনই তা তার পাশ থেকে হাতে তুলে নেয়, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে আলোর সামনে ধ'রে তার ব্যাখ্যা করতে থাকে। কোনো মুহূর্তেই তার অনুষ্ঠানের মাঝখানে কোনো ছেদ পড়তে দেয় না। চরিত্রগুলোর যখন সংলাপ চলতে থাকে, তখন বাদ্যভাণ্ড বন্ধ থাকে, যখন বাদ্য চলতে থাকে, তখন সংলাপ বন্ধ থাকে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে অবিরাম তার সংলাপ, বাদ্য এবং পুতুল প্রদর্শনী চলতে থাকে। প্রায় দেড়ঘণ্টা অনুষ্ঠানের পর মালয়েশিয়ার ছায়া-নাটক সমাপ্ত হ'লো।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রামায়ণ কাহিনীর এক একটি অংশ ছায়া-নাটকের মধ্য দিয়ে পরিবেষণ করা হয়। সমস্ত রাত্রি ধ'রে অনুষ্ঠান হ'লে কখনো কখনো রাম-জন্ম থেকে রাবণ-বধ কাহিনী উপস্থাপনা করা হ'য়ে থাকে। সেদিনকার অনুষ্ঠানে রামায়ণ কাহিনীর যে অংশটুকু পরিবেষণ করা হ'য়েছিল, তা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত। বিষয়-বস্তুটি নিচে উল্লেখ করা গেল—

মহর্ষি কালা অপি (Kala Api) সাতটি তালগাছ রোপণ ক'রে ঘোষণা ক'রে দিলেন, যে-ব্যক্তি পর পর সাতটি তালগাছকে একটি তীর দিয়ে বিদ্ধ ক'রে তীরটিকে তাদের ভেদ ক'রে দূরে নিক্ষেপ করতে পারবেন, তার হাতেই তিনি তাঁর একমাত্র সুন্দরী কন্যা সীতা দেবীকে সমর্পণ করবেন। অনেক রাক্ষস এল, কেউ একাজ করতে পারল না, অবশেষে রাক্ষসরাজ রাবণও এলেন। কিন্তু তিনিও এ কাজ করতে পারলেন না। অবশেষে মহর্ষি রাম ও লক্ষ্মণকে আমন্ত্রণ জানালেন। অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে, বহু বাধা বিঘ্ন দূর ক'রে রাম-লক্ষ্মণ সেখানে এসে হাজির হ'লেন। রামচন্দ্র সপ্ততাল ভেদ ক'রে প্রথমতঃ তীর নিক্ষেপ করতে ব্যর্থ হ'লেন। তারপর লক্ষ্মণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আবার যখন তীর ছুঁড়লেন, তখন সার্থক হ'লেন।

মহর্ষি রামচন্দ্রকে আরো একটি পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। মন্দিরের মধ্যে দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে সীতা দেবীকে মিশিয়ে রাখলেন,

রামচন্দ্রকে বললেন, তাকে খুঁজে বার কর। রামচন্দ্র মহা বিপদে পড়্‌লেন। তখন তিনি লক্ষ্মণের পরামর্শে একটি কাঠি নিয়ে মূর্তিগুলির চোখ খুঁচিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। যখন সীতী দেবীর চোখ খুঁড়তে গেলেন, তখন সীতী দেবী চোখ মিট্ মিট্ করতে লাগ্‌লেন, তাতেই রামচন্দ্র বুঝ্‌তে পারলেন, এই সীতী দেবী। মহর্ষি রামচন্দ্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করলেন। সীতার নাম সেখানে সীতী।

মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ছিল একটি নৃত্যনাট্য। সে দেশের ভাষায় তা'কে 'মক ইয়ঙ' (Mak Yong) বলে। এ'টি মালয়েশিয়ার একটি প্রথাগত নৃত্যনাট্য। পশ্চিম মালয়েশিয়ায় তার অধিক প্রচলন দেখা যায়। অনুষ্ঠানটি বেশ প্রাচীন ব'লে মনে হওয়ার কারণ আছে—খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন ইউরোপীয় পরিব্রাজক পটনী নামক রাজার দরবারে এই নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান দেখেছিলেন বলে তাঁর এক ভ্রমণ-কাহিনীতে উল্লেখ ক'রেছিলেন। তা' থেকে আরো একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে রাজকীয় অনুষ্ঠানে রামায়ণের কাহিনী সেদেশে বহু দিন আগে থেকেই গৃহীত হ'য়ে এ'সেছে। প্রকৃতপক্ষে সেখান থেকেই ক্রমে তা' জনসাধারণের মধ্যে প্রচারলাভ ক'রেছে।

এই নৃত্যনাট্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে তার প্রধান চরিত্রগুলো সবই স্ত্রীচরিত্র। এমন কি, তার নায়ক চরিত্রে যিনি অভিনয় ক'রে থাকেন, তিনিও নর্তকী বা অভিনেত্রী, অভিনেতা কিংবা নর্তক নন। দু'টি স্ত্রী পুরুষ সেজে তা'তে কৌতুকের অভিনয় ক'রে থাকে। বাদ্যভাণ্ড ছায়া-নাটকেরই মত, তবে ছায়ানাটকে সানাইর মত একটি বাঁশী যেমন প্রাধান্য লাভ করে, এখানে তার পরিবর্তে রবাবের মত একটি তারযন্ত্র বাদ্যে প্রাধান্য লাভ করে। রামায়ণের কাহিনী ভিন্ন অন্যান্য প্রসঙ্গও এই নৃত্যনাটের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তবে বহুকাল যাবৎ রামায়ণই তার একটি জনপ্রিয় বিষয়, কিছুকাল যাবৎ তা' আরো জনপ্রিয় হ'য়েছে।

সেদিন মক্ ইয়ঙ-এ রামায়ণের যে বিষয়-বস্তুটির নৃত্যনাট্যের ভিতর দিয়ে অনুষ্ঠান হ'য়েছিল, তা এই—

রাবণ বধের পর অযোধ্যায় ফিরে এ'সে একদিন রামচন্দ্র দূরে কোনো পবিত্র সরোবরে স্নান করতে গেছেন, প্রাসাদে সীতী তার সহচরীদেরে নিয়ে আমোদ প্রমোদে মত্ত হ'য়ে আছেন। এমন সময় রাবণের প্রেতাত্মা সীতার

উপর তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধা পরিচারিকার রূপ ধারণ ক'রে সেখানে এ'সে আবির্ভূত হ'লো। সে সীতী দেবীকে রাবণের একটি চিত্র এঁকে রাবণ দেখ্‌তে কেমন ছিল তা তাকে দেখিয়ে দিবার জন্য বার বার অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। সীতী দেবী বার বারই অস্বীকৃত হ'লেন, তাকে দূর ক'রে দিতে চাইলেন, কিন্তু সে কিছুতেই দূর হ'তে চাইল না। অগত্যা সীতী দেবী রাবণের একটি চিত্র এঁকে তাকে দেখালেন। দেখে ছদ্মবেশিনী অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ইতিমধ্যে রাম-লক্ষ্মণ প্রাসাদে ফিরে এলেন। সীতী দেবী চিত্রটি লুকিয়ে ফেল্‌লেন। সীতী দেবী শ্রীরামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা ক'রে তাঁদের শয়ন-কক্ষে নিয়ে গেলেন। রামচন্দ্র বিছানায় শুয়েই অসুস্থ বোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তার কারণ কি জানবার জন্য ঘরের মধ্যে তিনি অনুসন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লেন, এমন সময় রাবণের চিত্রটি দেখ্‌তে পেলেন। দেখ্‌বা মাত্র তিনি সীতী দেবীকে ভুল বুঝ্‌লেন; তিনি মনে কর্‌লেন, সীতী দেবী রাবণের প্রতি আসক্ত, সেই জন্য নিভৃতে তার চিত্র এঁকে তার শয়ন-গৃহে তা রেখে দিয়েছেন। মুহূর্তে তিনি ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে গিয়ে সীতী দেবীকে প্রহার কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ ধ'রে নির্মম প্রহার করবার পর লক্ষ্মণকে ডেকে সীতী দেবীকে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রাণদণ্ড দিতে বল্‌লেন। লক্ষ্মণ সীতী দেবীকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে চ'লে গেলেন, কিন্তু সীতী দেবীর প্রাণদণ্ড দিতে পারলেন না, কারণ, তিনি জান্‌তেন সীতী দেবী সন্তান-সম্ভবা, তাঁকে নগরের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে পরিত্যাগ ক'রে চলে এ'লেন। সীতী দেবী মহর্ষি কুলের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই রামচন্দ্র তাঁর আচরণের জন্য অনুতপ্ত হ'তে লাগ্‌লেন। পরিষদগণ তাঁকে বনে গিয়ে শিকার করবার পরামর্শ দিলেন, মহর্ষি কুলের আশ্রমের দিকে তাঁকে যেতে বল্লেন। সেখানে গিয়ে সীতী দেবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁকে তিনি প্রাসাদে ফিরে আস্‌বার জন্য অনুরোধ করলেন। সীতী দেবী বল্লেন, তিনি একটি মাত্র সর্তে আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে পারেন, সর্তটি এই—সিরি রাম এক হাজার সোনার থামের উপর একটি সোনার কক্ষ তৈরী কর্‌বেন। রামচন্দ্র তাই করলেন, সীতীদেবীকে পুনরায় বিবাহ ক'রে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

প্রসঙ্গত এখানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণের নিম্নোদ্ধৃত কাহিনীটি উল্লেখ করতে পারা যায়—

শয়ন মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী।
সোনার পালঙ্ক পাতা গো ফুলের বিছানি ॥
চারি দিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল ॥
নানা জাতি ফল আছে সুগন্ধে রসিয়া।
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া ॥
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল।
অল্প আবেশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল ॥
উপকথা সীতারে শুনায় আলাপনী।
হেনকালে আসিল তথায় কুকুয়া ননদিনী ॥
কুকুয়া বলিছে গো বধূ মোর বাক্য ধর।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি গো রাবণের ঘর ॥
দেখি নাই রাক্ষস গো শুনিতে কাঁপে হিয়া।
দশমুণ্ড রাবণ রাজা দেখাও আঁকিয়া ॥
মূর্চ্ছিতা হইল সীতা গো রাবণ নাম শুনি।
কেহ গো বাতাস দেয় গো কেহ দেয় পানি ॥
সখীগণ কুকুয়ারে করিল বারণ।
অনুচিত কথা তুমি বল কি কারণ ॥
রাজার আদেশ নাই বলিতে কুকথা।
তবে কেন ঠাকুরাণী গো মনে লাগে ব্যথা ॥
প্রবোধ না মানে গো কুকুয়া ননদিনী।
বার বার সীতারে বোলয়ে সেই বাণী ॥
সীতা বলে আমি তারে গো না দেখি কখন।
কিরূপে আঁকিব আমি গো পাপিষ্ঠ রাবণ ॥
যত করি বুঝান গো কুকুয়া না ছাড়ে।
হাসিমুখে সীতারে বুঝায় বারে বারে ॥
বিষ লতার বিষ ফল বিষ গাছের গোটা।
অন্তরে বিষের হাসি গো বাঁধাইল লেঠা ॥

সীতা বলে দেখিয়াছি গো ছায়ার আকারে।
হরিয়া যখন দুষ্ট লৈয়া যায় মোরে ॥
সাগর জলেতে পড়ে গো রাক্ষসের ছায়া।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত রাক্ষসের কায়া ॥
বসি ছিল কুকুয়া যে শুইল পালঙ্কেতে।
আবার সীতারে কয় রাবণ আঁকিতে ॥
এড়াতে না পারি সীতা গো পাখার উপর।
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল।
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলে দিল ॥

তারপর রামচন্দ্রকে ডেকে নিয়ে এসে এ'দৃশ্য দেখাল। তার ফলেই ক্রুদ্ধ হ'য়ে রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিলেন।

পূর্ববাংলা থেকে কাহিনীটি মালয়েশিয়ায় নীত হ'য়েছে ব'লে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণে কাহিনীটি নেই।

মালয়েশিয়ার সেদিনকার চতুর্থ নৃত্যনাট্যের বিষয়টি ছিল সীতাহরণ। তার কাহিনীটি এইরূপ—ধনুর্ভঙ্গে জয় লাভ ক'রে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এ'লেন। রাবণ ধনুর্ভঙ্গে পরাজিত হ'য়ে নিজে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করবার সঙ্কল্প করলেন। তিনি স্থির করলেন, সীতাকে অপহরণ করবেন। ইতিমধ্যে রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য লক্ষ্মণ ও সীতীদেবী সহ বনবাসে এসেছেন। রাবণ তার ভগ্নীকে আদেশ দিলেন, সে যেন একটি সোনার হরিণের রূপ ধারণ ক'রে সীতী-দেবীর সাম্‌নে গিয়ে নেচে বেড়ায়। সীতীদেবী যখন তা' দেখ্‌তে পেলেন, তখন তিনি রামচন্দ্রকে হরিণটি জীবন্ত ধরে দেবার জন্য অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন। রামচন্দ্র রাজি হ'য়ে সোনার হরিণের পিছনে ছুটে গেলেন। লক্ষ্মণ সীতীদেবীর প্রহরায় নিযুক্ত রইলেন। এমন সময় রাবণ বাইরে থেকে রামচন্দ্রের গলা অনুকরণ ক'রে লক্ষণকে আর্তনাদ করে ডাকতে লাগ্‌লেন, সীতীদেবীর একান্ত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণও মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন। যাবার আগে তার চারদিক ঘিরে গণ্ডী টেনে দিয়ে গেলেন, তাকে গণ্ডীর বাইরে আস্‌তে নিষেধ করলেন।

এমন সময় রাবণের আবির্ভাব হ'লো, তিনি সীতাদেবীর নিকট কোনো জিনিস প্রার্থনা করলেন। কিন্তু গণ্ডী অতিক্রম ক'রে তার কাছে যেতে পারলেন না; অবশেষে সীতাদেবী হাত বাড়িয়ে তার প্রার্থিত বস্তু যখন তার হাতে দিতে গেলেন, তখন রাবণ তাঁকে হাতে ধ'রে ফেল্‌লেন এবং তাঁকে নিয়ে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে রামচন্দ্রের পিতৃবন্ধু জণ্টায়ু (জটায়ু) পাখী রাবণকে বাধা দিলেন, কিন্তু পরাজিত হ'লেন। সীতাদেবী জণ্টায়ুর ঠোঁটে নিজের হাত থেকে আংটিটি খুলে পরিয়ে দিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ ফিরে এ'সে সীতার সন্ধানে বেরোলেন। পথে আহত জণ্টায়ুর সঙ্গে দেখা। তার কাছে সীতা দেবীর আংটিটি পেলেন। তারা জান্‌তে পারলেন, রাবণ তাঁকে হরণ ক'রে লঙ্কায় পাড়ি দিয়েছে। অবশেষে লঙ্কাযুদ্ধে হনুমানের সাহায্যে রাবণকে বধ ক'রে রাম সীতাকে উদ্ধার করলেন।

মালয়েশিয়ার নৃত্যনাট্য খুব উচ্চাঙ্গ শিল্পসম্মত নৃত্যও নয়, নাট্যও নয়। সীতাকে রামচন্দ্র বনবাস দিবার দৃশ্যে একটি প্রকৃত বাঁশের ঝাঁটা দিয়ে যে নির্দয়ভাবে প্রহার কর্‌ছিলেন, তা'তে কোনো শিল্পগুণ প্রকাশ পায়নি। প্রকৃত ঝাঁটা ছাড়াও যে নৃত্য দিয়েই প্রহারের কাজ দেখানো যায়, এই সাধারণ বিষয়টি শিল্পী বুঝ্‌তে পারেন নি। এই নৃত্যের আর একটি ত্রুটি, তার পটভূমিকায় মধ্যে মধ্যে স্ত্রীকণ্ঠে সঙ্গীত শোনা গেল। মঞ্চের এক কোণে ব'সে কয়েকটি মহিলা মধ্যে মধ্যে নৃত্যের পটভূমিকায় সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে চলেছিলেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে নানা আকৃতির ঢোলক, আড়বাঁশী স্থান লাভ ক'রেছিল। স্ত্রীচরিত্রের রূপসজ্জায় বহু মূল্যবান জরি-খচিত লুঙ্গি ও মণিবন্ধ পর্যন্ত আচ্ছাদিত জামা। রাম-লক্ষ্মণ ও রাবণের রাজবেশ—তা'তে বহু কারুকার্য-খচিত রঙিন লুঙ্গি, দেহের ঊর্ধ্বভাগ অনাবৃত হ'লেও রত্ন-অলঙ্কারে তা পরিপূর্ণ। প্রত্যেকের মাথায় কারুকার্য-খচিত রাজমুকুট। বাদ্যকরদের পরিধানে সাধারণ লুঙ্গি, গায়ে গলাবন্ধ পাঞ্জাবী এবং মাথায় ফিকা লাল রঙের পাগড়ির মত ক'রে বাঁধা এক টুকরো কাপড়। শিল্পীদের মধ্যে উচ্চাঙ্গের প্রতিভা-সম্পন্ন কেউ ছিল ব'লে মনে হ'লো না, তাই পরিবেষণা খুব উচ্চস্তরের হ'য়েছে ব'লে আমার মনে হয় নি।

যোগজাকার্তা, মধ্য যবদ্বীপ

রাত্রি ৮॥০ টায় মালয়েশিয়ার নৃত্যানুষ্ঠান শেষ হ'য়ে যাবার পর মধ্য যবদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী সহর যোগজাকার্তার অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'লো। প্রকৃতপক্ষে যোগজাকার্তার রাজপ্রাসাদেই একদিন রামায়ণ নৃত্যনাট্য সব চাইতে বেশী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রেছিল এবং সেখানকার প্রাচীন রাজবংশ তার উৎসাহদাতা ছিলেন বলে তার একটি বিশিষ্ট ঘরানা দীর্ঘতম কাল ধ'রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে সেখানে বিকাশ লাভ করেছিল। সেইজন্য যোগজাকার্তার রামায়ণ-নৃত্যপদ্ধতির মধ্যেই যবদ্বীপের রামায়ণ নৃত্যের প্রাচীনতম রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়। তাকেই সে'জন্য 'ক্লাসিক' রীতি ব'লে উল্লেখ করা হয়। রাজতন্ত্রের যুগে সেখানে রাজপ্রাসাদেই তার অনুশীলন হ'তো, তা' থেকে ক্রমে তারই বিশিষ্ট ধারাটি যবদ্বীপের অভিজাত পরিবারের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। যবদ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করবার পর সেই প্রাচীন অভিজাত-সমাজাশ্রয়ী পদ্ধতিটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করে। কিন্তু যাতে মূল আদর্শের কোনো প্রকার বিকৃতি না ঘটে, সেদিকে সাধারণ শিল্পী এবং শিল্প পরিচালকদের বিশেষ লক্ষ্য আছে।

যোগজাকার্তার পদ্ধতিটির নাম সে দেশের ভাষায় ওয়েঅঙ্-উওঙ্ (Wayang-wong)। তার প্রধান বিশেষত্ব এই যে সেখানকার প্রাচীনতর কাল থেকে প্রচলিত রামায়ণ বিষয়ক ছায়া নাটকের তা' নৃত্যনাট্যরূপ।

'ওয়েঅঙ্' শব্দের অর্থ ছায়া এবং উওঙ্ শব্দের অর্থ মানুষ। সুতরাং পুতুলের পরিবর্তে মানুষ যাতে ছায়া-নাটকে অংশ গ্রহণ করে, তাকেই 'ওয়েঅঙ্ উঅঙ্' বলা হয়। পুতুলের ছায়া-নাটকের ধারা অত্যন্ত প্রাচীন, এমন কি, স্মরণাতীত কাল থেকে ইন্দোনেশিয়ায় তা চলে এ'সেছে, তারই প্রাচীন ধারাটি নির্জীব প্রাণহীন পুতুলের পরিবর্তে মানুষের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হচ্ছে। রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের যুগে নারী এ'র নৃত্যে অংশগ্রহণ করত না, অল্প বয়স্ক কিশোরেরা স্ত্রীভূমিকায় নৃত্য ক'রত। কিন্তু সাধারণের ক্ষেত্রে তা প্রসার লাভ করবার পর থেকে তা'তে স্ত্রীভূমিকায় নারীজাতিই অংশ গ্রহণ ক'রে আস্ছে।

যোগজাকার্তার নৃত্যনাট্য পদ্ধতি (ওয়েঅঙ্ ওয়ঙ্) যোগজাকার্তার রাজপ্রাসাদে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রথম উদ্ভূত হ'য়েছিল। আগে তা'তে মহাভারতের কাহিনীরই প্রধানতঃ নৃত্যানুষ্ঠান হ'তো। কারণ, রাজ-পরিবারের মধ্যে মহাভারতের কাহিনী অধিকতর জনপ্রিয় ছিল, তবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে জনসাধারণের ক্ষেত্রে তা' প্রচারিত হ'বার আগেই তা'তে রামায়ণের কাহিনীও গৃহীত হ'তে থাকে। বর্তমানে মহাভারতের কাহিনীর পরিবর্তে রামায়ণের কাহিনীই তার একমাত্র উপজীব্য হ'য়েছে।

যোগজাকার্তার রাজবংশের একজন প্রসিদ্ধ রাজা সুলতান হেমাঙ্গ ভূষণ প্রথম, খৃষ্টীয় ১৭৫৫ থেকে ১৭৯২ সন পর্যন্ত রাজত্ব ক'রেছিলেন, তাঁর রাজ্যকাল তাই দীর্ঘস্থায়ী হ'য়েছিল। তিনিই নৃত্যনাট্যের যোগজাকার্তা পদ্ধতির অর্থাৎ ওয়েঅঙ্ ওয়ঙ্-এর প্রথম উদ্ভাবক ব'লে পরিচিত। তিনি যেমন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তেমনই সকল শিল্পকর্মে উৎসাহদাতা এবং নিজেও একজন শিল্পী ছিলেন। ক্রমে যোগজাকার্তার রাজপরিবারকে কেন্দ্র ক'রে এই বিশেষ পদ্ধতি বিকাশ এবং প্রচার লাভ করতে লাগল। একদিন যা কেবল মাত্র রাজপ্রাসাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা কালক্রমে সাধারণ প্রজাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। খৃষ্টাব্দ ১৯২১ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সুলতান হেমাঙ্গ ভূষণ অষ্টমের রাজত্বকালে যোগজাকার্তার নৃত্যনাট্যপদ্ধতি চরম উৎকর্ষ লাভ করে। জানতে পারা যায়, এই ক'বছরের মধ্যে যোগজাকার্তার রাজপ্রাসাদে তার ২০টি অনুষ্ঠান হয়, তার ভিতরে তখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি অনুষ্ঠানে রামায়ণের বিষয় অবলম্বন করা হ'য়েছিল, অবশিষ্ট কয়টিতে মহাভারতের কাহিনী উপজীব্য হ'য়েছিল; কিন্তু তারপর থেকেই ক্রমে যখন জনসাধারণের মধ্যে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'তে আরম্ভ করল, তখন থেকেই রামায়ণের কাহিনী মহাভারতের কাহিনীর স্থান অধিকার ক'রে নিল।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত যোগজাকার্তা থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরবর্তী প্রাম্বানামের শিবমন্দির গাত্রে রামায়ণ-কাহিনী যে ভাবে উৎকীর্ণ হ'য়েছে, তা'তে মনে হয়, রামায়ণ-বিষয়ক নৃত্যনাট্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর আগে থেকেই এ' দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তা' সত্ত্বেও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আগে তার বর্ত্তমান সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপটি আত্মপ্রকাশ

করতে পারেনি। তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য মধ্য যবদ্বীপের দু'টি ঐতিহাসিক রাজপরিবারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য—তা' যোগজাকার্তার রাজ পরিবার এবং সুরকর্তার রাজপরিবার। আগেই বলেছি, যোগজাকার্তার পদ্ধতির উদ্ভাবক সুলতান হেমাঙ্গভূষণ প্রথম এবং সুরকর্তা পদ্ধতির উদ্ভাবক সুরকর্তার রাজকুমার আদিপতি আর্য।

মধ্য যবদ্বীপের এই দু' পদ্ধতির নৃত্যনাট্যই আজ পর্যন্ত সমগ্র যবদ্বীপ এবং বালীদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। বিশেষতঃ দু'টি ধারাই দু'টি প্রাচীন রাজবংশ দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে বলে তাদের প্রত্যেকেরই এক একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধ'রেই স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং তাই আজো সমগ্র বালীদ্বীপ এবং যবদ্বীপের রামায়ণ নৃত্যনাট্যের আদর্শ হয়ে আছে। বালীদ্বীপের নৃত্যনাট্য বহু দিন থেকেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হবার ফলে তার পদ্ধতির মধ্যে নানা লৌকিক উপকরণ গৃহীত হয়েছে; শুধু তাই নয়, অনেকে মনে করেন, তা'তে ভারতীয় এবং চীনা পদ্ধতির প্রভাবও অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে আছে। সেই জন্য ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যনাট্যের 'ক্লাসিক' পদ্ধতি বলতে এখনো যোগজাকার্তা এবং সুরকর্তার পদ্ধতিকেই বুঝায়।

দু'টি পদ্ধতিরই জন্ম হয়েছে রাজ দরবারে, সেই জন্য তাদের দরবারী (Court) পদ্ধতি বলা যায়। যবদ্বীপের শিল্পরসিক বিদগ্ধ সমাজও মনে করেন যে যোগজাকার্তার পদ্ধতি .... 'is purely a court creation, and to many it remains the most perfect form of Javanese art.' কিন্তু ১৯৪০ সনের পর থেকে রাজপ্রাসাদে এই নৃত্যের আর কোনোদিন অনুষ্ঠান হয় নি, বরং তখন থেকেই তা রাজ-দরবার পরিত্যাগ ক'রে জনসাধারণের আম দরবারে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু ১৯০০-৩৩ সন পর্যন্ত যোগজাকার্তা পদ্ধতির স্বর্ণযুগ ছিল, যোগ-জাকার্তা রাজদরবারে সেই সময়ই তার শেষ দীপ্তি প্রকাশ পাবার পর সেখান থেকে তা চিরতরে বিদায় নিয়ে জনসাধারণের ক্ষেত্রে নেমে আসে। তখন থেকে তার নূতন যাত্রা সুরু হ'য়েছে।

আজ যোগজাকার্তা পদ্ধতির প্রথম অনুষ্ঠান এবং পরের দিন সুরকর্তা পদ্ধতির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দু'টি অনুষ্ঠানের বিষয় এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা আবশ্যক।

যোগজাকার্তার অনুষ্ঠানের সেদিনকার বিষয় ছিল অশোক-বনে সীতা এবং হনুমান ও সীতার সাক্ষাৎকার। রাত্রি প্রায় পৌণে ন'টার সময় অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'লো। বিস্তৃত মঞ্চের উপর থেকে অন্ধকার অপসৃত হওয়া মাত্র দেখা গেল, সমস্ত মঞ্চটি জুড়ে যেন একটি পুষ্পিত অশোক-বন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝ্‌তে পারা গেল ইন্দোনেশীয় প্রায় দু' শত সুন্দরী তরুণীকে সবুজ রঙের পরিধেয়, সবুজ বক্ষাবরণী এবং প্রত্যেকের দু'ধারে লম্বমান দু'টি সবুজ রঙের চাদর (sash), মাথায় অশোকগুচ্ছ-খচিত সবুজ পাতার মুকুট তারা এমন ভাবে সমবেত নৃত্যভঙ্গি করছে যাতে মনে হ'তে লাগ্‌লো যেন সত্য সত্যই একটি বন মৃদু বায়ুভরে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হ'চ্ছে। একটি পুষ্পিত অশোকবন যেন বিমুগ্ধ দর্শকের সাম্‌নে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। সে বন যেন প্রকৃত বনও নয়, তা'কে উদ্যান বলা যায়, কিন্তু বন বলা ভুল হয়। বনের মধ্যে ছোটবড় নানা আকৃতির গাছ নানাভাবে হয়ত নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু এ'বনের অশোক গাছ বলে যা ভ্রম হচ্ছে, তা সযত্ন বিন্যস্ত, সারিবদ্ধ এবং গাছগুলোর উচ্চতা এবং বিস্তার সবারই সমান। সুতরাং তা' স্বাভাবিক বন নয়, বরং সযত্ন সংরক্ষিত উদ্যান। সেদিন বালীদ্বীপের সীতাহরণের দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চের বিশালত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয় একভাবে ভেবেছিলাম, আজকে তার প্রয়োজনীয়তা অন্য দিক দিয়ে দেখা দিল। অর্থাৎ সেদিন দেখেছিলাম যে দূরত্ব এবং বিস্তার বুঝাতে এমনি একটি সুবৃহৎ রঙ্গমঞ্চেরই আবশ্যক, কিন্তু আজ বুঝ্‌তে পারলাম, উদ্যানের গভীর রহস্য-নিবিড়তা বুঝানোর জন্যও বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক হয়।

ইন্দোনেশীয় তরুণীদের মৃদু নৃত্যভঙ্গির ভিতর দিয়ে বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে যে একটি বিশাল উপবনের একটি অংশ যেন বায়ুভরে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। সবটুকু দৃশ্য মিলে তা' একটি অখণ্ড উপবনের রূপ লাভ করেছে, কোনো অংশেই তা' খণ্ডিত নয়। ইন্দোনেশীয় তরুণীদের রূপসজ্জা এক, তা'দের উচ্চতা এক, তাদের দেহ-ভঙ্গিমা এক, গায়ের রঙ্‌, মুখের আকৃতি সবই ভগবৎ-প্রদত্ত এক এবং অভিন্ন; তাই অতি সহজেই এই অখণ্ডতার সৃষ্টি হ'য়েছে।

এই বিশাল উপবনের মধ্যে আর যে দু'টি স্ত্রী চরিত্র আছে, তা'দের সহজে প্রথম দর্শনেই দেখা যায় না। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য ক'রে

দেখ্‌লে বুঝতে পারা যায়। দু'টির মধ্যে একটি যে সীতা, তা' দেখ্‌বা মাত্র বুঝ্‌তে পারা যায়। তার বিষাদিনী রূপ। নৃত্যের অঙ্গভঙ্গিতে কেবলমাত্র যে আনন্দের ভাবই প্রকাশ ক'রে থাকে, তা' নয়, বিষাদের ভাবটি যে তার চাইতেও সার্থকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে এবং তা' কতখানি সার্থক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, সেই নৃত্য না দেখ্‌লে তা' বুঝ্‌তে পারা যায় না। মানুষ সর্বাঙ্গ দিয়ে তার মনের সকল ভাব প্রকাশ কর্‌তে পারে, নৃত্যের উদ্দেশ্যই তাই। মানুষের জীবনে ভাবের কত বৈচিত্র্য। তাই নৃত্যও বিচিত্র হ'য়ে উঠে। সীতার ঈষৎ অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে তার অন্তরের বিষাদ ভাব যেন বাইরে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে এবং তাই যেন প্রসারিত হ'য়ে সমগ্র অশোক বনকে স্পর্শ ক'রেছে, সেইজন্য বনের মধ্যে যে আন্দোলন তা অত্যন্ত মৃদু, একটু অনুভব কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যাবে যে সেই মৃদুভাব করুণ রসেরই প্রকাশক। সমগ্র বনভূমি যে সীতার দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে, এই নৃত্যে তাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

সীতার সামনেই আর একটি স্ত্রীচরিত্র, তার নৃত্যের ভঙ্গির মধ্য দিয়েও শান্ত, সংযত একটি পবিত্র ভাব। চরিত্রটির নাম ত্রিজটা। বাল্মীকির বর্ণনায় ত্রিজটা বৃদ্ধা রাক্ষসী ভীষণ-দর্শনা, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার পরিকল্পনায় সে পরমা সুন্দরী, পোশাকে পরিচ্ছদে তার শালীনতার সঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ, পরিধানে বিচিত্র রত্নখচিত লুঙ্গির আকৃতি পট্টবাস, বাঁ কাঁধ থেকে বক্ষ আচ্ছাদিত ক'রে ডান পাশ পর্যন্ত লম্বিত উত্তরীয়, দু'পাশে চাদরের মত লম্বমান sash, মাথায় ফুলের মুকুট, সর্বাঙ্গে পুষ্প আভরণ, অনিন্দ্যসুন্দর তরুণী বেশ। সে যেন বন্দিনী সীতার সামনে দাঁড়িয়ে আশার প্রতিমূর্তি।

অস্পষ্ট সবুজ আলোকে বন মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। আগেই ব'লেছি, সেই আন্দোলন যেন বনের দীর্ঘশ্বাস, বিষাদিনীর প্রতিমূর্তিরূপে সীতা তার মধ্যে স্থির হ'য়ে করুণ এক ভঙ্গি ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, সম্মুখে ত্রিজটা, সমগ্র বিষাদ-পরিবেশের মধ্যে যেন ক্ষীণ আশার একটি সুস্নিগ্ধ করুণ আলো।

এই ভাবে দীর্ঘকাল ধ'রে নৃত্য চল্‌ল, সহসা 'বনভূমি' স্থির হ'য়ে গেল, ত্রিজটার নৃত্যে সহসা এক শঙ্কিতভাব প্রকাশ পেল, সীতা যেন কি এক অশুভ আশঙ্কা ক'রে মুহূর্তের জন্য একবার চম্‌কে উঠেই স্থির হ'য়ে

পড়লেন। দূর প্রবেশ পথে আলো পড়ল, দেখা গেল, তার মধ্যে রাবণের এক দিব্যমূর্তি ভেসে উঠেছে। তিনি নৃত্যভঙ্গিতে 'বনপথ' অতিক্রম ক'রে ধীরে ধীরে সাম্‌নের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। তাঁর অপূর্ব রূপ-সজ্জা। আমাদের দেশের দশরা, রামনবমী কিংবা ছৌনাচের মুখোশের মত তিনি মুখোশপরা দশমুণ্ড কুড়িহাত রাবণ নন, বরং তার পরিবর্তে তাঁর অপূর্ব সুন্দর রাজবেশ, মাথায় রত্নখচিত রাজমুকুট, সযত্ন চর্চিত আস্কন্ধ বিলম্বিত চাঁচর চিকুর, বক্ষে রত্নহার, এক হাতে কটিবদ্ধ উত্তরীয়ের এক প্রান্ত ও অপর হাতে অপর প্রান্ত ধৃত, মুখ ঈষৎ আনত, প্রসন্ন হাস্যযুক্ত, তরুণ শ্মশ্রু ও গোঁপের রেখায় মুখ আচ্ছাদিত, নাসিকা তীক্ষ্ণ। পরিধানে জানু পর্যন্ত রক্তবাস, তার উপরিভাগে সাদা রেশমী চাদরের বেষ্টনী, তা আবার সম্মুখভাগে কোঁচার মত ক'রে সামান্য লম্বিত। হাতে কোনো অস্ত্র কিংবা অন্য কোনো উপকরণ নেই, বাহুতে মণিবন্ধ, পায়ে বলয়জাতীয় অলঙ্কার। পিছনে পিঠের দিকে রত্নখচিত কবচ এবং কটিদেশ থেকে পিছনের দিকে সবুজ রঙের দুইভাগে দু'টি উত্তরীয়, তাও হাঁটু পর্যন্ত বিলম্বিত। রাবণের এই অপূর্ব রাজবেশ দেখে আমার মুহূর্তেই মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাবণের বর্ণনার কথা আবার মনে হ'লো—Ravana was a grand man.

রাবণের নৃত্যের মধ্য দিয়ে কোনো অশালীনতা প্রকাশ পেল না, কোনো হীন লালসার ইঙ্গিত কিংবা কোনো ইতর মনোভাব ব্যক্ত হ'লো না, বরং পদক্ষেপে, অঙ্গ সঞ্চালনে, মুখের প্রসন্নতায় সর্বত্রই এক আভিজাত্যের স্পর্শ অনুভব করা গেল।

১৯৫৪ সনে আমি যখন রাশিয়ায় যাই, তখন সেখানে Bronze Horseman নামে একটি ব্যালে নৃত্যে পিটার দি গ্রেট চরিত্রের একটি নৃত্য দেখেছিলাম। তাঁর রাজকীয় আভিজাত্য এবং চরিত্রগত মাহাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ব্যালে নৃত্যের যে পরিকল্পনা করা হ'য়েছিল, তা' দেখে আমি সেদিন মুগ্ধ হ'য়েছিলাম। সেদিন বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, নৃত্য কেবল মাত্র ব্যবসায়ী নৃত্যশিল্পী কিংবা মন্দিরের দেবদাসীরই কাজ নয়, তা' পিটার দি গ্রেটের মত সম্রাটের পক্ষেও শোভন কাজ হ'তে পারে, তার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সম্রাটের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। রাবণের নৃত্যেও সেদিন তাই দেখ্‌তে পেলাম। 'দেব-দৈত্য-

নর-ত্রাস' রাবণ নৃত্যেও কি অনুপম! নৃত্য মহতেরই গুণ, তা' ক্ষুদ্রের কিছু নয়।

অনেকক্ষণ ধ'রে নৃত্য করে রাবণ দীর্ঘ বনপথ অতিক্রম করলেন, তারপর সীতার একেবারে সম্মুখীন হ'য়েই নৃত্যের ভিতর দিয়েই ত্রিজটাকে সেখান থেকে প্রস্থান করবার জন্য আদেশ করলেন। ত্রিজটা রাবণের আদেশ শিরোধার্য ক'রে দীর্ঘ 'বনপথে'র উপর দিয়ে নৃত্য ক'রে দূর নিষ্ক্রমণ পথে দৃশ্য থেকে নির্গত হ'য়ে গেল। সমস্ত অশোকবন স্থির হ'য়ে রইল, রাবণের ভয়ে যেন তার কাতর নিঃশ্বাসও রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

এ'বার সীতাকে ঘিরে রাবণের নৃত্য চল্‌তে লাগ্‌ল। সীতা তাঁর সামনে স্থির হ'য়ে একটি অপূর্ব ভঙ্গি সহকারে দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই ভঙ্গিতে অবিমিশ্র কাতরতার ভাব নেই, যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি তার বিলুপ্ত তেজ তখনো উপলব্ধি কর্‌ছে। সে তেজ তখনো পুরোপুরি ভস্মে পরিণত হয় নি', কিন্তু তা' হ'বার আগে শেষবারের মত আর্বার দীপ্ত তেজে প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌তে চাইছে, তাই সীতার দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণের ভাব নেই, বরং তার পরিবর্তে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি।

কতভাবে রাবণের নৃত্য চল্‌তে লাগ্‌ল, নৃত্যের মধ্য দিয়ে কখনো অনুনয়, কখনো প্রতিশ্রুতি, কখনো প্রলোভন, কখনো ভীতি কখনো আশ্বাস সব কিছুরই ভাব একে একে প্রকাশিত হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু সীতা অবিচল হ'য়ে তাঁর মধ্যে শেষ বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত ক'রে তুলবার প্রয়াসে যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। সেই ধ্যান আত্মশক্তি উদ্বোধনের ধ্যান, তা' আত্মমর্যাদা উপলব্ধির ধ্যান।

ভারতবর্ষে নানা লৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রামায়ণের কাহিনীকে আমরা অনেক নিম্নস্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছি; তার কারণ, রামায়ণ সম্পর্কে আমাদের কোনো অনুশীলন কিংবা ভাবনা নেই, রামায়ণ আমাদের আচার-জীবনে প্রবেশ করবার ফলে তা' আমাদের কাছে প্রাণের স্পর্শহীন হয়ে পড়েছে। তাকে আর আমরা সজীব করে তুল্‌তে পাচ্ছি না। তার সম্পর্কিত সকল শিল্প-চেতনাও আমাদের কাছে প্রাণহীন এবং নির্জীব হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু যাদের এখনো এ' সম্পর্কে ভাবনা আছে, তারা প্রতিনিয়তই তাকে নূতন প্রাণরসে সঞ্জীবিত ক'রে তুলবারও প্রয়াস করে চলেছে। তাই ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ এখনো সজীব এবং সরস,

প্রাণহীন আচার-সর্বস্ব হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি। বাল্মীকি রাবণকে রাক্ষস ক'রেছিলেন, দেখাদেখি কৃত্তিবাসও তাকে একজন ভক্ত রাক্ষস ক'রেছেন, এই মাত্র; কিন্তু তিনিও তাকে রাক্ষস সংস্কার থেকে মুক্তি দিতে পারেননি, কিন্তু ইন্দোনশিয়ায় সে মুক্তি অতি সহজেই সম্ভব হয়েছে।

রাবণের দীর্ঘকাল ধরে বিচিত্র ভঙ্গিতে নৃত্যের শেষ ভাগে সহসা বুঝ্‌তে পারা গেল, যেন সীতার অন্তর-মধ্যস্থ তেজোরাশি সহসা প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠে, তার সর্বাঙ্গের ভিতর দিয়ে তা' বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। যে রাবণ এতক্ষণ পর্যন্ত আনন্দ রসে আত্মহারা হ'য়ে নৃত্য ক'রে চলেছিল, তার মধ্যে যেন সহসা ভয়ের ভাব দেখা গেল, তার তখনকার নৃত্যে সেই ভীতির ভাব সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। রাবণ সীতার দিকে আর তাকাতে পারলেন না, ধীরে ধীরে নৃত্য করৃতে করৃতে বিমূঢ়ের মত মঞ্চের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে দ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই অশোক বনভূমি মৃদু নৃত্যছন্দে আবার আন্দোলিত হ'য়ে উঠল, এতক্ষণ সেই বিশাল মনুষ্যগঠিত বন-প্রকৃতি যেন রাবণের ভয়ে স্থির হয়ে ছিল। এমন কি, তার মধ্যে নিঃশ্বাসেরও সাড়া ছিল না, আবার তার মধ্যে যেন জীবনের স্পন্দন ফিরে এ'লো। সীতাও যেন আত্মস্থ হ'য়ে এক করুণ ভঙ্গি সহকারে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এমন সময় অশোকবন আবার দ্রুত আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল, বহুদূর প্রবেশের পথে দেখা গেল, সর্বশুক্ল মূর্তি হনুমানের আবির্ভাব হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার পরিকল্পনায় হনুমান সর্বশুক্ল, তা'কে ইংরেজিতে সেখানে সাদা বনমানুষ (white ape) বলা হয়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকে সাদা রঙের আঁট জামা পরানো হয়। মুখে পিঙ্গল বর্ণ ঈষৎ দাড়ি গোঁপ দেখা যায়। আমাদের দেশে হনুমানের রূপসজ্জার মধ্যে যেমন লাঙ্গুলটির উপর সব চাইতে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়, সেখানে তা' হয় না, বরং তার লাঙ্গুলটিকে কোমরের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে রেখে দেওয়া হয় যে তা' প্রায় চোখেই পড়ে না। কারণ, তার নৃত্যও অত্যন্ত কঠিন নৃত্য, সেই কঠিন নৃত্যের উপযোগী ক'রেই তার রূপসজ্জা করা হয়। তারপর যে কথা সব চাইতে আগে বলা প্রয়োজন—সেখানে হনুমান কোনো হাস্যোদ্রেককারী চরিত্র নয়, হনুমান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিকল্পনায় বীর এবং ভক্ত চরিত্র। রামায়ণের দুই বীর চরিত্র—হনুমান এবং

লক্ষ্মণ ; হনুমানের ভক্তি এবং ব্রহ্মচর্য—লক্ষ্মণের ত্যাগ এবং ব্রহ্মচর্য সহজেই সকল সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছে। তাই সেখানে হনুমান রামায়ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র।

আমি বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে হনুমানের প্রবেশ-পথের দিকে লক্ষ্য করছিলাম, নৃত্যের মধ্য দিয়ে তার সতর্কতা বা সাবধানতা গ্রহণ করবার ভাবটি সুন্দর পরিস্ফুট হ'য়েছে, চারদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে সতর্কতার ভঙ্গি ক'রে হনুমান সামনের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে, বনভূমি আগের চাইতে আরো একটু বেশী আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ল, সীতার নৃত্যভঙ্গির মধ্যেও ভাবান্তর দেখা দিল, কি যেন এক অভাবনীয় আশার পদসঞ্চার তার মনের মধ্যে অনুভূত হ'লো।

আগেই বলেছি, আমার পিছনের সারিতে ঠিক আমার পিছনের আসনেই যবদ্বীপের রাজ্যপাল ব'সেছিলেন। এতক্ষণ এত তন্ময় হ'য়েছিলাম যে, তার উপস্থিতির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সহসা তিনি মুখ বাড়িয়ে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এ'সে ইংরেজিতে বল্লেন, এই যে হনুমানটি দেখ্‌ছেন, এ'টি কেবল মাত্র হনুমানের নৃত্যে যোগজাকার্তার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নন, বরং সারা যবদ্বীপ এবং বালীদ্বীপের মধ্যেই হনুমান নৃত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কয়েক বছর যাবৎ ইনি হনুমানের নৃত্যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার পেয়ে আস্‌ছেন।

আমাকে এই কথাটি জানাবার জন্য আমি রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানিয়ে মনে মনে বল্লাম, হনুমানের নৃত্যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার? এ' আবার কি জিনিস? আমাদের দেশে ত' এমন কোনো পুরস্কারের কথা কোনো দিন শুন্‌তে পাইনি! অথচ আমাদের দেশই ত হনুমানের দেশ।

যাই হোক, নিবিষ্ট ভাবে তার নৃত্য লক্ষ্য করতে লাগ্‌লাম। অনুভব করলাম, প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের জনতা বিশাল উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের চার দিক ঘিরে স্তব্ধ হ'য়ে হনুমানের সেই নৃত্য দেখে চলেছে।

হনুমানের নৃত্যের জটিলতা কোন্‌খানে তা' বুঝ্‌তে পারলাম। রামায়ণের পরিকল্পনায় হনুমান পুরোপুরি বানর নয়, তার মনের ভিতর যে রামভক্তি আছে, তা' কোনো বানরের গুণ হ'তে পারে না, অথচ তা'কে হনুমান ব'লে যখন পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে, তখন সে পুরোপুরি মানুষও নয়। নর এবং বানরের মিশ্র পরিকল্পনাতেই হনুমানের সৃষ্টি। হনুমানের

নৃত্যের ভিতর দিয়ে সেই ভাবটি ফুটে উঠ্‌ছে। তার সতর্কতাবোধ, সে যে সুরক্ষিত রাজ-উদ্যানে একজন অন্যায় প্রবেশকারী, তারপর সে যে এক-জনকে অনুসন্ধান ক'রে ফিরুছে এবং যাকে অনুসন্ধান করেছে, তাঁকে সে কোনোদিন চোখের সাম্‌নে দেখেনি, কেবলমাত্র তার বর্ণনা শুনেই তাকে সন্ধান ক'রে বার করবার দায়িত্ব নিয়ে এ'সেছে—এই ভাবগুলো সবই একে একে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ এই ভাবগুলো মনুষ্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক ভাবে প্রকাশ পায়, বানর চরিত্রের মধ্য দিয়ে আর এক ভাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু একই চরিত্রের মধ্য দিয়ে যখন নর ও বানরের বিভিন্ন ধর্মী দু'টি ভাব একসঙ্গে প্রকাশ করুতে হয়, তখন তা' কতদূর জটিল হ'য়ে উঠে, তা' সহজেই বুঝ্‌তে পারা যায়। সেইজন্যই আমার মনে হ'লো, হনুমানের নৃত্য রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় জটিল এবং তা'তে যে শিল্পী কৃতিত্ব লাভ করে, তাকে যথার্থই উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী ব'লে মনে করুতে হয়। সুতরাং এই শিল্পীই ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ-নৃত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, এ' বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হনুমান অশোক বনের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করুতে করুতে সাম্‌নের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল. দূর থেকে সীতাকে দেখ্‌তে পেল, দেখে তাকেই সীতা ব'লে সন্দেহ হ'লো বটে, কিন্তু এ' বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পারল না। প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে সে সীতার সন্ধান ক'রেছে, তা'কে সে সেখানে পায় নি, এক রকম হতাশ হ'য়েই সে এই সুরক্ষিত রাজোদ্যানের মধ্যে কৌশলে প্রবেশ ক'রেছে, এখানে সীতা এইভাবে বন্দিনী জীবন যাপন করুছে, তা' হয়ত সে অনুমানও করতে পারে নি, তাই তার সন্দেহ দূর হ'লো না। সে ধীরে ধীরে অদৃশ্যভাবে সীতার দিকে অগ্রসর হ'য়ে যাচ্ছে। সেখানে সীতা ব্যতীত আর কেউ নেই, রাবণ এসে ত্রিজটাকে যে বিদায় ক'রে দিয়েছিলেন, সে আর ফিরে আসে নি, সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাতের তাই উপযুক্ত সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু হনুমানের সন্দেহ হ'লো, এই কি সীতা? হনুমানের জটিল নৃত্যের ভিতর এই বিষয়ক একটি সন্দেহের ভাব যুক্ত হ'য়ে নৃত্যটিকে জটিলতর ক'রে তুলল।

হনুমান সীতার অলক্ষিতে থেকে নৃত্য করুছে, তার সন্দেহ- নিরসন না হওয়া পর্যন্ত সে সীতার সাম্‌নে আত্মপ্রকাশ করুতে পারে না, এই বিষয়ে

তার সতর্কতার অবধি নেই, সন্দেহ আর সতর্কতা দুয়ে মিলিয়ে নৃত্যটি অপরূপ হ'য়ে উঠ্‌ল। হনুমানের নৃত্যও যে এমন অপরূপ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, তা আগে কখনো কল্পনাও কর্‌তে পারি নি। নৃত্যের একটি ভাষা আছে, এই ভাষা যে বুঝে সেই বুঝে। যারা নৃত্যের ভাষা বুঝে না, তারাও নৃত্যের সৌন্দর্যটুকু বুঝে, অন্ততঃ তা' না বুঝ্‌লেও তা মনকে অমনি মুগ্ধ করে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় জীবনে রামায়ণ এবং তার নৃত্য অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে আছে, তাই সে দেশের লোক তার নৃত্যের ভাষা বুঝে। আমরা সে ভাষা বুঝি না, কারণ, আমাদের দেশে রামায়ণ থাক্‌লেও তার নৃত্য নেই, সেইজন্য তার কোনো ভাষাও গড়ে ওঠেনি। ইন্দোনেশিয়ায় যেভাবে নৃত্যের ভাষা গ'ড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই; কিন্তু তা সত্ত্বে যে বিশাল জনতা রঙ্গমঞ্চের চারপাশ ঘিরে আজ এখানেও হনুমানের নৃত্য স্তব্ধ হ'য়ে দেখ্‌ছে, তা' এ ভাষা জানে। আমার মত বিদেশীরা তার ভাষা না বুঝ্‌লেও কেবলমাত্র তার সৌন্দর্যটুকু নিয়েই মুগ্ধ হ'য়ে তা' দেখ্‌ছে। বুঝিবা ক'দিন দেখে দেখে তার ভাষা খানিকটা আমরাও বুঝে গেছি। নতুবা কেবলমাত্র বাইরের সৌন্দর্য থেকে এ' তন্ময়তা কখনো আস্‌তে পারে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কি ভাবে জানি হনুমানের মধ্য থেকে সকল সংশয় দূর হ'য়ে গিয়ে মনের মধ্যে বিশ্বাস হ'লো, ইনিই সীতা; এই বিশ্বাসের ভাব প্রকাশ ক'রেও কিছুক্ষণ হনুমানের নৃত্য চল্‌ল, তারপর সহসা হনুমান সীতার সাম্‌নে এসে উপস্থিত হ'য়ে তার হাতে শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীটি দিতে গেল।

সীতা ভাবলেন, এও রাক্ষসের এক মায়া। মায়া-মৃগ থেকে আরম্ভ ক'রে রাক্ষসের মধ্যে কত মায়া দেখে এসেছেন, এ'বার হয়ত তেমনি আর এক মায়া রচনা ক'রে রাক্ষস তাঁকে ছলনা কর্‌তে চাইছে; সীতার নৃত্যের মধ্য দিয়ে সে ভাব স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। সীতা অঙ্গুরীটি নিতে চাইলেন না।

অল্পক্ষণের মধ্যে হনুমানের মুখের দিকে তাকিয়ে সীতার মন থেকে সে ভাব দূর হয়ে গেল। হনুমানের নৃত্যের ভিতর দিয়েই যেন রামভক্তির ভাব ফুটে উঠ্‌ল, সীতা তা' বুঝ্‌তে আর ভুল করতে পারলেন না, তিনি এ'বার হনুমানের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে যেন আশীর্বাদ করবার ভঙ্গি করলেন, হনুমান তাঁকে একটী অপূর্ব ভঙ্গিতে প্রণাম করে সীতার হাতে

শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীটি দিবার অভিনয় করল। তারপর সীতার সংযত নৃত্যের ভিতর দিয়ে অকস্মাৎ এক নূতন ভাব ফুটে উঠ্‌ল, তার মধ্য দিয়ে বিশ্বাস এবং ভক্তির ভাব আর কোনো দিক থেকেই গোপন রইল না। গভীর বিষাদের মধ্যেও সীতার মনের মধ্যে যেন একটু ক্ষীণ আশার আলো ফুটে উঠ্‌ল।

সীতার নৃত্য সর্বদাই খুব সংযত, একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই প্রায় তা'কেবলমাত্র তার দেহ ভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, পাদক্ষেপ ঈষৎ মাত্র, দেহের কেবলমাত্র নানা প্রকার ভঙ্গির মধ্য দিয়েই তাঁর মনে এইদ্রুত পরিবর্তনশীল ভাবগুলো প্রকাশ পাচ্ছে। এমন কি, হাতে কোনো মুদ্রা বল্‌তে যা বুঝায় তাও নেই। সুবৃহৎ জনতার সামনে নৃত্যাভিনয় কর্‌তে গেলে মুখমণ্ডলের উপর দিয়ে ভাব প্রকাশ করলেও তা' কার্যকর হতে পারে না, তাই তা' এখানে পরিত্যক্ত হয়েছে।

যাই হোক, সীতার বিষণ্ণ অবস্থার উপরই তার মনে যে ঈষৎ আশার আলো জ্বলে উঠল, তা' সীতার নৃত্যাভিনয়ে সুন্দর প্রকাশ পেল, আর হনুমানের নৃত্যে তার কর্মে সাফল্যের আনন্দ যেন বিচ্ছুরিত হতে লাগ্‌ল, শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে যে গুরু দায়িত্ব-ভার সে নিয়ে এসেছিল, তা' পালন করবার চরিতার্থতায়—সীতার সন্ধান পাবার আনন্দে—তার অন্তর পরিপূর্ণ। তারই ভাব তার নৃত্যে প্রকাশ পেতে লাগ্‌ল। সে নৃত্যে উদ্দামতা ছিল, কিন্তু অসংযম ছিল না!

এই ভাবে অনেকক্ষণ নৃত্য চল্‌বার পর সীতার কাছ থেকে একটি অভিজ্ঞান নিয়ে হনুমান অশোকবন থেকে ধীরে ধীরে নিক্রান্ত হয়ে গেল। সর্বক্ষণ ধরে বিশাল বনভূমি মৃদু আন্দোলিত হচ্ছিল, গ্যামেলিন বাদ্যের সঙ্গে মৃদুতার একটী সুনিবিড় সম্পর্ক আছে, সেই জন্য মৃদু তালে নৃত্য তা'র ভিতর দিয়ে যত সার্থক রূপায়িত হয়, উদ্দাম নৃত্য তত সার্থক হতে পারে না। কারণ, গ্যামেলিনের বাদ্য কখনো খুব উচ্চ গ্রামে উঠ্‌তে পারে না।

হনুমান নিক্রান্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বনভূমির উপর ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে মাত্র একটী দৃশ্যের নৃত্যের পর যোগজাকার্তার নৃত্য সে দিন সম্পূর্ণ হলো।

থাইল্যাণ্ড

আজ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সন। আজ সন্ধ্যায় পাণ্ডানের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে আবার দুটো দেশের রামায়ণ নৃত্যের অনুষ্ঠান হবে—থাইল্যাণ্ড ও সুরকর্তা। সুরকর্তা ইন্দোনেশিয়ারই একটী অংশ। ইন্দোনেশিযার মধ্যে রামায়ণ-নৃত্যের যে দুটী প্রাচীন পদ্ধতি (classical) প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে একটী যোগজাকার্তা এবং অন্যটী সুরকর্তা।

যথা সময়ে পাণ্ডানে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথমেই থাইল্যাণ্ডের নৃত্যানুষ্ঠান। থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীরা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও রামায়ণের কাহিনী সে দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। রামায়ণকে সে দেশে রামকিয়েন বলা হয়। যদিও বৌদ্ধ কথাসাহিত্য দশরথ জাতকে রামচন্দ্রের একটী স্বতন্ত্র কাহিনী আছে, তথাপি থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ অধিবাসী বৌদ্ধ কাহিনীটির কোনো অনুষ্ঠান করে না, কিংবা তার কোনো প্রভাব তাদের উপর নেই। বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনাই নানা ভাবে তারা অনুষ্ঠান ক'রে থাকে।

থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন পদ্ধতির একটি নৃত্যের নাম খন্। এই নৃত্যের কেবলমাত্র রামায়ণের কাহিনীই অবলম্বন। এই নৃত্যের বিশেষত্ব এই যে তা' মুখোস নৃত্য। তবে সব চরিত্রই যে তা'তে মুখোস পরে তাই নয়, রাম লক্ষ্মণ সীতা বিশ্বামিত্র এই শ্রেণীর চরিত্রগুলো মুখোস পরে না, কেবল মাত্র রাক্ষস ও বানর এবং ঐ জাতীয় চরিত্রগুলোই মুখোস পরে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর আগে থাইল্যাণ্ডে এই নৃত্যে রামায়ণের কাহিনী গৃহীত হয় নি, কিন্তু তা' সত্য নয়, থাইল্যাণ্ডে রামায়ণের প্রভাব বহুদিন পূর্বেই বিস্তারলাভ ক'রেছিল। সুতরাং কোনো না কোনো ভাবে রামায়ণের কাহিনী তার মধ্যে অনেক আগেই প্রবেশ ক'রে থাকবে। ছায়ানাটক থেকে থাইল্যাণ্ডে রামকিয়েন বা রামায়ণ-নৃত্যের উদ্ভব হ'য়েছে, ছায়ানাটকের বিষয়-বস্তু বহু প্রাচীনকাল থেকেই রামায়ণ। সুতরাং খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে ছায়ানাটক থেকে রামায়ণ-নৃত্য-নাট্যের উদ্ভব হ'য়েছে ব'লে মনে করা যায়। ছায়ানাটকের ছায়াচরিত্রগুলোই তা'তে নর-নারীর রূপ গ্রহণ ক'রে তাকে নৃত্যনাট্যের আকার দান ক'রেছে। থাইল্যাণ্ডের খন্ নৃত্যের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার উয়েঅঙ্ উয়ঙ্

(প্রাচীন পদ্ধতির রামায়ণ নৃত্য) নৃত্যের সেদিক থেকে অনেকখানি ঐক্য আছে।

থাইল্যাণ্ডের আরো কয়েকটি নৃত্যপদ্ধতির মধ্যে রামায়ণের কাহিনী গৃহীত হ'য়েছে, তাদের মধ্যে একটি নৃত্যের নাম চুইচাই নৃত্য। তা' এক মূক নৃত্যনাট্যাভিনয়। কোনো বিশেষ ভাব, যেমন আনন্দ, উদ্দীপনা এবং অহঙ্কার এ'সব নিয়ে এই নৃত্য হ'য়ে থাকে, রূপান্তরের আনন্দও এই নৃত্যে প্রকাশ পায়—রাবণ এবং ইন্দ্রজিত কোনো কোনো নূতন রূপ ধারণ করবার পর আনন্দে এই নৃত্য করেন। রবীন্দ্রনাথের কুরূপা চিত্রাঙ্গদা সুরূপ লাভ ক'রে এই শ্রেণীর নৃত্য করেছিলেন। কালক্রমে এই নৃত্যের আঙ্গিক রামকিয়েন বা রামায়ণ নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। বীর্যাই নামক এক প্রকার যুদ্ধনৃত্যও কালক্রমে রামায়ণ-নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। থাইল্যাণ্ডে 'চক্‌নক' নামে একটি উৎসব আছে, তা'তে হিন্দু পুরাণের সমুদ্র-মন্থন বিষয় নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে। তা'ও কালক্রমে রামায়ণ-নৃত্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

আজকের থাইল্যাণ্ডের নৃত্যনাট্যের বিষয় কাক-দৈত্যের নিধন। তার পরিচয় প্রসঙ্গে অনুষ্ঠান লিপিতে উল্লিখিত ছিল, an episode of the Thai version of the Ramayana অর্থাৎ থাইল্যাণ্ডের রামায়ণের একটী কাহিনী।

দৃশ্যটি আরম্ভ হবার আগেই একটী ক্ষুদ্র নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে একটি প্রস্তাবনা (prologue) উপস্থিত করা হলো। প্রস্তাবনাটির বিষয়-বস্তুর ভিত্তিও ভারতীয়, তার সঙ্গে থাই-দেশীয় কিছু উপকরণ মিশ্রিত হয়েছে। কাহিনীটি এই :

রাজপুত্র সুতনু কিন্নরী মনোহরার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তা'কে বিয়ে করেছে। কিন্তু এই বিয়েতে রাজ-পুরোহিত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তিনি মনোহরার মৃত্যুর উপায় সন্ধান করতে লাগ্‌লেন। একবার যখন রাজপুত্র সুতনু সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য রাজধানী থেকে দূরে চলে গেলেন, তখন রাজা এক স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করে পুরোহিত রাজাকে বুঝা'ল যে রাজার মৃত্যু আসন্ন হয়েছে। কিন্তু যদি তিনি তাঁর পুত্রবধূ মনোহরার অগ্নিপরীক্ষা নেন, তবে তিনি নিজে বেঁচে যেতে পারেন। রাজা প্রথমে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন,

কিন্তু পুরোহিতের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত সম্মত হ'লেন। যখন মনোহরার অগ্নিপরীক্ষার সকল অয়োজন সম্পূর্ণ হ'য়েছে, তখন মনোহরা রাজার নিকট একটি প্রার্থনা জানিয়ে বল্‌ল, আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমার যে দু'টি ডানা ও পুচ্ছ রাণীর নিকট রেখে দেওয়া আছে, তা' আমাকে পরতে দিয়ে আমাকে শেষ বারের মত নৃত্য করবার অনুমতি দিন। রাজা তাঁর শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করবার অনুমতি দিলেন। সে ডানা এবং পুচ্ছ প'রে আবার কিন্নরী সাজ্‌ল, তারপর নাচ্‌তে নাচ্‌তে ক্রমে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে গিয়ে উপরের দিকে বিলীন হ'য়ে গেল।

এই দৃশ্যটি নৃত্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা হলো। ঘটনা ও তার ভাবটি নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবার যথার্থ সুযোগ থাক্‌বার ফলে নৃত্যের গতি একটু শিথিল ছিল ব'লে তা' পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করতে পারল না। তবে শেষ দৃশ্যে মনোহরার আকাশে বিলীন হবার নৃত্যটি অপূর্ব হয়েছিল।

তারপরই দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত হ'য়ে আজকের থাইদেশীয় নৃত্যের মূল কাহিনীটি আরম্ভ হ'ল। যদিও সেখানে দৃশ্যপট কিংবা মঞ্চোপকরণ কিছুই ছিল না, তথাপি নৃত্যের এক একটি দৃশ্য শেষ হ'লেই কিছুক্ষণ বিরতির পর পরবর্তী দৃশ্যের ঘটনা আরম্ভ হ'তো, তা'তে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নৃত্যের প্রবাহ অনুভব করবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'য়েছিল। যাই হোক, দৃশ্যগুলো এইভাবে অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল—

প্রথম দৃশ্য—লঙ্কার রাজা তোষকণ্ঠ (রাবণ)-এর রাজসভা। তোষকণ্ঠ রাক্ষসী কাকনাসুনের সঙ্গে পরামর্শে রত। দানব-রাজ মুনি-ঋষিদের তপস্যা-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চান, কারণ, তাঁর বিশ্বাস তপস্যার ফলে একদিন মুনি-ঋষিরা বিশ্বজয়ী হয়ে তা'কেও পরাজিত কর্‌তে পারে। তোষকণ্ঠ কাকনাশুনকে তার কাক-দৈত্যদের নিয়ে মুনিঋষির আশ্রম ধ্বংস করবার কথা বলেন। কাকনাসুন এক বিশাল কাক-দানবীতে রূপান্তরিত হয় এবং সে তার কাক-দৈত্যদেরে নিয়ে মুনিঋষির আশ্রম আক্রমণ কর্‌তে যাত্রা করে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—যোগাসনে উপবিষ্ট শত শত মুনিঋষি। কাক দৈত্যদের আগমনে আশ্রমের শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হ'লো। কাক-দৈত্যেরা তাদের

ঠোকরাতে গেল, মুনি-ঋষিরা যোগাসন ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য—অযোধ্যার রাজসভা। তা'তে রাজা থশরথ (দশরথ) তাঁর তিন রাণী এবং দুই পুত্র, ক্রা (রাজপুত্র) রাম এবং ক্রা লক (লক্ষ্মণ) উপবিষ্ট। অত্যাচারিত মুনিঋষিরা সেখানে এ'সে তাঁদের উপর অত্যাচারের কথা জানালেন। রাজা স্বয়ং তাদের দমন কর্‌তে যেতে চাইলেন, কিন্তু মুনি-ঋষিদের যিনি মুখপাত্র ছিলেন (বিশ্বামিত্রের নাম নেই) তিনি বল্লেন, আপনার যাবার প্রয়োজন নেই, আপনার দুই পুত্র রাম-লক্ষ্মণকে আমাদের সঙ্গে দিন, তারাই তাদের নিধন কর্‌তে পারবে।

রাজা সম্মত হন এবং রাম-লক্ষ্মণ মুনিঋষিদের সঙ্গে আশ্রমের অভিমুখে যাত্রা কল্লেন।

চতুর্থ দৃশ্য—মুনিঋষিরা আশ্রমে ফিরে এসেছেন। কাক-দৈত্যদের আক্রমণ আরম্ভ হলো। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ এ'বার বীর-বিক্রমে তার প্রতিরোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাদের শরাঘাতে বহু কাক ধরাশায়ী হ'লো। অবশেষে কাকনাসুন রাম-লক্ষ্মণকে এ'সে আক্রমণ কর্‌ল, কিন্তু লক্ষ্মণ তার ডানা কেটে দিলেন, রামচন্দ্রের বাণ তার বক্ষ বিদীর্ণ করে গেল। বিশাল দেহ নিয়ে কাকনাসুন ধরাশায়ী হ'লো। মুনিঋষিরা আনন্দ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

পঞ্চম দৃশ্য—কাকনাসুনের দুই পুত্র স্বাহু এবং মারীজ। তারা এই সংবাদ পেল। তারা মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিবার জন্য কাকদৈত্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সেখানে এ'সে উপস্থিত হলো।

ষষ্ঠ দৃশ্য—চারদিক থেকে আশ্রম আক্রান্ত হলো। অসীম বিক্রমে রাম-লক্ষ্মণ যুদ্ধ কর্‌তে লাগলেন। অবশেষে স্বাহু এবং মীরাজ রাম এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লো। রাম স্বাহুকে বধ করলেন, লক্ষ্মণের বিক্রমে মীরাজ পালিয়ে গেল।

মুনিঋষিরা রাম-লক্ষ্মণকে ঘিরে আনন্দে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এখানেই দৃশ্যটি শেষ হ'লো।

আদ্যোপান্ত যুদ্ধের বৃত্তান্ত থাকা সত্ত্বেও নৃত্যের গতি অত্যন্ত মন্থর ছিল বলে জাঁকজমক পোষাক এবং রাক্ষস চরিত্রের মুখোস দিয়েও দর্শকদের মন ভুলানো সম্ভব হয় নি।

তার পরবর্তী দু'টি নৃত্যানুষ্ঠানের একটিতে রাম এবং তোষকণ্ঠের

যুদ্ধ, আর একটিতে হনুমানের (white monkey) নৃত্যের অনুষ্ঠান করা হ'য়েছিল—একটি দ্বৈত যুদ্ধ নৃত্য, আর একটি একক নৃত্য মাত্র। সেই বিশাল উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের উপর দ্বৈত নৃত্যই হোক কিংবা একক নৃত্যই হোক, কিছুই জমে উঠ্‌তে পারেনি। তবে চরিত্রগুলোর রূপসজ্জার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল, তা' লক্ষ্য করবার মত ছিল। কিন্তু বহুলাংশেই তা' পূর্ববর্ণিত খেমের বা কম্বোডিয়ার রূপসজ্জার অনুরূপ।

যদিও থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীরা বৌদ্ধ, তথাপি রামায়ণের কাহিনী সেখানে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এমন কি, বৌদ্ধ দশরথ জাতকে যে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের একটি কাহিনী আছে, সে দেশ বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত বল্লেই হয়, কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু পণ্ডিত তার সংবাদ রাখেন, কিন্তু সে সংবাদও তারা পুঁথির ভিতর থেকে পেয়েছেন, জনসাধারণের জীবনে তার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পান নি। থাইল্যাণ্ড বহুকাল ধ'রেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব সেখানে সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা' সত্ত্বেও জন-সাধারণের মনে রামায়ণের প্রভাব বহুকাল থেকেই দৃঢ়মূল হ'য়ে আছে, এখন পর্যন্তও তার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে সে দেশে লোক-নাট্য, ছায়ানাটক, নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য এবং এমন কি, আধুনিক নাটক পর্যন্ত লেখা হয়।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন ক'রে সে দেশে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়, তার নাম রামকিয়েন, তাকে রামকীর্তিও বলা হয়। রামকিয়েন বা রামকীর্তি নৃত্যে মুখোসের ব্যবহার হ'য়ে থাকে, সে জন্য তাকে মুখোস-নৃত্য বলা যায়, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেই যে মুখোস-নৃত্যের প্রচলন আছে, তাদের মধ্যে কোনো নৃত্যেই সকল চরিত্রই যে মুখোস ব্যবহার করে, তা' নয়, কেবল মাত্র রাক্ষস এবং বানরই মুখোস ব্যবহার করে, তবে ইন্দোনেশিয়ায় কেবল মাত্র রাবণের বেলা তার ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। অন্যত্র রাবণও মুখোস পরে, তবে কোথাও রাবণের দশমুণ্ড যুক্ত মুখোস নেই, সর্বত্র তার একটিই মুণ্ড দেখা যায়। রামকিয়েনও তাই।

এই মুখোস নৃত্যও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছায়া-নাট্য (ওয়েয়েঙ-কুলিত) থেকেই প্রথম উদ্ভূত হ'য়েছিল ব'লে মনে হয়, কিন্তু তা' সত্ত্বেও

তার পরবর্তী কালেও রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন ক'রে ছায়ানাটক এবং নৃত্যনাট্য দুই-ই রচিত হ'য়ে আসছে; নৃত্যনাট্য ছায়ানাট্যের জনপ্রিয়তা লুপ্ত ক'রে দিতে পারে নি। তার প্রধান কারণ, এই দু'টি ধারা দু'টি বিভিন্ন সমাজ অবলম্বন ক'রে বিকাশ লাভ ক'রে চলেছে, ছায়ানাট্যের ধারা নিতান্ত সাধারণ নিরক্ষরের সমাজ এবং নৃত্যনাট্য অভিজাত সমাজ আশ্রয় করেছে। তাই দুটি ধারাই স্বতন্ত্র ভাবে সে দেশে বেঁচে আছে।

থাইল্যাণ্ডে রামকিয়েন বা রামকীর্তি নৃত্যনাট্যের যখন মঞ্চের উপরও অনুষ্ঠান হয়, তখন তার কোনো মঞ্চসজ্জা থাকে না, কেবল মাত্র একখানি সাদা রঙের পশ্চাৎপটের সাম্‌নে নৃত্যাভিনয় চল্‌তে থাকে, তা' থেকেই অনেকে অনুমান করেছেন যে, ছায়ানাট্যেরই পুতুলগুলোর জায়গায় নর-নারীর চরিত্র স্থাপন ক'রে এ' নৃত্য উদ্ভাবিত হয়েছে, পেছনের সাদা পর্দা থেকেই বুঝ্‌তে পারা যায় যে নৃত্যনাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়েও তার ছায়ানাটকের সংস্কার পুরাপুরি দূর হ'য়ে যায় নি।

থাইল্যাণ্ডের রামায়ণ নৃত্যনাট্যের নাম 'খন্‌', আগে এ'র অনুষ্ঠানে সব চরিত্রই মুখোস পরত, কিন্তু কিছুকাল-যাবৎ কেবল মাত্র রাক্ষস বানর কিংবা দৈত্য দানবের চরিত্র ছাড়া আর কেউ মুখোস পরে না, এমন কি, রাবণ-চরিত্রকেও এখানে মুখোস পরতে হয়, সে কথা আগে বলেছি। কিন্তু যেসব চরিত্র মুখোস পরে না, তারাও মুখচোখের কোনো ভঙ্গি ক'রে ভাব প্রকাশ করে না, অর্থাৎ মুখোসটি এখন তারা পরিত্যাগ করলেও মুখোস পরবার কালে নৃত্যের যে আঙ্গিক তারা গ্রহণ ক'রেছিল, তা' তারা বিসর্জন দিয়ে তার পরিবর্তে নূতন কোনো আঙ্গিক গ্রহণ করে নি। সুতরাং দর্শকদের এখানে মনে কর্‌তে হবে যে নৃত্যকারীর মুখ মুখোস দিয়ে আবৃত।

এই নৃত্যনাট্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তার পটভূমিকায় কখনো সঙ্গীতে কখনো গদ্য কবিতার মত এক রকম ভাষায় কাহিনীটি বর্ণনা করে যাওয়া হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের পটভূমিকায় যে সঙ্গীত পরিবেশন হতে থাকে, তেমনই তার মধ্যে কখনো সঙ্গীত, কখনো গদ্য আবৃত্তি চল্‌তে থাকে, কেবল মাত্র নৃত্যের মধ্য দিয়ে কাহিনীটি প্রকাশ করা হয় না। পাণ্ডানের রঙ্গমঞ্চে যখন এই নৃত্যনাট্য উপস্থিত করা হয়েছিল, তখন তার সঙ্গীত এবং গদ্য আবৃত্তির অংশ পরিত্যাগ করা হ'য়ে-

ছিল। কিন্তু থাইল্যাণ্ডে যখন তার অনুষ্ঠান হয়, তখন পটভূমিকায় সঙ্গীত এবং সংলাপ অংশ পরিত্যক্ত হয় না, কথাকলির মত তা গীত হতে থাকে। তবে কথাকলিতে গদ্য সংলাপের অংশ থাকে না, সেখানে তা' থাকে।

থাইল্যাণ্ডের রামকিয়েন বা রামায়ণ নৃত্যনাট্যের কাহিনীগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তা' এখানে উল্লেখ করা যায়।

সাধারণতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্রই, এমন কি, পশ্চিম বাংলার ছৌনৃত্যেও হরধনু ভঙ্গের প্রতিযোগিতায় রাবণও যোগদান ক'রেছিলেন বলে দেখা যায়। কিন্তু থাইল্যাণ্ডের রামায়ণে রাবণের তা'তে প্রতিযোগিতা করবার বৃত্তান্ত নেই। এখানে কাহিনীটি বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের অনুরূপ।

থাইল্যাণ্ডের রামায়ণ-কাহিনীতে যবদ্বীপীয় রামায়ণ-কাহিনীর কোনো প্রভাব অনুভব করা যায় না। অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলো দেশই মালয়েশিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ কাহিনী দিয়ে কম বেশী প্রভাবিত হ'য়েছে।

ভারতের কথাকলি নৃত্যের মত থাইল্যাণ্ডে নৃত্যের পটভূমিকায় সঙ্গীত এবং সংলাপের ব্যবহার হয়ে থাকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই বিশেষতঃ ইন্দোনেশিয়ায় তা' হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত থাইল্যাণ্ডের রামায়ণ নৃত্যনাট্যে কোনো স্ত্রীচরিত্র অংশ গ্রহণ করত না, পশ্চিম বাংলার ছৌ নৃত্যের মত পুরুষই স্ত্রীচরিত্রের অংশে নৃত্যাভিনয় করত। সম্ভবতঃ তখন পর্যন্ত সব চরিত্রই মুখোস পরত। স্ত্রীশিল্পী গ্রহণ করবার পর থেকেই দেবদেবীর কিংবা নরনারীর চরিত্রে মুখোসের ব্যবহার লুপ্ত হ'য়ে যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত থাইল্যাণ্ডের রামায়ণে মায়াসীতার পরিকল্পনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অনেক বিষয়েই থাইল্যাণ্ডের রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের কিংবা পূর্ব বাংলায় প্রচলিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাহিনীর ঐক্য দেখা যায়। মনে হয়, পূর্ব উপকূল-পথে বংলাদেশের সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের যোগাযোগ সহজ ছিল বলে, এ'বিষয়ে বাংলা দেশের প্রভাব তার উপর সহজেই বিস্তার লাভ করেছিল। ব্রহ্মদেশের রামকাহিনীতে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়, সে কথা আগে বলেছি।

থাইল্যাণ্ডের রামায়ণ-কাহিনীতে দেখা যায়, সীতা রাবণের সম্পর্কে কন্যা। পূর্ব বাংলায়ও প্রায় অনুরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে, কাহিনীটি এই—সীতা তাঁর পূর্ব জন্মে রামকে পতিরূপে পাবার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় এক মন্দিরের মধ্যে ব'সে কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তখন একদিন রাবণ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে স্বর্গ থেকে লঙ্কায় ফিরে আসছিলেন, পথে সহসা পর্বত শিখরে মন্দিরের মধ্যে তপস্যারত পরমা সুন্দরী সীতাকে লক্ষ্য করলেন, লক্ষ্য ক'রেই তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেলেন। সীতা তাঁর হাত থেকে নিজের নারীধর্ম রক্ষা করবার আর কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে মুহূর্তে দেহত্যাগ করলেন এবং নিজের সূক্ষ্ম আত্মাটিকে সম্মুখের তাম্রকুণ্ডে যে জল ছিল তার মধ্যে স্থাপন করলেন। রাবণ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গিয়ে তাম্রকুণ্ডটিকেই তুলে নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন। তারপর সেটিকে তার শয়ন-গৃহে গোপনে রেখে প্রতিদিন তার উপর লক্ষ্য রাখ্‌তে লাগ্‌লেন। কারণ, তার বিশ্বাস হ'লো, একদিন তার ভিতর থেকে সশরীরে সীতার পুনরাবির্ভাব হ'বে। রাজমহিষী মন্দোদরী বিষয়টি বিন্দুবিসর্গ জান্‌তে পার্‌লেন না, কিন্তু তিনি একদিন গোপন-স্থানে তাম্রকুণ্ডটি দেখ্‌তে পেলেন, রাবণ যে তার উপর লক্ষ্য রেখেছেন, তাও জান্‌তে পেলেন। এ'বিষয়ে তার রমণী-সুলভ কৌতূহল সহজেই জাগ্রত হ'লো।

রাবণের আবার যুদ্ধে যাবার প্রয়োজন হ'লো, তিনি তাম্রকুণ্ডটিকে সেখানেই সেই অবস্থায় রেখে যুদ্ধে চলে গেলেন। স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে মন্দোদরীর বিশ্বাস ছিলনা, তাই রাবণ কি জিনিসটি গোপনে এত যত্নে রক্ষা করছেন, তা' জানবার জন্য তার কৌতূহল অদম্য হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি তাম্রকুণ্ডের আবরণটি খুলে তার মধ্যে কেবল মাত্র জল ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না; বিশেষ কিছু বিবেচনা না ক'রে সেই জল পান ক'রে ফেল্‌লেন। ফলে তিনি গর্ভবতী হ'লেন। কিন্তু রাবণ তখন গৃহে নাই, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সন্তান ধারণ সকলের সন্দেহের কারণ হ'য়ে উঠ্‌বে ভেবে তিনি শঙ্কিত হ'লেন, তাঁর কুলগুরুকে আহ্বান ক'রে সকল কথা খুলে বলে তাঁকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। কুলগুরু শুনেছিলেন, মিথিলার রাজা জনক এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছেন, পরের দিন তিনি যজ্ঞভূমি চাষ করবেন। সেই জন্য সেই রাত্রেই তিনি

মন্দোদরীকে নিয়ে মিথিলায় গিয়ে পৌঁছুলেন। মন্দোদরী যজ্ঞভূমিতে একটি ডিম্ব প্রসব ক'রে সেই রাত্রেই কুলগুরুর সঙ্গে লঙ্কায় ফিরে এ'লেন। পরের দিন জনক রাজা যখন যজ্ঞভূমি কর্ষণ কর্‌তে গেছেন, তখন লাঙ্গলের ফলার আঘাতে ডিম্বটি ফেটে গিয়ে তা' থেকে এক পরমা সুন্দরী কন্যা বেরিয়ে এ'ল। জনক রাজা তাকেই কন্যারূপে গ্রহণ করলেন।

কাহিনীটির সামান্য কিছু পাঠান্তরও আছে, যেমন কোনো কোনো সময় শুন্‌তে পাওয়া যায় যে, গোপনে শয়ন কক্ষে মন্দোদরী কন্যা সন্তান প্রসব করেছিলেন, তারপর তাকে সোনার পেটিকায় ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পেটিকা ভাস্‌তে ভাস্‌তে জনকের রাজ্যে গিয়ে ঠেক্‌ল, জনক তাকে কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে এ'লেন।

যাই হোক, প্রায় অনুরূপই একটি কাহিনী থাইল্যাণ্ডে প্রচলিত আছে। নদীতে ভাসিয়ে দিবার কাহিনীটিই থাইল্যাণ্ডে শুন্‌তে পাওয়া যায়।

রামকিয়েন বা থাইল্যাণ্ডের রামায়ণের সুদীর্ঘ কাহিনী থেকে কয়েকটি ঘটনা বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে নৃত্যনাট্যে রূপদান করা হ'য়েছিল। ঘটনাগুলো প্রধানতঃ এই—কাক-দৈত্যের পরাজয়, ভাসান, মহীরাবণ, সর্পফাঁস (Snakenoose), ব্রহ্মাস্ত্র, ভক্ত হনুমান, সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

থাইল্যাণ্ডের রামায়ণ-নৃত্যনাট্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা'তে কোনো বিষয়ই বিয়োগান্তক হ'তে পারবে না, সব কাহিনীই মিলনান্তক হবে। রাম-লক্ষ্মণ কিংবা অন্য কোনো চরিত্রও যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত হ'য়ে পড়ে যায়, তথাপি সে সুস্থ হ'য়ে উঠে পুনরায় যুদ্ধে যোগদান না করা পর্যন্ত সেই কাহিনী শেষ হ'তে পারবে না, এমন কি, দর্শকগণও আসর ত্যাগ ক'রে যেতে পারবে না। এই বিষয়ে বাংলা দেশের সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের বিশেষ ঐক্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এমন কি, বাংলা দেশে দৈত্য দানব কিংবা অন্যায়কারী চরিত্রের মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে কাহিনী শেষ হ'তে পারে, কিন্তু সেখানে তাও পারে না, সেইজন্য থাইল্যাণ্ডের নৃত্য-নাট্যে, এমন কি, রাবণ (তোষকণ্ঠ) বধের দৃশ্যটিও কদাচ দেখানো হয় না। যদি বিয়োগান্তক দৃশ্য দিয়ে কদাচ কাহিনী শেষ করবার প্রয়োজন হয়, তবে রাজার সম্মতি নেবার প্রয়োজন হয়, জনসাধারণের তা' করবার কোনো অধিকার নেই। রামায়ণ-কাহিনীর নৃত্যানুষ্ঠান সম্পর্কে এই রীতি কদাচ লঙ্ঘন করা হয় না।

রামায়ণ-কাহিনী নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে উপস্থাপনা করবার অনেক-গুলো প্রণালীই পূর্বে প্রচলিত ছিল, বর্তমানে তাদের মধ্যে মাত্র এই কয়টি রক্ষা পেয়েছে—

১। থাই ভাষায় তার একটি রীতির নাম 'খন্-খান্-প্লেন'। তা' মুক্তা-ঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তা' বীররসাত্মক যুদ্ধনৃত্য, পশ্চিমবঙ্গের ছৌনৃত্য যেমন যুদ্ধ নৃত্য থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে, এই প্রণালীর থাই রামা-য়ণ নৃত্যও যুদ্ধ নৃত্যেরই ধারা অনুসরণ ক'রে বিকাশ লাভ করেছে। তার বাদ্যভাণ্ডও পশ্চিমবঙ্গের ছৌনৃত্যের বাদ্যভাণ্ডের মতই যুদ্ধ-বাদ্যেরই ধারা অনুসারী। পশ্চিমবঙ্গের ছৌনৃত্যও এই শ্রেণীরই রামায়ণ-বিষয়ক মুখোস নৃত্য। সুতরাং তার সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের এই নৃত্যেরই সব চাইতে বেশি মিল দেখা যায়।

২। থাইল্যাণ্ডের আর এক শ্রেণীর রামায়ণ নৃত্যনাট্যের নাম 'খন-রূণ-নক'। এই নৃত্য মঞ্চের উপর অনুষ্ঠিত হয়। তার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নৃত্যমঞ্চের পিছনের দিকের পর্দার সাম্‌নে একটি দীর্ঘ দণ্ড (pole) রাখা হয়, পর্দাটির মধ্যে অরণ্য এবং পর্বতের একটি দৃশ্য আঁকা থাকে। নৃত্যের পটভূমিকায় কোনো সঙ্গীত হয় না, তবে আবৃত্তি এবং গদ্য সংলাপ হ'য়ে থাকে।

এই নৃত্যেরই একটি ধারার নাম 'খন্-নন্-রন্'। এই অনুষ্ঠানটি দু'দিনে সম্পূর্ণ হয়। প্রথম দিন প্রস্তাবনা অংশগুলো শেষ ক'রে নৃত্যশিল্পী রাত্রে সেই মঞ্চেই রাত্রি কাটায়, তার পরদিন সেই বংশ দণ্ডটি নিয়ে নৃত্য করবার পর নৃত্যের মধ্যে একটি কাহিনীর রূপায়ণ হ'য়ে থাকে। কাহিনীটি এই —রাম-লক্ষণ যখন সীতা (সীদা) র সন্ধানে বনের মধ্যে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন পিরাব নামে এক রাক্ষস তাদেরে গিলে খাবার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণের হাতে নিহত হয়। সংস্কৃত রামায়ণে এই রাক্ষসের নাম বিরাধ।

৩। থাইল্যাণ্ডের আর এক পদ্ধতির নৃত্যনাট্যের নাম 'খন্-না-চো' অর্থাৎ পর্দার সাম্‌নে মুখোস নৃত্য। পর্দার সাম্‌নে নৃত্য থেকেই বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে যে ছায়া-নাটকের সংস্কারটি তার মধ্যে এখনো যুক্ত হ'য়ে আছে। সেই জন্য দেখা যায় এই নৃত্য বর্তমানে ছায়া-পুতুলের পরিবর্তে নরনারীর নৃত্য হলেও ছায়া-নাটকের আঙ্গিক তা'তে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

৪। থাইল্যাণ্ডের আর এক শ্রেণীর রামায়ণ-নৃত্যের নাম 'খন্-রো-নূনাই', তার অর্থ দরবারী মুখোস নাটক (court mask play)। বলাই বাহুল্য, তা' অভিজাত শ্রেণীর নৃত্য : রাজ-সভার জৌলুসের স্পর্শে তার মধ্যে উজ্জ্বল্য ও দীপ্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তথাপি তা একেবারে প্রাণশূন্য নয়। সমস্ত দরবারী নৃত্যেরই যা বিশেষত্ব, তা' এ'র মধ্য দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে। এর পটভূমিকায় উচ্চাঙ্গ রাগ-রাগিণী যুক্ত সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং সংলাপ সবেরই ব্যবহার আছে, তার মঞ্চোপকরণ এবং সাজসজ্জার বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য স্বভাবতই আকর্ষণীয় হ'য়ে থাকে।

উপরে চার শ্রেণীর যে নৃত্য পদ্ধতির উল্লেখ করা গেল, তাদের অনুষ্ঠান কখনো দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত নয়, কেবল মাত্র একটি দৃশ্যের মধ্য দিয়েই সমগ্র বিষয়টি প্রকাশ করা হয়, তাকে একাঙ্ক নৃত্যনাট্যানুষ্ঠানও বলা যায়।

সাম্প্রতিক কালে ১৯৪৬ সন থেকে থাইল্যাণ্ডের সরকারী প্রচেষ্টায় রামায়ণের বিষয়-বস্তু নিয়ে অঙ্কে অঙ্কে এবং দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত ক'রে আধুনিক নৃত্যনাট্যও রচিত এবং অভিনীত হ'য়ে চলেছে, কিন্তু তাও মুখোস নৃত্য। তার অন্যান্য ক্ষেত্রে আধুনিকতা প্রবেশ করলেও মুখোস ব্যবহারের রীতির মধ্য দিয়ে যে প্রাচীন রীতি রক্ষার ধারাটি অগ্রসর হ'য়ে এ'সেছে, তা' পরিত্যক্ত হয় নি। এ' বিষয়ে থাইল্যাণ্ড যে রকম রক্ষণশীল, রামায়ণের উদ্ভব ভূমি ভারতবর্ষও তা' নয়, কারণ, ভারতবর্ষে কোনো আধুনিক নাটকে রামায়ণের বিষয় গৃহীত হ'লেও তা'তে কোনো প্রাচীন প্রয়োগ-রীতি ব্যবহার করা হয় না।

রামায়ণ নৃত্যে মুখোসের ব্যবহার সম্পর্কে থাইল্যাণ্ড অত্যন্ত রক্ষণশীল। যদিও রাম-লক্ষণ-সীতা কিংবা উচ্চশ্রেণীর চরিত্র বর্তমানে আর মুখোস পরে না এ'কথা সত্য, তথাপি রাক্ষস-বানর দৈত্য-দানবের মুখোসগুলো প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্মিত হ'য়ে থাকে। প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখোসের এক একটি বিশিষ্ট রঙ আছে,--যেমন রাবণ এবং তার সম্পর্কিত সকল রাক্ষসের মুখোসের রঙই সবুজ, প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদের মাথার মুকুট পরিকল্পিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু বানরের মুখোসে রঙের বিভিন্নতা আছে, যেমন সুগ্রীবের মুখোসের রঙ লাল, হনুমানের মুখোসের রঙ্ সাদা এবং জাম্বুবানের মুখোসের রঙ্ নীল। মুখোসের

রঙ্ দেখে অনেক সময় চরিত্রগুলোকে চিন্‌তে পারা যায়। ভারতের কথাকলি নৃত্যে মুখোসের ব্যবহার না থাকলেও চরিত্রের মুখগুলো যে সব বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করা হয়, তা সর্বাংশেই থাইল্যাণ্ডের অনুরূপ না হ'লেও তা'র উদ্দেশ্য অভিন্ন। পশ্চিম বঙ্গের ছৌনৃত্যের মুখোসেরও চরিত্রের পরিচয়-অনুযায়ী রঙ হ'য়ে থাকে। তবে সেখানে দেবদেবী চরিত্রও মুখোস পরে ব'লে মুখোসের রঙে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, অন্যত্র তা' দেখা যায় না।

মুখোসের রঙ অনুযায়ী সাধারণতঃ পোষাকেরও রঙ হ'য়ে থাকে, রাক্ষস-দৈত্য দানবের পোষাকে গাঢ় রঙের ব্যবহার হয়, অভিজাত চরিত্রের পোষাকে সোনা ও রূপোর কাজ করা থাকে, স্ত্রীচরিত্রের পোষাকের মধ্যে তার দেহ-লাবণ্যের যা পরিপোষক, সেই শ্রেণীর পোষাকের ব্যবহার হ'য়ে থাকে, সাধারণতঃ মূল্যবান রেশমের পোষাকই স্ত্রীচরিত্রে ব্যবহৃত হয়।

থাই রামায়ণ নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানে মঞ্চোপকরণেরও ব্যবহার হয়। এই বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের ছৌনৃত্যের সঙ্গে তার একটি প্রধান ব্যতিক্রম দেখা যায়। থাইল্যাণ্ডের নৃত্যে উচ্চ বেদী, যুদ্ধরথ, তীরধনু, লাঠি, ত্রিশূল, রাজছত্র এ'গুলোর ব্যবহার হ'য়ে থাকে। অবশ্য মুক্তাঙ্গন অভিনয়ে এ'দের প্রয়োগ সীমিত মাত্র।

যাই হোক, সেদিনকার থাইল্যাণ্ডের রামায়ণ-নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখে এ'কথা মনে হ'লো যে আঙ্গিক এবং রীতির উপর বেশি জোর দিবার জন্য তা' একটু যেন প্রাণহীন হ'য়ে পড়েছে, তার গতিও একটু মন্থর।

সুরকর্তা, মধ্য যবদ্বীপ

সুরকর্তার রামায়ণ নৃত্য পদ্ধতি যোগজাকার্তার পদ্ধতির মতই মধ্য যবদ্বীপের প্রাচীন (classical) নৃত্য পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বিকাশ লাভ করেছে। তাকে যবদ্বীপের রামায়ণ নৃত্যের প্রাচীনতম পদ্ধতি বা প্রাম্বানাম্ পদ্ধতি বলেও উল্লেখ করা হয়। কারণ, মধ্য যবদ্বীপের প্রাম্বানামের শিব-মন্দির গাত্রে যে রামায়ণ-কাহিনী উৎকীর্ণ করা আছে, তা' অবলম্বন ক'রে সেই মন্দিরের চত্বরে বহুকাল থেকে যে রামায়ণ-নৃত্যের ধারা চলে আসছে, সুরকর্তার নৃত্য পদ্ধতি তা'কে সুদৃঢ় ভাবে অবলম্বন ক'রেই বিকাশ

লাভ করেছে, তা'কে শিথিল ভাবে অবলম্বন করে নি। সেই জন্য যবদ্বীপীয় রামায়ণনৃত্য পদ্ধতি বলতে যোগজাকার্তার পদ্ধতির মত সুরকর্তার পদ্ধতিকেও বুঝায়। এমন কি, সুরকর্তার পদ্ধতি যোগজাকার্তা পদ্ধতির চাইতেও রক্ষণশীল। সেই জন্য তা' প্রাচীনতম পদ্ধতির ঐতিহ্যবাহী। তাই তাকে old style Prambanam এবং Ancient Prambanam style বলা হয়।

এই পদ্ধতির বিশেষত্বের মধ্যে প্রথমতঃ তা'তে নৃত্যে মাথা এবং হাতের ব্যবহার আছে। তবে হাতের ব্যবহারের কতকগুলো সীমা নির্দিষ্ট আছে, ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রার মত সব কিছুই যে হাত দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে, এখানে তা' নয়। তথাপি মুখোস নৃত্যে হাতের ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না ব'লে এখানকার এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করবার মত। কোনো জিনিস দেখানো, কাউকে কাছে ডাকা, অনুরোধ করা, ইত্যাদিতে হাতের ব্যবহার হয়; অস্বীকার করা, প্রণাম করা, স্পন্দিত করা, প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদিতে মাথার ব্যবহার হয়। সুতরাং হাত এবং মাথার ব্যবহার সীমিত। অবশ্য যারা মুখোস পরে অর্থাৎ বানর, রাক্ষস, দৈত্য দানবের চরিত্র, তারা হাত এবং মাথার ব্যবহার করে না। সুতরাং উচ্চ চরিত্রগুলোর মুখোস পরিত্যাগ করবার পর, এ'র মধ্যে এই সামান্য আধুনীকরণ হ'য়েছে।

যোগজাকার্তা ও সুরকর্তার নৃত্যপদ্ধতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, যোগজাকার্তার পদ্ধতি রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবার ফলে তার যেমন জাঁকজমক পোষাক পরিচ্ছদ এবং আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে এবং রাজ-পরিবারের রুচি এবং সম্পদ দিয়েও তা' নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে, সুরকর্তার পদ্ধতি তার পরিবর্তে প্রাম্বানাম্ মন্দির এবং মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যেই তার অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ ছিল বলে তার আদর্শ দ্বারা তা' প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে। মন্দিরের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হ'বার অর্থ মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ রামায়ণের কাহিনী, রূপসজ্জা নৃত্যভঙ্গি সুরকর্তার নৃত্যাদর্শকে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে। তার ফলে যোগজাকার্তার রীতি প্রাচীন ভিত্তির উপর যতখানি পরিবর্তন স্বীকার করেছে, সুরকর্তার রীতি ততটা পরিবর্তন স্বীকার করে নি। মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলো নৃত্যশিল্পীদের সামনে অবিচল থেকে তাদেরও একটি অবিচল আদর্শ রক্ষা

করবার প্রেরণা দিয়েছে, তা'র ফলে এই পদ্ধতির নৃত্যের মধ্যে যথার্থ প্রাচীনত্ব এখনো দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সেদিন সুরকর্তার নৃত্য সম্প্রদায় লঙ্কা যুদ্ধের বৃত্তান্তটি নৃত্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিল। বিস্তৃত মঞ্চ জুড়ে দু' ভাগে ভাগ হ'য়ে বানর এবং রাক্ষস সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হ'য়েছে। যুদ্ধের পটভূমিকায় স্থাপিত হ'য়েছিল ব'লে স্বাভাবিক ভাবে তাদের মধ্যে যে প্রাণ-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করবার কথা, তা' যেন তাদের মধ্যে ছিল না। প্রাম্বানামের মন্দিরে যে ভাবে রাক্ষস এবং বানর সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধকালীন সৈন্য সংস্থাপন হ'য়েছিল, তারই সম্পূর্ণ অনুকরণে সেই বিশাল মঞ্চের উপর সেখানে সৈন্য সমাবেশ করা হ'য়েছিল, সুতরাং একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং একটি অবিচল আদর্শ অনুসরণ কববার জন্য সেই যুদ্ধের দৃশ্যেও যেন প্রাণ-চাঞ্চল্যের অভাব দেখা গিয়েছিল। তার বিস্তার ছিল সত্য, কিন্তু চাঞ্চল্য ছিল না, নিস্তরঙ্গ মহা-সমুদ্রের মত সেই পরস্পর সম্মুখীন বিশাল সৈন্যদল কেমন যেন প্রাণহীন মনে হ'য়েছিল। তাদের পদক্ষেপ ও অঙ্গ সঞ্চালন যেন দাঁড়িপাল্লার ওজনে মাপা ছিল, এ'বিষয়ে তাদের যত সাবধানতা এবং সতর্কতা ছিল, যুদ্ধ দৃশ্যকে বাস্তবায়িত ক'রে তুলবার তত আগ্রহ ছিল না। এক অবিচল পাষাণ মূর্তিকে আদর্শ করবার যা পরিণাম, তাই এখানে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তথাপি সমুদ্রের সেই বিস্তারের মধ্যে গভীর এবং গম্ভীরতার যে স্পর্শ ছিল না, তা বলা যায় না। কিন্তু রাম-লক্ষণের রূপসজ্জা দেখে সে'দিন মনে হ'য়েছিল, পাষাণ মূর্তিও শিল্পচেতনায় শ্রীরামচন্দ্রের পাদ-স্পর্শে পাষাণী অহল্যার মত জীবনে জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। নৃত্যের তালে পাষাণ মূর্তি যেন এখানে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছিল। এমন অভাবনীয় রূপসজ্জা আমাদের দেশে আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। যাত্রায় নাটকে যেখানেই রাম-লক্ষ্মণকে যে ভাবেই আমাদের দেশে দেখ্‌তে পাই, সে রাজপ্রাসাদে হোক, কিষ্কিন্ধ্যার অরণ্যেই হোক, কিংবা লঙ্কাযুদ্ধেই হোক, সর্বত্রই তাদের নাড়ু গোপালের মত চেহারা। কিন্তু সুদীর্ঘ বনবাস জীবনে চরম দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে যে তপঃক্লিষ্ট রূপ তাদের হওয়া স্বাভাবিক এবং সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে সহজ যোগ স্থাপন করবার উপযোগী, তা' কোথাও প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এখানে রাম-লক্ষ্মণের সেই তপঃক্লিষ্ট দুঃখ শীর্ণ রূপ দেখ্‌তে পেলাম, কিন্তু তা' যেন জ্বলন্ত অগ্নি

শিখার মত, যাকে স্পর্শ করছে তাকেই দগ্ধ করছে, বীরত্ব এবং বিক্রম সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, সে যে কী রূপ, তা আমি সব টুকুন বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না।

সুন্দা, পশ্চিম যবদ্বীপ

যবদ্বীপের প্রাচীন পদ্ধতির রামায়ণ নৃত্য বল্‌তে যোগজাকার্তা, সুরকর্তা এবং সিরেবনের পদ্ধতিই বুঝায়, তাদের উপর অনেক খানি নির্ভর ক'রে শিথিল ভাবে যবদ্বীপের যে সকল নৃত্যপদ্ধতি গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে পশ্চিম যবদ্বীপের সুন্দা অঞ্চলের পদ্ধতি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। আজ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সন সন্ধ্যা ৬৷৷০ টায় পাণ্ডানের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে সুন্দা পদ্ধতির রামায়ণ নৃত্যের অনুষ্ঠান হ'বে। তার আগে নেপালের অবশ্য একটি অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু তার চাইতেও সুন্দা অঞ্চলের নৃত্যনাট্য দেখবার জন্য স্বভাবতই কৌতূহলী হ'য়ে উঠ্‌লাম। নেপালের রামায়ণ নৃত্য দেখ্‌বার মত কিছু হ'বে বলে মনে হ'লো না, কারণ, তা' যদি হ'তো তবে ভারতবর্ষেই তা' একদিন না একদিন দেখ্‌তে পেতাম।

সন্ধ্যা ৬৷৷০ টার আগেই সেদিনও পাণ্ডানে গিয়ে পৌঁছুলাম। সেদিন ভারতীয় অতিথিদের দলে আরও দু'জন নূতন আগন্তুককে দেখ্‌তে পেলাম, একজন মাদ্রাজ কলাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী রুক্মিণী অরুণ্ডালে এবং আর একজনের বিস্তৃত পরিচয় পরে পেয়েছিলাম, তিনি একজন ইংরেজ আমলে সরকারী মহলে সুপরিচিতা ছিলেন, তাঁর নাম শ্রীমতী লীলা দয়াল। তিনি জাতিতে পারসী, একজন পাঞ্জাবী আই, সি, এসকে বিয়ে ক'রে স্বামীর সঙ্গে দেশবিদেশ ঘুরেছিলেন, তাঁর স্বামী সে সময়কার External Affairs Ministry-তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বহুদিন হ'লো তিনি পরলোকগমন করেছেন, তাঁর নিঃসন্তানা পত্নীর জন্য তিনি প্রচুর অর্থ এবং বাড়ী গাড়ী রেখে গেছেন। দেশে তিনি খুব কমই থাকেন, নিজের ব্যয়ে একাকিনীই এখনো দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ান। এ'দের দু' জনের সঙ্গেই আলাপ হ'য়েছিল, কিন্তু নৃত্যোৎসব দেখবার আনন্দে এবং ব্যস্ততায় তাদের সঙ্গে এখনো গভীরতর পরিচয় হয় নি। সে দিন শ্রীমতী লীলা দয়াল আমার পাশেই এ'সে বস্‌লেন। খুব

তোলবার অক্ষমতাকে বীররস দিয়ে এখানে পূর্ণ ক'রে দিবার প্রয়াস দেখা যায়। সুন্দার নৃত্যে যে মুখোস ব্যবহার করা হয়, তাও নূতন পরিকল্পনার ফল, অনেক বিষয়েই তাদের সঙ্গে যবদ্বীপীয় মুখোসের কোনো সম্পর্ক নেই। আর একটি বিষয়ে যবদ্বীপীয় নৃত্যের সঙ্গে সুন্দা অঞ্চলের প্রধান পার্থক্য এই যে নৃত্যের মধ্য দিয়ে কাহিনী উপস্থাপনা করতে গিয়ে তা'তে অনেক সময় আধুনিক নাটকের কিংবা চলচ্চিত্রের মত তা'তে পূর্ববর্তী ঘটনাকে প্রক্ষেপ (flash back) করা হয়। এ'রীতি প্রাচীন কিংবা আধুনিক প্রভাবের ফল তা' বুঝতে পারা যায় না, তবে আধুনিক প্রভাবের ফল বলেই মনে হ'তে পারে।

সুন্দা অঞ্চলের প্রথম নৃত্যটির ভিতর দিয়ে যে কাহিনী দেখানো হ'লো তা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকটা সপ্ততাল ভেদের মত। সাতটি বিশাল-দেহ রাক্ষস সাতটি তাল গাছের নৃত্যাভিনয় করল, রাম-লক্ষ্মণের কোনো মুখোস নেই, তারা দু'জনে পরামর্শ ক'রে নানা ভাবে চেষ্টা করবার পর সপ্ততাল ভেদ করলেন। দৃশ্যে সুগ্রীবও উপস্থিত ছিলেন। মনে হ'লো সুগ্রীবের সঙ্গে মিতালী করবার আগে তাকে রামচন্দ্রের নিজের বিক্রম দেখানোর জন্য সপ্ততাল ভেদের আয়োজন হ'য়েছিল।

যাই হোক, কাহিনীটির মধ্যে বীররসই প্রাধান্য পেল, কোনো স্ত্রী চরিত্র, এমন কি, সীতা দেবীকেও এই দৃশ্যে দেখা গেল না। সুন্দা অঞ্চলের নৃত্যের মধ্যে যে যবদ্বীপীয় নৃত্যের তুলনায় কিছু নূতনত্ব আছে, তা' বুঝতে পারা গেল। কিন্তু নতুনত্বের অর্থ এই নয় যে কোনো দিক দিয়ে তা' উৎকৃষ্ট ছিল। যবদ্বীপীয় নৃত্যে সহজেই যে সৌন্দর্যের স্বপ্নলোক সৃষ্টি হ'য়ে যায়, এখানে তা' হোল না, তবে এখানকার নৃত্য যে যুদ্ধভিত্তিক এবং এখনো তবে সেই আঙ্গিক ধ'রে আছে, তা' বুঝতে পারা গেল। এ' নৃত্যের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার পাইক নৃত্য কিংবা ময়ূরভঞ্জের ছৌ নৃত্যের অনেকটা তুলনা হ'তে পারে। তবে ময়ূরভঞ্জের সঙ্গে একটি পার্থক্য এই যে তা'তে মুখোস ব্যবহার করা হয় না, সুন্দা অঞ্চলের নৃত্যে মুখোস ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

সুন্দা অঞ্চলের নৃত্য যবদ্বীপের কতকগুলো প্রান্তিক অঞ্চলের বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতির একটি মিশ্র রূপ। প্রধানতঃ দুটি অঞ্চলের উপকরণই তা'তে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে, অঞ্চল দু'টির নাম সিরেবন (Cirebon) এবং

পরহিয়ঙ্গন (Parahyangan), তার উপর যুদ্ধনৃত্যের আঙ্গিক এ'সে মিশ্রিত হ'য়েছে। এই সকল বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের ফলে এখানে একটি বলিষ্ঠ আদর্শ গড়ে উঠতে পারে নি। আরো কয়েকটি দৃশ্যের অভিনয়ের পর রাত্রি ৯৷৷০ মধ্যেই সেদিন অনুষ্ঠান শেষ হলো।

পূর্ব যবদ্বীপ

আজ ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সন। আজ যে দু'টি দেশের নৃত্যানুষ্ঠান হ'বার কথা তা'দের মধ্যে প্রথমতঃ খেমর্ (কম্বোডিয়া), দ্বিতীয়ত পূর্ব যবদ্বীপ। তা'দের মধ্যে খেমরের অনুষ্ঠান ইতিপূর্বেও একদিন হ'য়ে গেছে, আজ তারই অতিরিক্ত কতকগুলো দৃশ্য নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে দেখানো হ'বে।

খেমর্ বা কম্বোডিয়ার রামায়ণের নাম রামকের (Ramker)। ইন্দোনেশিয়ায় যেমন প্রাম্বানাম্ শৈব মন্দিরের গায়ে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে এবং তা' থেকেই সেখানে রামায়ণ নৃত্যনাট্যের নৃত্যভঙ্গি এবং রূপসজ্জা বহুলাংশে অনুকরণ করা হয়, কম্বোডিয়ারও বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির ওঙ্কার বটের গায়ে রামায়ণের বহু দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে এবং তা'র নৃত্য ভঙ্গি এবং রূপসজ্জা খেমর্ বা কম্বোডিয়ায় রামায়ণ নৃত্যের আদর্শ রূপে গৃহীত হ'য়ে থাকে। কম্বোডিয়ায় যে সব উপায়ে রামায়ণের কাহিনী নৃত্যের মধ্য দিয়ে গৃহীত হ'য়ে থাকে তাদের মধ্যে তিনটিই প্রধান, যেমন, প্রাচীন পদ্ধতির রামায়ণ-ব্যালে নৃত্য, তা'তে রামকেরের সমগ্র কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত হ'য়ে থাকে, তারপর ছায়া-নাটক এবং সর্বশেষে এক প্রকার আচার (ritual) নৃত্য ; তাতে প্রতি বৎসর নব বর্ষের দিনে রামায়ণ নৃত্যের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সাধারণ কৃষক সমাজ আগামী বছরের জন্য বৃষ্টিপাত এবং শস্যসম্পদের প্রার্থনা জানায়। সুতরাং দেখা যায়, উচ্চতম বা অভিজাত সমাজ থেকে আরম্ভ ক'রে নিতান্ত জন-সাধারণের কৃষক-সমাজ পর্যন্ত রামায়ণের প্রভাব সে দেশে বিস্তার লাভ করেছে। সর্বশেষ বিষয়টির সঙ্গে পশ্চিম বাংলার ছৌনৃত্যের সব বিষয়েই ঐক্য আছে। ছৌনৃত্য মুখোস নৃত্য এবং বৃষ্টিপাতের জন্য সূর্য দেবতাকে প্রসন্ন করবার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বৎসরের শেষ দিন সম্পন্ন করা হ'য়ে থাকে। কম্বোডিয়াতে প্রকৃতপক্ষে একই ভাবে একই উদ্দেশ্যে

বছরের একই সময় তাই করা হয়। তা'দের মধ্যে পরস্পর কোনো যোগ আছে কি না, তা' বলা যায় না।

কম্বোডিয়ার রামায়ণ নৃত্যনাট্যে সাধারণতঃ রামায়ণের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবলম্বন করা হয়ে থাকে—

১। রাবণ দণ্ডকারণ্যে রাম-সীতাকে দেখ্‌তে পেলেন।

২। স্বর্ণমৃগ অনুসরণ ক'রে রাম কুটীর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

৩। রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ।

৪। সুগ্রীব, হনুমান ও বালী, সুগ্রীব ও বালীর যুদ্ধ, রামচন্দ্র তীর নিক্ষেপ ক'রে বালীকে বধ করলেন।

৫। সেতুবন্ধন

৬। লঙ্কাযুদ্ধ

৭। সীতার অগ্নিপরীক্ষা

৮। সীতার বনবাস

৯। অশ্বমেধ যজ্ঞ

১০। রাম, সীতা ও তাদের দুই পুত্র, সীতার পাতাল গমন।

সমগ্র রামায়ণের কাহিনীটিকে এই কয়েকটি নাটকীয় দৃশ্যে বিভক্ত ক'রে খেমেরের প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যনাট্য গঠিত হ'য়েছে। কিন্তু আধুনিক কালে তার অতিরিক্তও কতকগুলো দৃশ্য তার মধ্যে যোগ করা হ'য়েছে, কিন্তু তা'দেরে প্রাচীন পদ্ধতির (classical) নৃত্যনাট্যের অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করা হয় না, তাদেব মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ এ'সে গেছে।

খেমরের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে তিনটি দৃশ্যের নৃত্যাভিনয় হ'লো, প্রথমতঃ সুগ্রীব-বালী যুদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ সেতু-বন্ধন এবং তৃতীয়তঃ রাম ও রাবণের যুদ্ধ। প্রথম দিনের নৃত্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল, আজো তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না, তার নৃত্যের গতি অত্যন্ত মন্থর, এমন কি, যুদ্ধনৃত্যের মধ্যেও যে প্রাণ-চাঞ্চল্য কিংবা বীররসের অভিব্যক্তি আবশ্যক, তা' এখানে খুব সার্থকতা লাভ কর্‌তে পারে নি, প্রধানতঃ গীতিধর্মিতাই (lyricism) এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য, এমন কি, যুদ্ধ নৃত্যও তা' থেকে মুক্ত নয়। রাবণের মুখোস দশমুণ্ড যুক্ত নয়, সাধারণ রাক্ষসের মতই বৈশিষ্ট্যহীন।

। কিন্তু আজ যে নৃত্যের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছি, তা' পূর্ব যবদ্বীপের নৃত্য। অনেকের মতে এই নৃত্যে যবদ্বীপের

কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শিল্পী আবির্ভূত হ'বে। পূর্ব যবদ্বীপের পূর্বে ব লীদ্বীপ এবং পশ্চিমে মধ্য যবদ্বীপ। দুই অঞ্চলেরই নৃত্য দেখে আমরা মুগ্ধ হ'য়েছি, অনুরূপ কৃতিত্ব সম্পন্ন তৃতীয় নৃত্যদলই পূর্ব যবদ্বীপ। সুতরাং তার কৃতিত্ব সম্পর্কেও আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

পূর্ব যবদ্বীপের আজকের নৃত্যের প্রধান বিষয় সীতার অগ্নিপরীক্ষা, আমাদের পক্ষে এই বিষয়টি নূতন বলেই তা'কে প্রধান বিষয় বল্ছি, অন্য যে দু'টি বিষয় আজকে তার অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছিল, তা সীতাহরণ এবং সুগ্রীব-বালীর যুদ্ধ, এই বিষয় দু'টোর অনুষ্ঠান অন্য দলের মধ্যেও দেখেছি ব'লে সীতার অগ্নিপরীক্ষার দৃশ্যটিই আমাদের সব চাইতে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করল। তাব বিষয়ই আজ এখানে একটু বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করতে চাই।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা দৃশ্যটির অনুষ্ঠান যখন আরম্ভ হ'লো তখন রাত্রি একটু গভীব হ'য়েছে। সেদিনকার তা' শেষ অনুষ্ঠান। ইতিপূর্বে পূর্ব যবদ্বীপের যে দু'টি অনুষ্ঠান হ'য়েছে, তা সমগ্র দর্শকের চিত্ত অধিকার ক'রে নিয়েছে, সকলেই শেষ দৃশ্যটির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা ক'রে আছে।

খুব উঁচু একটি স্তম্ভের (tower) উপর থেকে বিশাল অন্ধকার মঞ্চটির উপর আলোকসম্পাত করবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল প্রায় দু'শ' ইন্দো-নেশীয় তরুণী সব মঞ্চটি জুড়ে সারি সারি স্থির হ'য়ে এক অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরিধানে লাল রঙের লুঙ্গি, লাল রঙের বক্ষো বাস, দু'পাশে দোদুল্যমান লাল রঙের চাদরের (sash) লম্বমান অঞ্চল, কোমরে রত্নখচিত লাল রঙের চওড়া কটিবন্ধ, প্রত্যেকের মাথায় জ্বলন্ত অগ্নিবর্ণ মুকুট, সমগ্র মঞ্চটি লাল বিদ্যুতালোকে প্লাবিত। সমগ্র মঞ্চটিই যেন এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের রূপ ধারণ ক'রেছে। এই দৃশ্যটি তার বিস্তারের মধ্য দিয়ে অগ্নিপরীক্ষার যে ভয়াবহতার চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছে, তা' কি ক'রে একটি ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চে সম্ভব হ'তে পারে? আমি আগেই বলেছি, রামায়ণের কাহিনী মহাকাব্যের কাহিনী, তার অন্তহীন বিস্তার এবং অন্তস্পর্শী গভীরতার ইঙ্গিত দিতে হ'লে তার জন্য এই বিশাল উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চেরই আবশ্যক, কোনো ক্ষুদ্রতর বদ্ধ পরিবেশে তার যথার্থ রূপায়ণ সার্থক হ'তে পারে না।

এই বিশাল অগ্নিকুণ্ড সদৃশ দৃশ্যটি এতক্ষণ স্থির হ'য়েছিল, এ'বার যেন

বাতাসের স্পর্শ লাভ ক'রে ধীরে ধীরে তা আন্দোলিত হ'তে লাগ্‌ল, এক একটি নৃত্যশিল্পী দু'পাশের চাদরের (sash) প্রান্তগুলো ধীরে ধীরে উপরের দিকে তুলে ধ'রে তা' দিয়ে তার উর্ধ্বগামী শিখার অভিনয় করতে লাগ্‌ল, প্রত্যেক শিল্পীর দেহ সেই ভাবে আন্দোলিত হ'তে লাগ্‌ল, প্রত্যেকেরই কটিবদ্ধ উত্তরীয়প্রান্তগুলো উপরে, ক্রমে মাথার উপরে, উড়্‌তে লা'গ্‌ল, মনে হ'লো সমগ্র মঞ্চের উপর এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছে, তার শিখাগুলো উর্ধ্বে উঠ্‌ছে, আবার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের যেমন হ'য়ে থাকে, তেমনই এক একবার নীচে নেমে আসছে। নিঃশব্দ সমগ্র পটভূমিকার উপর গেমিলিনের বাদ্য করুণ সুরে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যে সীতাদেবী কোথায় কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। অনেক-ক্ষণ ধ'রে সমগ্র রঙ্গমঞ্চটির উপর যেন একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বল্‌তে লাগ্‌ল।

সহসা প্রবেশ পথে দেখা গেল অবনতমুখী ম্লান একটি রক্তলেখার মত রক্তবস্ত্র-পরিহিতা সীতা প্রণামের ভঙ্গিতে করজোড়ে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডের দিকে এগিয়ে আস্‌ছেন, মুহূর্তেই যেন তিনি তার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, জ্বলন্ত অগ্নিরাশি যেন সস্নেহ আলিঙ্গনে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল।

রক্তবসনা নৃত্যশিল্পীরা এ'বার তাদের দু'পাশে লম্বমান রক্তবর্ণ উত্ত-রীয়ের অঞ্চল দু' হাত দিয়ে বার বার যতদূর উর্ধ্বে তুলে দেওয়া যায়, ততদূর উর্ধ্বে তুলে দিতে লাগ্‌ল। দু'শত রক্তবসনা সুন্দরী এক সঙ্গে বার বার এ'কাজ করবার জন্য সমগ্র মঞ্চটি জুড়ে যেন এক বিরাট দাবানলের সৃষ্টি হলো, কিন্তু তা' মুহূর্তের জন্য, সেই বিশাল অগ্নিকুণ্ড মাত্র কয়েকবারের মত তার উর্ধ্বমুখী শিখা আকাশে বিস্তার ক'রে আবার ধীরে ধীরে সংযতভাবে নির্বাণোন্মুখ হ'য়ে পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, সীতাদেবী সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে অক্ষত দেহে ধীর নম্র পদে বাইরে বেরিয়ে এ'লেন। তারপর বহুক্ষণ ধ'রে আবার রক্তবসনা সুন্দরীদের অপূর্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য চল্‌তে লাগ্‌ল, সেই নৃত্যে যেন অগ্নিদাহের জ্বালা আর নেই, চরিতার্থতার প্রসন্নতা আছে। সীতার নৃত্যে প্রসন্নভাব নেই, জনচক্ষুর সাম্‌নে এক অপমানকর প্রস্তাবে যে তাকে রাজি হ'তে হ'য়েছিল, তার অপমান-বোধে যেন তার মন পীড়িত এবং ভারগ্রস্ত।

নৃত্য শেষ হ'তে সে'দিন রাত্রি প্রায় ১০টা বেজে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরে এলাম।

যবদ্বীপে আরো নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে, তাদের কয়েকটির এখানে নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

১। ছায়ানাটক, ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্রই, বিশেষতঃ মধ্য ও পূর্ব যবদ্বীপে, অত্যন্ত জনপ্রিয়। ছায়ানাটকের বিষয়বস্তু আনুপূর্বিক রামায়ণ। আগেই বলেছি, সে দেশের ভাষায় তা'কে ওয়েঙ্ কুলিত (Wayang Kulit) বলা হয়। ঘটনার বর্ণনায় সর্বত্র তা'তে যবদ্বীপীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো স্থানে আঞ্চলিক কথ্য ভাষারও ব্যবহার হ'য়ে থাকে। আগে সারারাত্রি ধ'রে তার অভিনয় হ'তো, এখন ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিনয় শেষ হয়। রামায়ণের কাহিনী তা'তে প্রধানতঃ তিন অংশে পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

যোগজাকার্তা ও সুরকর্তার ছায়ানাটকের পদ্ধতি তাদের উচ্চাঙ্গের আঙ্গিকের জন্য সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়।

২। ইন্দোনেশিয়ায় এক পদ্ধতির পুতুল নাচ আছে, তা'কে সাধারণতঃ ছায়ানাটক বলা যায় না, কারণ, তা'তে পর্দার উপর ছায়া ফেলবার কোনো ব্যবস্থা করা হয় না। তা' প্রকৃতপক্ষে পুতুলের নাটক, পুতুলগুলো আমাদের দেশের দণ্ড পুতুলের (rod puppet) মত। ছায়ানাটকের মতই এক শ্রেণীর গায়েন (dalang) তার অনুষ্ঠান করে। পশ্চিম যবদ্বীপে এই পুতুল নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় তা'তে গেমেলিন বাদ্য এবং সুন্দানী আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর রামায়ণ বিষয়ক পুতুল নাচকে 'ওয়েঙ গোলেক' বলে।

৩। ছায়া নাটককে নৃত্য নাট্যে রূপান্তরিত ক'রে এক শ্রেণীর রামায়ণ নৃত্য নাট্য যবদ্বীপে গড়ে উঠেছে, তা'কে 'ওয়েঙ-উওঙ' বলে, তার কথা আগে একবার বলেছি। তার প্রাচীনতর ধারায় এখনো দালাঙ্ ঘটনা বিবৃত ক'রে থাকে এবং নৃত্যকারীরা সংলাপ বলে। আগেই বলেছি, যোগ-জাকার্তার রাজা প্রথম হেমাঙ্গভূষণ এই রীতির উদ্ভাবক ছিলেন। তারপর তার আরো দুটি পদ্ধতি সৃষ্টি হ'য়েছে, একটি যোগজাকার্তা, আর একটি সুরকর্তা। যোগজাকার্তার পদ্ধতিটি প্রাচীন এবং কঠিন নিয়মানুগত অর্থাৎ 'ক্লাসিক' হয়ে গেছে, সুরকর্তাও তাই, তবে তা'তে নিয়মের এত কঠিন নির্দেশ সর্বদা স্বীকৃত হয় না, সেইজন্য তা' বেশি জনপ্রিয় হ'য়েছে।

৪। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যবদ্বীপে আমাদের দেশের কৃষ্ণযাত্রার মত এক শ্রেণীর লোক-নাট্য গড়ে উঠেছে, তা'কে সেদেশের ভাষায় 'লাঙ্গেন-মন্ত্র-আনর' বলে। তা'তে কোনো গদ্য সংলাপ নেই, অভিনেতারা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রামায়ণের কাহিনী ব্যক্ত ক'রে। আগে কেবল মাত্র পুরুষেরাই তা'তে অভিনয় করত, এখন মেয়েরাও মেয়েদের অংশে অবতীর্ণ হয়। আমাদের দেশের অনেকটা রামযাত্রার মত, তবে তা'তে হনুমানকে নিয়ে কৌতুক করবার কোনো অবকাশ নেই। হনুমানও গান গেয়ে তার সংলাপ বলে থাকে।

৫। যবদ্বীপের আর এক প্রকার রামায়ণ বিষয়ক নৃত্যনাট্যের নাম সে দেশের ভাষায় 'সেন্দ্রাতরী'। অনুষ্ঠানটি নূতন, ১৯৬১ সন থেকে চ'লে আসছে। তা'তে নৃত্যকারীরা কোনো সংলাপ বলে না, কিংবা গান গায় না, কিংবা প্রথাগত দালাঙেরও তা'তে কোনো প্রয়োজন নেই। পটভূমিকায় কাহিনী বর্ণনা ক'রে, সঙ্গীতকারীরা সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে থাকে। মধ্য যবদ্বীপের প্রাম্বানাম শিব-মন্দিরের নৃত্যাঙ্গিনায় যখন ১৯৬১ সনে প্রথম প্রকাশ্য জাতীয় রামায়ণ নৃত্যোৎসব হয়, তখন সুরকর্তার রাজ কুমার শ্রীজাতিকুসুম এবং পরলোকগত ডক্টর সুহর্ষ এই নৃত্যনাট্যের সেখানেই প্রথম প্রবর্তন করেন, তার পর থেকে তা' অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। নিষ্ঠা, অভ্যাস এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা এই নৃত্যনাট্য যবদ্বীপের এক বিশিষ্ট নৃত্যনাট্য ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে।

৬। যবদ্বীপের নিতান্ত আধুনিক নৃত্যনাট্য প্রযোজকদের মধ্যেও যে রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করবার প্রবণতা কত বেশী, তার প্রমাণ যবদ্বীপের সাম্প্রতিকতম নৃত্যনাট্য সঙ্গীতা। মাত্র ১৯৭০ সনে শ্রীমর্দন কুসুম নামক একজন নৃত্যনাট্য প্রযোজক তা প্রথম প্রবর্তন করেন। গতানুগতিক রামায়ণ-নৃত্যের ধারা পরিত্যাগ ক'রে তা'তে নূতন ভাবনা যুক্ত করা হ'য়েছে। এই ভাবনা অনুযায়ী নৃত্যকারীর ভিতর দিয়ে বহির্মুখী অঙ্গভঙ্গির উপর বেশি জোর না দিয়ে অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করবার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

রামায়ণ উৎসবে সেবার যবদ্বীপের পাঁচটি প্রথাগত রামায়ণ-নৃত্যের অনুষ্ঠান হ'য়েছিল—পশ্চিম যবদ্বীপের সুন্দা, মধ্য যবদ্বীপের যোগজাকার্তা ও সুরকর্তা এবং পূর্ব যবদ্বীপের পূর্ব যাভা ও বালী।

বিশ্ব রামায়ণ আলোচনাচক্র

পাণ্ডান উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের সংলগ্ন একটি গৃহের এক বিস্তৃত কক্ষে সকাল ৯টায় প্রথম বিশ্ব রামায়ণ আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন হ'লো। উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ের মন্ত্রী শ্রীমহাশূরী। তার পূর্বে উৎসব ও আলোচনা-চক্রের সাধারণ কর্মসচিব ডক্টর মন্ত্র ভাষণ দিলেন। ডক্টর মন্ত্র বালীদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ, বিদেশে লেখাপড়া শিখেছেন, কিছুদিন সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে ছিলেন, কিছু বাংলাও শিখেছিলেন। এখানকার সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদা-শঙ্কর রায় ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে তাঁরা বিশেষ পরিচিত হ'য়েছিলেন। আমি ইন্দোনেশিয়া যাব এ' কথা শুনে শ্রীযুক্ত রায় একদিন আমাকে তাঁর কথা বলেছিলেন এবং তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি সেদিন অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'বার আগেই নিজের পরিচয় দিয়ে এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম ক'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি খুব আনন্দিত হ'লেন এবং কোনো অসুবিধা হ'লে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবার কথা বল্লেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ত শুন্‌লাম, একদিন বাংলা বল্‌তে শিখেছিলেন।

তিনি আমাকে প্রায় বাধা দিয়েই বলে উঠ্‌লেন, অভ্যাসের অভাবে সব ভুলে গেছি, এখন আর তার কিছুই মনে নেই। আমার স্ত্রীরও একই অবস্থা।

ব'লে পার্শ্ববর্তী এক মহিলার দিকে তাকালেন, আমি বুঝতে পারলাম তিনিই তাঁর পত্নী। তাঁর ইন্দোনেশীয় রমণীদের মত ক'রে লুঙ্গি, জামা ও চাদরের মত একটা দোপাট্টা গায়ে জড়ানো। তাঁর নিজের পরিধানে মার্কিনী পোষাক।

যাই হোক, তিনি তাঁর ভাষণে বিশেষ ক'রে বল্লেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যে এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক যোগ আছে, তা' রাজনৈতিক কারণে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি জাতীয় সংস্কৃতির উপর যতখানি নির্ভর করে, রাজনীতির উপর তত করে না। সেইজন্য আমাদের সাংস্কৃতিক

ঐক্যের বিস্মৃত সূত্রগুলোকে আবার আমাদের মধ্যে জাগ্রত ও জীবন্ত ক'রে সেই অখণ্ডতার অনুভূতি ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

তিনি তাঁর ভাষণের মধ্যে আলোচনা-চক্রের বিস্তৃত কর্মসূচী ও তার গুরুত্বও বুঝিয়ে বল্‌লেন।

ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমহাশূরীও তার ভাষণে বিদেশী অভ্যাগতদেরে স্বাগত জানিয়ে রামায়ণ বিষয়ক আলোচনার গুরুত্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন। কি ভাবে এশিয়ার একটি বিপুল অংশের উপর রামায়ণ একদিন প্রভাব স্থাপন ক'রে নিজের শক্তি এবং সত্যের গুণে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা' উপলব্ধি ক'রে জাতির নৈতিক শক্তি আবার ফিরে পাওয়া যেতে পারবে সেই আশা তিনি তাঁর ভাষণে বিশেষ ক'রে প্রকাশ করলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১১টার মধ্যেই শেষ হ'য়ে যাবার পর সেই কক্ষেই রামায়ণ-বিষয়ক দেশ-দেশান্তরের গ্রন্থ এবং একটি চিত্র-প্রদর্শনী সুরু হ'লো। ভারতবর্ষ থেকেও কয়েকটি বই এবং কয়েকটি চিত্র নিয়ে সেখানে স্থাপন করা হ'লো, কিন্তু তা' অন্যান্য দেশের তুলনায় এত অকিঞ্চিৎকর যে তা' দেখে আমার নিজেরই লজ্জা হ'তে লাগ্‌ল। শ্রীযুক্তা লীলা দয়াল ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে ৩।৪ খানি চটি বই, অত্যন্ত নীরস কাগজে কুৎসিৎ ক'রে ছাপানো, সেখানে নিয়ে রাখ্‌লেন, তারপর আমাকে ডেকে বল্‌লেন, এই বইগুলো যদি আপনি কিন্‌তে চান, তবে আমার নিকট পাবেন।

আমি দেখ্‌লাম, বিনামূল্যে বিতরণ করলেও সেই কদর্য বইগুলো আমি সংগ্রহ কর্‌তে রাজি নই। তবু তা'কে খুসী করবার জন্য বল্‌লাম, বইগুলো বুঝি আপনারই লেখা।

তিনি বল্লেন, হ্যাঁ, অনেকদিন আগে ছাপা কি না, তাই কাগজ লাল্‌চে হ'য়ে গেছে।

আমি একখানি বই হাতে নিয়ে তুলে দেখ্‌লাম; শুধু তাই নয়, তার পাতাগুলো উল্টাতে গেলে খসে পড়্‌ছে। তবে বুঝতে পারলাম, যৌবনে এই সুন্দরী একদিন নৃত্যেরও অনুশীলন করতেন। বইগুলোর বিষয় ভরত-নাট্যম্।

তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই আমাকে বুঝিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, আমাদের

সময়ে ত মঞ্চে মঞ্চে নেচে বেড়ানোর আমাদের রেওয়াজ ছিল না, তাই আমরা এ' বিষয়ে কোনো খ্যাতি লাভ করতে পারলাম না। কিন্তু আমরা একদিন যে ভাবে ভারতীয় নৃত্যের চর্চা ক'রেছি, আজকাল সে ভাবে কেউ করে না।

আমি খুব গম্ভীর ভাবে বল্লাম, হ্যাঁ সে ত নিশ্চয়ই।

এখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর আজ থেকেই ক্রেতেস শৈলনগরের তেনজুঙ্ হোটেলে প্রতিদিন আলোচনা-চক্রের দু'টি অধিবেশন বস্‌বে—একটি সকাল আট টা থেকে বারোটা, আর একটি দু'টা থেকে পাঁচ টা। পাঁচটার পর প্রতিনিধিদেরে গাড়ীতে ক'রে প্রতিদিন পাণ্ডান রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এ'সে সান্ধ্যকালীন দেশ-বিদেশের রামায়ণ নৃত্যানুষ্ঠান দেখবার সুযোগ দেওয়া হবে। আজই বেলা দু'টোর সময় তেন্‌জুঙ হোটেলে তার আলোচনা-চক্রের প্রথম অধিবেশন হ'বে, সুতরাং হোটেলে ফিরবার তাড়া ছিল। কিন্তু লীলা দয়াল তাঁর বিগত যৌবনের শিল্পীজীবনের কথা আমাকে শুন্‌তে বাধ্য ক'রে আমার হোটেলে ফিরার পথে বাধা সৃষ্টি কর্‌তে লাগ্‌লেন। মনে মনে বিরক্ত হ'য়েও বৃদ্ধার জীবনের বিরক্তিকর স্মৃতিচারণা শুন্‌তে হ'লো।

অবশেষে বল্লাম, আপনার কথা পরে আরো শুন্‌ব, এ'বার হোটেলে ফির্‌তে হ'বে। তিনি নিজের ব্যয়ে এখানে এ'সেছেন ব'লে পাণ্ডানেই একটা সাধারণ হোটেলে থাক্‌তেন, তাই তার পক্ষে ক্রেতেস গিয়ে আলোচনাচক্রে যোগদান করা কোনোদিন সম্ভব হয় নি। সুতরাং সেখানে আমি নিরুপদ্রবে আলোচনা শুন্‌বার সুযোগ পেতাম।

আলোচনাচক্রের প্রতিদিন দু'টো অধিবেশনের মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনে এক একটি দেশের একটি মাত্র প্রবন্ধ আলোচনা করবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধির প্রবন্ধ আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

ভারতবর্ষ থেকে আর একজন যে প্রতিনিধি গিয়েছিলেন, তিনিও আলোচনাচক্রে উপস্থিত করবার জন্য একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধটি প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হওয়ার জন্য ইন্দোনেশায় বিভাগীয় সভাপতি তা বাতিল ক'রে দেন। এই বিষয়ে তাঁর যে উক্তি আলোচনা-চক্রের কার্যবিবরণীতে মুদ্রিত হ'য়েছে, তা এই— 'The requiro-

ment was that the papers should emphasize the artistic performance of the Ramayana, and it was decided that Dr. Bhattacharya's paper, was more in line with the seminar.' (Proceedings of the Seminar, page 3).

ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি তাঁর প্রবন্ধটিও গ্রহণ করবার জন্য অনেক যুক্তি দেখাতে লাগ্‌লেন, কোনো ফল না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা'তেও কোনই ফল হ'লো না। ভারতবর্ষে'র পক্ষ থেকে একমাত্র আমার প্রবন্ধটিই নিয়ম-সঙ্গত রূপে আলোচনার জন্য গৃহীত হ'লো। আমার প্রবন্ধটির বিষয়-বস্তু ছিল, The Ramayana in Indian Chhau Dance •

এই বিষয়ে আমার আলোচনা সকলের যে আকর্ষ'ণীয় হ'য়েছিল, তা' উক্ত কার্যবিবরণীর আরো একটি উদ্ধৃতি থেকে জান্‌তে পারা যায়। তা'তে বলা হ'য়েছে— Dr. Bhattacharya's paper was made more vivid and explanatory by the presentation of slides through which he gave more information about the Indian Chhau dances and dancers.'

বিবরণীতে এই সম্পর্কে আরো একবার উল্লেখ করা হ'য়েছে যে,— 'Dr. Bhattacharya showed 15 coloured slides to enliven the presentation of his paper.' (Proceeding page 4) তারপর যে পনরটি রঙিন ছবি দেখানো হ'য়েছিল, কার্যবিবরণীতে একে একে তাদের বিষয়গুলো উল্লেখ করা হ'য়েছে।

কোনো দেশেরই কোনো আলোচনাকারীর আলোচনার এতখানি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়নি।

আমি আমার এই আলোচনাটিকে বহু অর্থব্যয়ে নানা চিত্রশোভিত ক'রে কোলকাতার একটি অভিজাত মুদ্রাযন্ত্রে ছাপিয়ে নিয়ে গিয়ে দেশ দেশান্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ ক'রেছিলাম। সবাই বইখানি পাবার জন্য গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকেই এই আলোচনাচক্রে, হয় অংশগ্রহণকারিরূপে, নতুবা কেবল মাত্র দর্শক বা শ্রোতারূপে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন, তাদের মাধ্যমে

পশ্চিম বাংলার ছৌনৃত্যের কথা সারা পৃথিবীতে সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষকের অর্থব্যয় সেদিন পরম সার্থক হ'য়েছিল ব'লে মনে মনে আমি গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম।

চারদিন ব্যাপী আটটি অধিবেশনের মধ্যে বিভিন্ন দেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি রামায়ণের বিভিন্ন দিক, বিশেষতঃ নিজেদের দেশে প্রচলিত তার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা ক'রে পাঠ করলেন, কোনো দেশেরই একটি ভিন্ন দু'টি প্রবন্ধ গ্রহণ করা হয়নি, ভারতবর্ষেরই দু'টি প্রবন্ধ গ্রহণ করবার কথা ছিল, কিন্তু একটি প্রবন্ধ প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হ'বার জন্য বাতিল ক'রে দেওয়া হ'লো ব'লে একমাত্র আমার প্রবন্ধ এবং তার সম্পর্কিত আলোচনাই আলোচনা-চক্রে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করল। রামায়ণ বিষয়ে ভারতবর্ষের একটি গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অন্য প্রবন্ধটি স্বীকার করে নিতে সেখানে কারো আগ্রহ দেখা গেল না।

আলোচনা-চক্রে পঠিত এবং আলোচিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন ব্রহ্মদেশের শিক্ষা অধিকর্তা লিখিত 'ব্রহ্মদেশে রামায়ণ' (The Ramayana in Burma), ইন্দোনেশিয়ার অধ্যাপক শ্রীসুদর্শন রচিত 'আদর্শ নায়ক রামচন্দ্র' (Rama, the Ideal Hero and Manifestation of the good in the Indonesian Theatre), থাইল্যাণ্ডের রাজকুমার শ্রীধনিনিবাত বিদ্যা-লাভ লিখিত 'রাম-কাহিনী' (The Legend of Rama), কম্বোডিয়ার জনৈক লেখক রচিত 'খেমর রামায়ণের শিল্পরূপ' (The Artistic Performance of the Khemr Ramayana), শ্রীলঙ্কার অধ্যাপক জে. তিলকশ্রী লিখিত 'শ্রীলঙ্কায় রামায়ণের ঐতিহ্য' (The Ramayan Tradition of Ceylon) অধ্যাপক আমীন সুইনী রচিত 'মালয়েশিয়ার রামায়ণ নাটগীত' (Ramayana Dance and Music in Malaysia), জুয়ান আর ফ্রানসিস্‌কো লিখিত 'মহারাদিও লাওন' অর্থাৎ মহারাজ রাবণ বা ফিলিপাইন রামায়ণের রাবণ চরিত্র (Maharadhia Lowana), থাইল্যাণ্ডের অধ্যাপক মন্ত্রী ত্রিবদ রচিত 'থাইল্যাণ্ডের রামায়ণ নৃত্যগীত' (Ramayana Dance and Music in Thailand) ইত্যাদি।

বিভিন্ন দেশের প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন আলোচনা-চক্রের মাধ্যমে পঠিত এবং খুঁটিনাটি ক'রে আলোচিত হ'বার পর ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টার

সময় তেনজুও হোটেলের নিকটবর্তী একটি বৃহত্তর মিলয়ানতনে সর্বশেষ অধিবেশন (Plennery Session) বস্‌ল। তা'তে কতকগুলো প্রস্তাব গৃহীত হ'বার পর দেশবিদেশের যে সকল শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ক'রেছিল, তা'দের অধিনায়কদেরে একটি ক'রে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতীক উপহার দেওয়া হ'লো। ডক্টর মন্ত্র সেই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করলেন। তা'তে যে ব্যক্তিবিশেষকে কোনো পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা ছিল, তা' আমি আগে বুঝ্‌তে পারিনি। আমি সেই বিশাল সমাবেশের প্রায় শেষ সারিতে চুপ ক'রে ব'সে দেশবিদেশের প্রতিনিধিদেরে ডক্টর মন্ত্রের হাত থেকে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের এক একটি ক্ষুদ্র প্রতীক বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে হাত পেতে নিতে দেখ্‌ছিলাম। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ-উপদেষ্টা (Deputy Advisor) ডক্টর শ্রীমতী কপিলা বাৎসায়ন দলনেত্রী রূপে ভারতের প্রাপ্য প্রতীক চিহ্নটি গ্রহণ করলেন।

এমন সময় সহসা আমার নাম ঘোষিত হ'লো। সেই সভায় আমার নাম ঘোষিত হ'তে পারে, তা' আমি আগে থেকে কল্পনাও করতে পারিনি ব'লে আমি সেই ঘোষণায় কান দিলাম না। দেখ্‌লাম সভাস্থ সকলেই এদিক সেদিক তাকিয়ে যেন কা'কে খুঁজ্‌ছে। দ্বিতীয়বার আমার নাম ঘোষিত হ'লো এবং প্রকাশ করা হ'লো যে আলোচনাচক্রের শ্রেষ্ঠ অংশ-গ্রহণকারিরূপে বিবেচনা ক'রে আমাকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

এমন সময় ভারতীয় দূতাবাসের জনসংযোগকারী কর্মচারী শ্রীপ্রতাপ আমার দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে পিছনের সারি থেকে আমাকে টেনে বার ক'রে নিয়ে এসে বল্লেন, যান—আপনার পুরস্কার নিয়ে আসুন। ব'লে নিজেই আমাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে মঞ্চের নিকট নিয়ে গেলেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আমি সভাপতি ডক্টর মন্ত্রের হাত থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করলাম। ডক্টর মন্ত্র আমার করমর্দন ক'রে অভিনন্দন জানালেন। সেই অনুষ্ঠানে ভারতীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ডক্টর লোকেশ চন্দ্র, তাঁর বিদুষী ভগ্নী, ভারতের দল-নেত্রী ডক্টর কপিলা বাৎসায়ন কেউ আমাকে অভিনন্দন জানাতে এলেন না ,

তাদের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল দেখ্‌তে পেলাম। কেবলমাত্র অন্ধ্র দেশবাসী ভারতীয় দূতাবাসের জনসংযোগকারী অফিসার শ্রীপ্রতাপ উচ্চকণ্ঠে এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তাঁর দেশের একজন অধ্যাপকের কৃতিত্বের কথা সকলের কাছে ব'লে বেড়াতে লাগ্‌লেন। বহু বিদেশী এসে আমাকে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু শ্রীপ্রতাপ ব্যতীত কোনো ভারতীয় আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। বাঙ্গালী সেখানে কেউ ছিল না।

দিন দুই হ'লো ভারতীয় নৃত্যশিল্পী মাদ্রাজের কলাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী (অরুণ্ডালে) যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাপান হ'য়ে ভারতে ফিরবার পথে ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ উৎসব দেখ্‌বার জন্য এসেছিলেন, তার সঙ্গে ইতিপূর্বে একদিন আলাপও হ'য়েছিল। তিনিও মুখ গম্ভীর ক'রে বসে রইলেন। শ্রীপ্রতাপ গায়ে পড়ে তাঁর কাছে গিয়ে বল্লেন, রামায়ণ আলোচনায় ভারতের প্রতিনিধি যদি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত না হ'তেন, তবে ভারতের পক্ষে লজ্জার বিষয় হ'তো। আপনি কি বলেন ?

তিনি কিছুই বল্‌লেন না, চুপ ক'রে বসে রইলেন। তিনি আলোচনায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করুতে চেয়েছিলেন, প্রবন্ধটির একটি অনুলিপি আমাকে দিয়েছিলেন, তা'তে তিনি তাঁর কলাক্ষেত্রে রামায়ণের যে কয়েকটি নৃত্য-নাট্যের পালা তিনি নিজে রচনা ক'রেছেন. নিজেই তার সপ্রশংস বিবরণী উপস্থিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয় নি। সেই জন্য তার মানসিক অবস্থা বুঝ্‌তে পারা যায়, কিন্তু অন্যান্য ভারতীয়ের এই মনোভাব দেখে আমার মন তাদের প্রতি অত্যন্ত তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সাধারণ সৌজন্যবোধও যেন তাদের মধ্যে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। অথচ এঁরা সবাই শিক্ষিত, সরকারী অর্থে বহুবার দেশ বিদেশও ঘুরে বেড়িয়ে থাকেন !

সুরবই, পূর্ব যবদ্বীপ

পাণ্ডানের উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে বিশ্ব রামায়ণ উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হ'লো। তারপর সেই দলগুলোই ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন সহরে অনুষ্ঠান করবার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ার তিন দিকে ছড়িয়ে গেল। এই ক'দিনের মধ্যেই পাণ্ডানের মঞ্চে আমরা সবগুলো অংশগ্রহণকারী দেশেরই অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ পেলাম। এখন রামায়ণ নৃত্যোৎসব দেখ্‌বার আমাদের আর কিছু নেই। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হ'লো, ১১ই সেপ্টেম্বরের পর যদি কেউ ইন্দোনেশিয়ায় থাকৃতে চান, তবে তাকে নিজ ব্যয়ে থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে, তারা আর আমাদের ব্যয়ভার বহন করবেন না। আমার হাতে বিদেশী মুদ্রা আমার প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল। সুতরাং খুব হিসাব ক'রে না চল্‌লে আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার বালীদ্বীপ ভ্রমণ সম্ভব হবে না। সেই জন্য সব দিক থেকে ব্যয় সংক্ষেপ ক'রে চল্‌বার চেষ্টা করব স্থির করলাম।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সকাল বেলায় রুক্মিণী দেবী আমার 'হোটেল দীর্ঘায়ু'তে আমার ঘরে এসে হাজির। যে রুক্মিণী দেবী আমার পুরস্কার পাবার দিন সভায় উপস্থিত থেকেও আমাকে অভিনন্দন জানান নি ব'লে আমি তার উপর ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলাম, তিনি আমার কাছে কেন, কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না।

তিনি এসেই কাজের কথা বল্‌লেন, তিনি বল্‌লেন, আমি আজ সুরবই চলে যাব, সেখান থেকে ট্রেনে জাকার্তা যাব। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রোগ্রাম কি?

আমি বল্লাম, আমি জাকার্তা ফিরবার আগে বালীদ্বীপ ঘুরে যাব।

তিনি বল্লেন, কিন্তু আপনি ত সুরবই না গিয়ে বালীদ্বীপে যেতে পারবেন না, সেখানেই প্লেন ধরতে হবে।

আমি বল্লাম, না, প্লেনে যাবার আমার পয়সা নেই, হয়ত অন্য কোনো উপায়ে যেতে হবে।

তিনি বল্লেন, তা হলেও সুরবই হয়েই আপনাকে যেতে হবে।

আপনি বরং আজকেই আমার সঙ্গে সুরবই চলুন, এখনই আমি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করছি, ট্যাক্সিতে আমি আর আমার এক মার্কিন বান্ধবী আছেন। আপনি যদি যান, তবে আপনাকে এক তৃতীয়াংশ ভাড়া দিলেই চলবে।

আমি বল্লাম, বাসে গেলে বোধ হয় পয়সা আরো কম লাগ্‌ত, জানেন ত আমরা বিদেশী মুদ্রা কত কম পেয়েছি। তা'তে কি আর ট্যাক্সিতে বেড়ানো চলে?

শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে যেতে রাজি হ'য়ে তখনই জিনিস পত্র গুছিয়ে সুরবইর পথে রওয়ানা হ'লাম।

সুরবই পূর্ব যবদ্বীপের রাজধানী, জাকার্তা থেকে সেখানেই প্লেনে ক'রে এ'সে এক রাত্রে ত্রেতেস গিয়েছিলাম, আরও একবার রাজ্যপালের আমন্ত্রণে নৈশাহার কর্‌তে এখানে এ'সেছিলাম। পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে দুপুরের মধ্যেই সুরবই পৌঁছে গেলাম।

রুক্মিণীদেবী একজন 'থিয়োসফিষ্ট্' (Theosophist), তার স্বামী ডক্টর অরুণ্ডালে একজন খ্যাতনামা 'থিয়োসফিষ্ট' ছিলেন। সুরবইতে একটি থিয়োসফির লজ্ (lodge) ছিল, সেখানকার লজের সদস্যেরা রুক্মিণীদেবার আস্‌বার কথা আগে থেকেই জান্‌তে পেয়ে তাঁকে তাঁদের 'লজে' নিমন্ত্রণ ক'রে সেদিন একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করে-ছিলেন। তিনি 'লজে'র সেক্রেটারীর বাড়ী খোঁজ ক'রে সেখানেই গিয়ে উঠ্‌বার সঙ্কল্প করলেন, আমাকে বল্লেন, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন, ওঁদেরে জিজ্ঞেস ক'রে আপনার বালীদ্বীপে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাবে।

আমি আপত্তি করলাম না।

সুরবই থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির কর্মসচিব একজন সম্ভ্রান্ত ইন্দোনেশীয় ডাক্তার। তাঁর বাড়ীতে আগে থেকেই একটি ক্ষুদ্র সভার আয়োজন করা হয়েছিল, আমরা গিয়ে সেখানে হাজির হতেই সভার কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেল। শ্রীযুক্তা রুক্মিণীদেবা থিয়োসেফির বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। আমি রুক্মিণীদেবীর সঙ্গীরূপে সেখানে গিয়েছি ব'লে আমাকেও সবাই থিয়োসোফি-পন্থী বলে মনে করে আমাকেও সভায় কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমিও

সব ধর্মেই যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের চেতনা আছে, তা বুঝিয়ে বললাম।

সভা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না, আর কেই কিছু বললেন না। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সকলকেই সরবৎ বিতরণ করা হলো। সরবৎ পান করে সকলেই গাত্রোত্থান করলেন, কারণ, রুক্মিনীদেবীকে গিয়ে এখনই সুরাবইর গাড়ী ধরতে হবে।

সেই সভায় একজন ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম কুন্দন দাস। তিনি সুরাবইর ভারতীয় সমিতির সভাপতি। সেখানকার অত্যন্ত প্রাচীন অধিবাসী। জাতিতে সিন্ধী হিন্দু, ব্যবসায়ে বণিক। তিনি এ'সে আমাদের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলেন, আমাকে যখন বাঙালী বলে জানতে পেরেস তখন বললেন, রবীন্দ্রনাথ যখন এখানে এ'সেছিলেন তখন এ'খানকার ভারতীয়েরা যে তাকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন তার আলোকচিত্র তার ঘরে আছে। তিনি বিশেষ করে আমাকে সেই সময় তাঁর ঘরে যেতে বললেন, কারণ, তিনি জানালেন যে তাঁর গৃহে সত্য নারায়ণের পুজো হচ্ছে, সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী এখন তার গৃহে সপরিবারে উপস্থিত আছেন।

রুক্মিনীদেবী আমাকে বালীদ্বীপে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিবার জন্য কুন্দন দাসকে বললেন, তিনি বল্লেন তার জন্য চিন্তা করবেন না, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিব।

কুন্দন দাস তখনই গাড়ীতে ক'রে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু রুক্মিনী দেবীর ট্রেণের সময় আসন্ন হ'য়ে এসেছিল ব'লে তিনি নিজ বাড়ীতে না গিয়ে সোজাসুজি সুরাবই রেলষ্টেশনে এ'সে হাজির হলেন। আমিও সঙ্গে এলাম।

বিশাল ষ্টেশন। কুন্দন দাস আমাদের সকলকে নিয়ে প্লাটফরমে ঢুকলেন। দেখি একটি সুদৃশ্য ট্রেণ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। রেলের কর্মচারীরা শশব্যস্ত, এখুনি ট্রেণ ছাড়বে।

ট্রেণের ইঞ্জিনের গায়ে, বগীগুলোর গায়ে সর্বত্র লেখা 'ভীম'। এমন কি, গার্ডের টুপীর মধ্যেও লেখা ভীম, ট্রেণের মধ্যে যে সব কর্মচারী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের জামার উপরে, বুকে, কাঁধে, মাথার টুপিতে সর্বত্র লেখা ভীম।

আমি কুন্দন দাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভীম মানে কি? গাড়ীটার

নামই কি ভীম ?

তিনি বল্লেন, হ্যাঁ ঠিক তাই, এখানকার এই গাড়ীটিই রাজধানীর গাড়ী ; অর্থাৎ সুরবই থেকে রাজধানী সহর জাকার্তা পর্যন্ত যাতায়াত করে। ৩৫০ মাইলের মধ্যে কোথাও দাঁড়ায় না। সব চাইতে কম সময়ে এবং সব চাইতে আরামে যাওয়া যায় বলে টিকিটের দামও যেমন বেশী, তার চাহিদাও তেমনি।

আমি বুঝ্তে পারলাম, এই গাড়ীটি এ'দেশের রাজধানী এক্সপ্রেস। কিন্তু এ'দেশে তার নাম ভীম কেন ? আমাদের দেশে ত তার সুন্দর সহজ বোধ্য ইংরেজি-বাংলা মিশানো নাম 'রাজধানী এক্সপ্রেস'। এখানে 'ভীম' কেন ? আমি কুন্দন দাসকে এ'কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

কুন্দন দাস বল্লেন, ভীম মহাভারতের সব চাইতে দৈহিক শক্তি-শালী বীর। এই গাড়ীও বৈদ্যুতিক শক্তিতে তেমনই জোরে চলে। তাই এখানে তার এই নাম। বিমান পথের নাম দেখেন নি গরুড় ?

আমি এতক্ষণে বুঝ্তে পারলাম, এই ভীম মহাভারতের ভীম। মহা-ভারতের শক্তিশালী চরিত্র ভীমের নাম অনুসারেই এখানকার সবচাইতে বেশী বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালিত দ্রুততমগামী গাড়ীর নাম রাখা হ'য়েছে ভীম।

রুক্মিণী দেবীকে 'ভীম'-এ উঠিয়ে দিয়ে কুন্দন দাসের সঙ্গে তার বাড়ীতে এ'সে পৌঁছলাম। বিশাল দ্বিতল গৃহ। উপরের তলায় একটি গৃহে একটি গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারটি তাঁর নিজস্ব। তা'তে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে যে একদিন এখানে ভারতীয়দের 'গ্রুপ' ফটো তোলা হ'য়েছিল, তা' বাঁধিয়ে রেখে দেওয়া আছে। কুন্দন দাস বল্লেন, সুরবইর ভারতীয় সমিতির পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর রবীন্দ্র জন্মতিথি পালন করা হয়। তা'তে কিছু কিছু ইন্দোনেশীয় গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিও হাজির থাকেন। গ্রন্থাগারের গ্রন্থের সংগ্রহ থেকে মনে হ'লো, কুন্দন দাস ব্যবসায়ী লোক হ'লেও বিদ্যোৎসাহী, হয়ত বই সংগ্রহ করা তার ব্যক্তিগত সখও হ'তে পারে। কারণ, বিবিধ বিষয়—বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, প্রযুক্তিবিদ্যা কোনো বিষয়েরই বইয়ের অভাব নেই।

দোতলার আর একটি বিস্তৃত কক্ষে সত্যনারায়ণ পূজো শেষ ক'রে একজন হিন্দুস্থানী পুরোহিত সুর ক'রে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যসূচক

পাঁচালী পাঠ করছেন। সেখানে প্রায় ৭০।৮০ জন ভারতীয় হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত আছেন। তাঁরা সবাই সিন্ধী ব্যবসায়ী। আমিও কিছুক্ষণ সেখানে ব'সে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তন শুনলাম। তারপর আমার খাবার জন্য আমন্ত্রণ হ'লো। নিরামিষ খাদ্যে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন শেষ হ'লো। কুন্দন দাস একটি ঘর দেখিয়ে বল্লেন, এখানে বিছানা পাতা আছে, আপনি বিশ্রাম করুন। আজ সন্ধ্যায় আপনার বালীদ্বীপে দেন-পাসার যাবার বাস ছাড়বে। আমি টিকিট কিনে নিয়ে এ'সে যথাসময়ে আপনাকে বাসে তুলে দিব।

সন্ধ্যার সময় কুন্দন দাস তাঁর এক ছেলেকে দিয়ে আমাকে বাস ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে এক ঝুড়ি কলা ও কমলানেবু দিয়ে বল্লেন, পথে আজ রাত্রে যদি খাওয়ার কোনো সুবিধা না হয়, তবে এই খাবেন।

সন্ধ্যা ৬॥০ টায় বালীদ্বীপ অভিমুখে বাস যাত্রা করল।

দেনপাসার, বালীদ্বীপ

অনেক রাত্রে জাভা দ্বীপের উপকূল থেকে রওয়ানা হয়ে মাত্র ২০ মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে বালীদ্বীপের উপকূলে এসে পৌঁছুলাম। বেশ বড় একটা মোটর লঞ্চে করে যাত্রীশুদ্ধ তিন চারটা বাস বালীদ্বীপের উপ-কূলে যখন এনে নামিয়ে দিল, তখন সবে মাত্র শেষ রাত্রির অন্ধকার একটু ফিকা হয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। যে যায়গাটায় আমাদের নামিয়ে দেওয়া হলো, সেখানে ছোট বড় পাহাড়ের সারি, পাহাড়গুলো একেবারে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত এসে পড়েছে, ঘণ অরণ্যে সেই পাহাড়গুলো আচ্ছন্ন। সেই পাহাড়ের পাদদেশ ধরে কিছুক্ষণ আমাদের গাড়ী চলবার পর গভীর বনের মধ্যে সেই পথ গিয়ে প্রবেশ করল, চারিদিকে তখন গভীর অরণ্যের অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সারা রাত্রির জাগরণের ফলে শেষরাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন দেখতে পেলাম বনের ভেতর থেকে কখন বেরিয়ে এসেছি, চারিদকে সমতল ভূমিতে স্তরে স্তরে সাজানো সবুজ ধানক্ষেত। মনে হ'লো, সবে ধানের চারাগুলো রোপা হয়েছে, এখনও ক্ষেতে ক্ষেতে জল। তখন ভাদ্রমাস, আমাদের দেশের ভাদ্রমাসে যে

রকম বৃষ্টি হয়, বালীদ্বীপেও সেই সময় বৃষ্টি হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে দিনে এবং রাত্রে সর্বদাই প্রচণ্ড গরম। সে গরম আমাদের দেশের বর্ষা-কালের গরমের চাইতে আরও প্রবল।

কিছুদূর যেতেই কিছু কিছু বাড়ীঘর চোখে পড়তে লাগল। বালীদ্বীপে এসে পৌঁছে অবধি এপর্যন্ত একটিও বাড়ী-ঘর চোখে পড়েনি। প্রথমে পাহাড়, তারপর ঘন অরণ্য, তারপর ধানক্ষেত এবং ধানক্ষেতের প্রান্ত ধরে ঘন নারকেল-বন। ধানক্ষেতগুলো যদি আমাদের দেশের মত সমতল ভূমির উপর থাকতো, তা' হলে দেশটিকে পুরোপুরি আমাদের দেশ বলেই মনে করতে পারা যেত। কিন্তু অসমতল ভূমিতে ধানক্ষেতগুলো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। ধানক্ষেতগুলোর প্রান্তভূমিতে যদি নারকেল-বনের ঘন কুঞ্জ না থাকত, তা' হলেও ধানজমিগুলো দেখে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার ধানজমি-গুলোর কথা মনে করা যেত।

যাই হোক, যে কথা বল্‌ছিলাম, ক্রমে কিছু কিছু বাড়ী-ঘর চোখে পড়তে লাগল। ধানক্ষেতের শেষপ্রান্তে নারকেল বনের ছায়ায় প্রথম যে বাড়ীটি চোখে পড়েছিল, তা' দেখে বুঝতে পারিনি এটি কোনও গৃহস্থের বাড়ী না মন্দির। ক্রমে যতই যেতে লাগলাম, কেবলই মন্দিরের আকৃতি বাড়ী-ঘর চোখে পড়তে লাগল। আমি ভাবলাম, সারা দেশ জুড়ে এখানে এত মন্দির তৈরী করে রাখবার কারণ কি? গৃহস্থের বাড়ীঘর তা' হলে কোথায়?

এক জায়গায় এসে বাস দাঁড়াল, সামনেই দেখতে পেলাম কয়েকজন শিল্পী নরম বালি-প্রস্তরে (sand stone) খোদাই ক'রে কয়েকটি মূর্তি তৈরী করছে। বাস থেকে নেমে নিকটে গিয়েই বুঝতে পেলাম, শিল্পীরা কয়েকটি পাথরের দেবমূর্তি তৈরী করছে, উচ্চতায় সেগুলো সাধারণ মানুষের মত, অর্থাৎ ৫ ফুট থেকে ৬ ফুটের মত। লক্ষ্য করে দেখলাম, মূর্তিগুলোর মধ্যে কয়েকটি গরুড়-বাহন বিষ্ণুমূর্তি, কয়েকটি অগস্ত্যের মূর্তি, দু' তিনটি গণেশমূর্তি আরেকটি অত্যন্ত বিকটাকার পুরুষমূর্তি, জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলাম সেটি কুবেরের মূর্তি। ভারতবর্ষ থেকে এতদূর পথ এসে এক অজানিত রাজ্যে ভারতীয় হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্তি অপূর্ব নিপু-ণতার সঙ্গে সেখানে তৈরী হতে দেখতে পেয়ে আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। কারণ, ভারতবর্ষেও আমি এতগুলো হিন্দুমূর্তি কোথাও একসঙ্গে

তৈরী হতে দেখিনি। এমন কি, পাথরে হিন্দুমূর্তি নির্মাণের ধারা (tradition) আমাদের দেশে লুপ্ত হয়ে গেছে বল্লেই হয়।

আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো দিয়ে কি হবে? আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, এগুলো ভারতবর্ষে রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করবার উদ্দেশ্যেই তৈরী হচ্ছে।

কিন্তু শুনে অবাক হলাম, বালীদ্বীপে যে নূতন পথঘাট তৈরী হচ্ছে তাদের শোভা বর্ধনের জন্য এগুলোকে স্থাপন করা হবে, এই উদ্দেশ্যে সরকারী ঠিকাদার তাদের এগুলো নির্মাণ করবার জন্য নিযুক্ত করেছে। এ'রকম শত শত মূর্তি তারা নির্মাণ করেছে, সেগুলো ইতিমধ্যে পৌরপ্রতিষ্ঠানের নানা উদ্যান এবং পথঘাটের ধারে ধারে বসান হয়েছে।

এ কথা সকলেই জানেন, ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপ এবং অন্যত্র মোট দশ কোটি মুসলমান বাস করে। মাত্র এক কোটি হিন্দু বালী দ্বীপের অধিবাসী। যদিও সেখানে মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তথাপি বালী দ্বীপের হিন্দু অধিবাসীদের ধর্মকর্মে রাষ্ট্র কোনও হস্তক্ষেপ করে না। শুধু তাই নয়, পূর্ব যবদ্বীপের বহু সরকারী আবাসে, এমন কি, সরকারী আপিসে আদালতেও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতবর্ষে যেমন পাঠান এবং মোগল রাজত্বে হিন্দুর মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্তিগুলো আক্রমণ এবং ধ্বংসের লক্ষ্য হয়েছিল, ইন্দোনেশিয়ায় কদাচ তা হয় নি। এখানকার অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দুর যে সংস্কৃতি তাদের জাতীয় জীবনের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছিল, তাকে আজ পর্যন্তও রক্ষা ক'রে চলেছে।

জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলাম, যে-মন্দিরাকৃতি গৃহগুলো পথের দুধারে দেখে এসেছি, সেগুলো প্রকৃতই মন্দির, তবে মন্দিরের সংলগ্ন, মন্দিরের আকারেই তাদের গৃহও তারা নির্মাণ করে, মন্দির থেকে বাসগৃহকে তারা পৃথক্‌ভাবে নির্মাণ করে না। সেইজন্যই আমাদের চোখে তাদের এক একটি পাড়া মন্দিরময় মনে হয়।

প্রত্যেক গৃহেই একটি মন্দির, মন্দিরের সামনে একটি চত্বর। সেই চত্বরে প্রতিদিন দেবতার উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়েদের নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। বিবাহিতা মেয়েদের নৃত্য সেখানে নিষিদ্ধ, সেই জন্যই সেখানকার নৃত্য বালিকাদের নৃত্য আমাদের দেশের মত যে কেউ সেখানে নাচতে পারে না।

দেনপাসারে গিয়ে পৌঁছে জাতীয় নৃত্য আকাদেমির অধ্যক্ষ (সম্ভবতঃ ডিরেক্টর কিংবা ডেপুটি ডিরেক্টর) শ্রীযুক্ত পাঞ্জীর কাছে আমার আগমন বার্তা জানালাম। কারণ, আগেই বলেছি, তিনি আমাকে তাঁর প্রতিষ্ঠান দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে স্থির হল, পরের দিনই সকাল ৭ টার পর তাঁর প্রতিষ্ঠান দেখতে যাব। যথাসময়ে তিনি একটা গাড়ী পাঠিয়ে দিবেন।

আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসবে ইন্দোশিয়ার যে কয়েকটি রামায়ণনৃত্য দেখেছিলাম, তাতে বালীদ্বীপের একটা বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছিল, তা অতি সহজেই অনুভব করেছিলাম। বিশেষত্বটি এই যে তাদের নৃত্যানুষ্ঠানটি যেন আগাগোড়া একটা গীতি-কবিতার সুরে গাঁথা। তার সৌন্দর্য লাবণ্য ও রস অন্যান্য অঞ্চলের নৃত্যের তুলনায় স্বতন্ত্র। সুতরাং সেই নৃত্য কোথায় এবং কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা নিজের চোখে দেখবার জন্য স্বভাবতই কৌতূহল হয়েছিল।

বালীদ্বীপের জাতীয় নৃত্য আকাদেমির দ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে একটা বিরাট তোরণের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। তোরণটি-প্রস্তর নির্মিত ও তাতে নানা হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত, ভিতরে যে বিশাল ভবনটি রয়েছে বাইরের দিক দিয়ে তাতেও রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ।

আমাদের একটি সংস্কার এই যে দেব-দেবীর মূর্তি পাথরে উৎকীর্ণ দেখলেই তা প্রাচীন হবে তাই মনে হয়। সেইজন্য এই ভবনটি কোন্ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে আমি ডঃ পাঞ্জাকে তা জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলাম। কারণ, তার স্থাপত্য কীর্তি আমার প্রাচীন বলে মনে হলো।

তিনি বললেন, ৩।৪ বৎসর পূর্বে এর নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে। এটা প্রাচীন নয়, এ সম্পূর্ণ আধুনিক।

ভারতবর্ষে কোনো সরকারী শিক্ষাভবনে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা যে কত অসম্ভব, তা সকলেই জানেন। যদিও ইন্দোনেশিয়ার ১১ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ১০ কোটিই মুসলমান, তথাপি সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যথার্থ শিক্ষার কেন্দ্রস্থলরূপে গণ্য করবার উদ্দেশ্যেই তাদের জাতীয় শিক্ষাভবনের মধ্যেও জাতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন এমনিভাবে রক্ষা করা হয়েছে।

ডঃ পাঞ্জী আমাকে তার আপিস গৃহে নিয়ে বসালেন এবং শিক্ষা-দানের সমস্ত প্রণালী বুঝিয়ে দিলেন। বিশাল ভবনটির কক্ষে কক্ষে তখন নৃত্য এবং নৃত্য সম্বলিত বাদ্যের বিভিন্ন ক্লাস সুরু হয়ে গিয়েছিল; জানতে পারলাম, সকাল ৬ টা থেকে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত ক্লাস হয়। বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের রুটিন মত এসে পড়ে যায়। এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই উচ্চতর মাধ্যমিক, কলেজের কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীও আছেন। এমন কি, অনেক সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীও আছেন। প্রত্যেকেই নিজের সুযোগ ও সময়মত নৃত্যশিক্ষা লাভ করবার জন্য সরকারী নৃত্য আকাডেমিতে ভর্তি হয়েছেন।

ডঃ পাঞ্জী এবার আমাকে ক্লাসগুলো ঘুরে দেখবার জন্য নিয়ে বের হলেন। তার কয়েকজন সহকর্মীও আমাদের সঙ্গী হলেন। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি জেনে এঁরা প্রত্যেকেই খুব উৎসুক হলেন এবং ভারতে নৃত্যশিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে, তা আমার কাছে শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। ডঃ পাঞ্জী স্থির করলেন, ক্লাসগুলো দেখে আসার পর আমি এই বিষয়ে তাঁদেরে কিছু বলব। এদের সকলেই কিছু কিছু ইংরেজী জানেন।

প্রথমে একটি ক্লাসে গিয়ে ঢুকলাম। তাতে ছায়ানাটক (Shadow play) শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ক্লাসে প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী। তারা শিক্ষকের বক্তৃতা কিছু কিছু খাতায় লিখে নিচ্ছে। একজন তরুণ বয়স্ক শিক্ষক ছায়ানাটকের একটা ক্ষুদ্র মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে কি ভাবে আলোর সামনে চামড়ার পুতুলগুলো নাড়াচাড়া করতে হয়, তা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আমরা ঘরে ঢোকা মাত্র আমাদের সম্মানার্থে সকলে উঠে দাঁড়াল।

আমিও তাদের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম, ডঃ পাঞ্জী ও তাঁর সহকর্মিগণও আমার সঙ্গে বসলেন। আবার শিক্ষাদান চলতে লাগল। ইন্দোনেশীয় ভাষায় শিক্ষক মধ্যে মধ্যে কিছু বোঝাচ্ছিলেন। ডঃ পাঞ্জী তার সারমর্ম আমাকে কিছু কিছু বুঝিয়ে দিলেন। ছায়ানাটকের বিষয়-বস্তু রামায়ণ। এর পদ্ধতিটি ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশ ও মালয়েশিয়ায় গেছে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে আজ প্রায় তা লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় তা পুরোপুরি রক্ষা পেয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে তরুণ শিক্ষকের দুর্বোধ্য ইন্দোনেশীয় ভাষায় শিক্ষা-

দান প্রণালী লক্ষ্য করলাম। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যে আন্তরিকতা দেখতে পেলাম, তা আমাকে অভিভূত করল। অথচ এই কথা সকলেই বুঝতে পারেন যে এই বিদ্যা লাভ করে তরুণ শিক্ষার্থীদের অর্থ উপার্জনের কোনো উপায় হবে না। কেবলমাত্র দেশের ঐতিহ্যকে তাদের জীবনের শিক্ষার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করবার জন্যই তাদের এই আন্তরিকতা প্রকাশ পাচ্ছে!

তারপর আর একটি ক্লাসে গিয়ে প্রবেশ করলাম। সেখানে বারং নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বারং একটি চতুষ্পদ ভীষণাকার জন্তু। এর একটি বিশাল মুখোস ও পোষাক আছে। একজন ব্যক্তি এর পোষাকের ভিতর আত্মগোপন করে মুখের দিকে দাঁড়িয়ে অভিনয় কৌশলে সেই অতিকার জন্তর মুখটিকে একবার হাঁ করাচ্ছে, আর একবার বন্ধ করছে। তাতে খট্ খট্ করে এক প্রকার শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দে নৃত্যের তাল রক্ষা পাচ্ছে। আর একটি ব্যক্তি তেমনি জন্তুটির পেছনের দিকে সর্বাঙ্গ পোষাকে গোপন করে সম্মুখের ব্যক্তির সঙ্গে তাল রক্ষা করে এমন ভাবে নাচছে যে তাতে মনে হচ্ছে বারং নামক সেই অতিকায় জন্তুটি বিকট মুখভঙ্গী করে নেচে নেচে তার শত্রুকে আক্রমণ করছে। বারং জন্তুটির সঙ্গে একটি বীর চরিত্রের সংগ্রাম-ই নৃত্যের বিষয়। বীর চরিত্রটিকে সাধারণতঃ বলা হয় ভীম। ভীম হিড়িম্ব এবং বক নামক রাক্ষসকে বধ করে ছিলেন—মহাভারতে এ রকম কাহিনী আছে সত্য, কিন্তু বারং নামক কোনো অতিকায় জন্তুকে বধ করেছিলেন, মহাভারতে এমন কোনো কথা নেই। সম্ভবতঃ হিড়িম্ব কিংবা বক ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে কোনো স্থানীয় উপকথার সঙ্গে সংমিশ্রণ লাভ করে বারং নামক এক অতিকায় জন্তুতে পরিণত হয়েছে। বারং এবং তার প্রাণনাশকারী ভীম উভয়ের নৃত্য বালী নৃত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। মুখোস-শুদ্ধ বারংয়ের পরিচ্ছদটিও বালীদ্বীপের শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে।

তারপর যে ক্লাসে এসে উপস্থিত হলাম, তাতে গামেলিন বাদ্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। গামেলিন বাদ্যযন্ত্রের অভিনবত্ব বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র রামায়ণ-নৃত্য একমাত্র তারই সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোনো বিদেশী, এমন কি, ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রও তাতে ব্যবহৃত হয় না। শুষির যন্ত্র, এমন কি, একটি মাত্র ক্ষুদ্র ঢোল

ব্যতীত আর কোনো আনদ্ধ যন্ত্রও নেই। এতে যে যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়, তা আমাদের দেশের ঘনযন্ত্র অর্থাৎ করতাল খটতাল মন্দিরা কাঁসী কাঁসর কিংবা ঘণ্টাও নয়। অথচ তার প্রত্যেকটা যন্ত্রই ধাতু-নির্মিত। প্রধানতঃ কাঠির সাহায্যে ধাতু নির্মিত কতকগুলো বাটির ওপর আঘাত করে এর সুমিষ্ট সুরটি সৃষ্টি করা হয়। তা শিক্ষা করবার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, অনেকক্ষণ ধরে তা লক্ষ্য করলাম। তাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সব চাইতে বেশী দেখতে পেলাম। প্রায় ১০০ জনের মত হবে, শিক্ষকের নির্দেশে তারা টেবিলের ওপর কাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে তাল রেখে বাদ্য শিক্ষা করছিল। কারণ, ১০০ জনের ব্যবহার করবার উপযোগী গামেলান বাদ্যযন্ত্র তাদের ছিল না। তাতে একটি কোনো বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা বাদ্য সৃষ্টি হয় না। তাতে বিভিন্ন আকৃতি এবং প্রকৃতির ধাতব বস্তুর ওপর আঘাতের সমবায়ে একটি সুর সৃষ্টি হয়। সেই সুরটির মিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে একটি পবিত্রতার ভাব এমন ভাবে মিশ্রিত হয়ে থাকে, যা কেবলমাত্র মন্দিরের দেবপূজারই উপযোগী।

প্রায় দ্বিপ্রহর হয়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তবু অনেক ক্লাস দেখা বাকী রইল। তারপর আপিস ঘরে ফিরে এসে উপস্থিত একাডেমির কিছু ছাত্রছাত্রী এবং নৃত্য শিক্ষকদের সামনে বর্তমান ভারতীয় নৃত্যের অবস্থা সম্পর্কে আমার যা জ্ঞান, তার উপর নির্ভর ক'রে কিছু বললাম।

ডঃ পাঞ্জী বালীদ্বীপের কতকগুলো গ্রাম্য মন্দিরে গিয়ে আমাকে নৃত্য দেখবার পরামর্শ দিলেন। তার ফলে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেনপাসার সহর থেকে ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত গ্রামের মন্দির-প্রাঙ্গণে যে দিন যে নৃত্য হত, আগে থেকে তার সংবাদ নিয়ে সেইখানে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত সেই নৃত্য দেখতাম। বালীদ্বীপের গ্রামে মন্দির প্রাঙ্গণে যে নৃত্য এখন অনুষ্ঠিত হয়, তাই বালীদ্বীপের ঐতিহ্যমূলক নৃত্য। তার ধারা আজ পর্যন্ত সেখানে অবিচ্ছিন্ন আছে। সেই নৃত্যই জাতীয় নৃত্য আকাডেমিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে গ্রাম্য পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে যে নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তা এর থেকে স্বতন্ত্র।

দেনপাসারে এ'সে আমি একটি ছোট্ট হোটেলে উঠেছিলাম। তা'কে যথার্থ হোটেলও বলা যায় না, প্রকৃতপক্ষে তা' বালীদ্বীপের একজন হিন্দুর

বাড়ীর বহির্ভাগ ; তা'তে তিনটি ছোট ছোট ঘর অতিথিদেরে ভাড়া দেওয়া হয়। আমি যখনই সুরবই থেকে দেনপাসারে এ'সে বাস থেকে নামি, তখনই একব্যক্তি আমি হোটেলে থাক্‌ব কি না জান্‌তে চাইল। কুন্দন দাস আমাকে দেনপাসারের একটি হোটেলের ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন, আমি তার সন্ধান ক'রে সেখানেই যাব স্থির ক'রেছিলাম, কিন্তু সেই ব্যক্তি এক রকম গায়ে পড়েই তার 'হোটেলে' যাওয়ার জন্য অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। দেখ্‌লাম হোটেলটি বাস ষ্ট্যাণ্ডের একেবারেই সংলগ্ন। বিশেষ কিছু চিন্তা না ক'রেই তার সঙ্গে গিয়ে তার বহির্বাটির একটি কুঠুরির মধ্যে আশ্রয় নিলাম। ভাড়া দৈনিক পাঁচ শ' রুপায়া, আমাদের টাকার হিসাবে দশ টাকা মাত্র। এত সস্তায় আর কোথায় থাকতে পারা যাবে ভেবে সেখানেই আশ্রয় নিলাম। তবে সেখানে খাবার ব্যবস্থা কিছু নেই। অন্যত্র খাবার সন্ধান কর্‌তে হ'বে। দেখ্‌লাম, নিকটেই অনেক সস্তা দরের রেস্তোরাঁ ও হোটেল আছে ; এমন কি, অভিজাত একটি হোটেল 'হোটেল বালী'ও সেখান থেকে বেশী দূরে নয়। প্রয়োজন মত সেখানেও খাবার ব্যবস্থা করা যেতে পার্‌বে। আমার গৃহকর্তা (তাঁকে হোটেলের মালিক না ব'লে গৃহকর্তা বলাই ভাল) বল্লেন, কাছেই একটি 'ভারতীয় হোটেল'ও আছে, তার নাম মহারাজা হোটেল, প্রয়োজন মত আমি দৈনিক সেখানেও আহারাদি সম্পন্ন কর্‌তে পারি।

সুতরাং বিশেষ কিছু বিবেচনা না ক'রে সেখানেই আশ্রয় নিলাম। সেখানে কোনো মতে রাত্রিবাস করা যায়, কিন্তু ব'সে এক দণ্ডও বিশ্রাম করা যায় না। কারণ, গৃহে একটি তক্তাপোষ ছাড়া আর কোনো আসবাব পত্র নেই, পাখা নেই, একটি বৈদ্যুতিক আলো মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছিল, তার উপর প্রচণ্ড মশার উপদ্রব। মশার জন্য মশারি নেই। গৃহকর্তা জানিয়ে গেলেন, কাছেই দোকানে মশকনিবারণী ধূপ কিন্‌তে পাওয়া যায়, তা' কিনে নিয়ে এ'সে সারা রাত্রি জ্বালিয়ে আমি ঘুমোতে পারি। মশক-নিবারণী ধূপের দাম প্রতি রাত্রির জন্য এক শ' রুপায়া অর্থাৎ আমাদের দেশের টাকার হিসাবে দু'টাকা। ভাবলাম, যাই হোক, আমার নিকট বিদেশী মুদ্রার পুঁজি যখন নিতান্ত কম, তখন আমার দুঃখকষ্ট সহ্য করা ছাড়া উপায় কি ? কারণ, আমাকে বালীদ্বীপের গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক কিছু দেখ্‌তে হবে, তা'তে কতদিন লাগে, কত টাকা ব্যয় হয়, কে জানে ?

ডাঃ পাঞ্জীর নৃত্য আকাদেমি দেখে আসবার পরের দিন সকালেই তাঁর কাছে আবার গিয়ে হাজির হ'লাম, কারণ, তিনি বলেছিলেন, বালী দ্বীপের যে কয়েকটি গ্রামে তখন নানা ধরণের নৃত্যের অনুষ্ঠান চল্‌ছিল, তিনি সে সব জায়গায় আমার যাবার একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

তাঁর কাছে যেতেই তিনি বল্লেন, মিসেস্ লীলা দয়াল দেনপাসারে এ'সেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, আপনার ঠিকানাটি যদি দেন, তবে তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে পারেন। আমিও ভাবছি, আপনারা দু'জনেই এক সঙ্গে গ্রামে গিয়ে প্রতি রাত্রেই নাচ দেখ্‌তে পারেন।

আমি বল্লাম, আমি ত নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই, আমার ঠিকানায় গিয়ে তিনি আমাকে পাবেন না, বরং আপনিই তাঁর ঠিকানাটি আমাকে দিন, আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করি।

মিসেস্ দয়াল পাণ্ডানে আমার সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছিলেন, সে কথা ডাঃ পাঞ্জী জান্‌তেন।

বল্‌তে বল্‌তেই শ্রীমতী লীলা দয়াল সেখানে এ'সে হাজির হ'য়ে গেলেন, তিনি আমাকে দেখে সোৎসাহে বলে উঠ্‌লেন, আমি এখানে এ'সেই আপনাকে খুঁজছি, ভাবলাম ডাঃ পাঞ্জীর কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিব, তাই প্রাতরাশ খেয়েই এখানে ছুটে এ'সেছি। বলুন, আপনার এখানকার প্রোগ্রাম কি, চলুন আমরা দু'জনে এক সঙ্গেই একটা প্রোগ্রাম ঠিক করি, তা'তে দু'জনেরই সুবিধা হ'বে। ডাঃ পাঞ্জী আমাদের সাহায্য কর্‌বেন।

ডাঃ পাঞ্জী একটি মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি-পত্র বার করলেন, তা' দেখে কোন্ গ্রামে কবে কখন কি নৃত্য হ'বে তা আমাদেরে জানিয়ে দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে সব গাঁয়ে যাতায়াতের কি ব্যবস্থা হ'বে?

তিনি বল্লেন, ট্যাক্সি ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

শ্রীমতী দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা বিদেশী অতিথি, আমরা ট্যাক্সির এত পয়সা কোত্থেকে দেব? আপনি আমাদের একটা গাড়ীর ব্যবস্থা কর্‌তে পারেন না?

কথাটা আমারও মনের কথা, তবু আই. সি. এসের. পত্নী দ্বারা কথাটা তুল্‌লে ফল হতে পারে বিবেচনা ক'রে আমি চুপ ক'রে রইলাম, ডাঃ

পাঞ্জীর জবাব শুন্‌বার জন্য উৎসুক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু তিনি নিরাশ কর্‌লেন, বল্লেন, আমাদের ত গাড়ী নেই, আমার নিজেরও গাড়ী নেই, সুতরাং এ' বিষয়ে আপনাদেরে সাহায্য কর্‌তে পারব না ব'লে দুঃখিত। আপনাদেরে ট্যাক্সি ক'রেই যাতায়াত কর্‌তে হবে। ট্যাক্সিওয়ালাকে এই তালিকাটি দেখে গ্রামের নাম বল্লেই সে আপনাদের নিয়ে যাবে, তারপর সেখানে যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বে, অনুষ্ঠান শেষ হ'লে আপনাদেরে হোটেলে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। টুরিষ্টরা এই ভাবেই যাতায়াত করে। আপনাদেরও তা' ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আজকে রাত্রে একটা গ্রামে বারোং নৃত্য হবে, নৃত্যটি দেখ্‌বার মত। আপনারা গিয়ে দেখে আসুন। আপনারা দু'জন এক সঙ্গে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না।

শ্রীমতী দয়াল বল্লেন, অসুবিধা ত হবে না বল্‌ছেন, ট্যাক্সির ভাড়া ত এখানে কত বেশি তা' জানেন, এত টাকা আমরা কোথায় পাব ?

ডাঃ পাঞ্জী খুব বিনীত ভাবে বল্লেন, কোনো উপায় থাক্‌লে আমি নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করতাম, কিন্তু আমি নিরুপায় হ'য়েই এ' কথা বল্‌ছি, বরং আপনাদের সঙ্গে আমি আমার একজন লোক দিতে পারি, যাতে ট্যাক্সিওয়ালা আপনাদেরে যথাস্থানে নিয়ে যায় এবং অযথা বেশি টাকা দাবী না করে, তা' সে দেখ্‌তে পারবে। ট্যাক্সিতে যাবার সময় আপনাদের এই পথ দিয়েই যেতে হ'বে, যাবার পথে এখানে নেমে সঙ্গে আমার একজন লোক নিয়ে যাবেন।

শ্রীমতী দয়াল শেষ পর্যন্ত তা'তেই রাজি হলেন। ডাঃ পাঞ্জী বলে দিলেন, সন্ধ্যা ৬ টার সময় এই পথে যাবার সময় এখান থেকে একজন লোককে তুলে নিব, সে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরে হোটেলে পৌঁছে দিবে। যদি ট্যাক্সি পেতে অসুবিধা হয় তবে তাঁকে টেলিফোন কর্‌লেই তিনি ট্যাক্সির ব্যবস্থা ক'রে দিবেন।

সেখান থেকে উঠ্‌তেই শ্রীমতী দয়াল বল্লেন, আমার হোটেলটি নিকটেই, চলুন, সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি। আপনার কোনো কাজ নেই ত ?

আমি বল্লাম, না, কাজ আর কি ? চলুন!

বলে দু'জনেই হেঁটে চল্লাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার হোটেলটি কেমন ?

তিনি বল্লেন, মন্দ নয়, দেখবেন চলুন। কিন্তু লোকটা কি কঞ্জুস জানেন ? বলে এক হাজার রুপায়ার কম কিছুতেই দেবে না! আমি বল্লাম, বাপু, থাক্‌ব আমি একা, তা'ও সারা দিন ঘুরে বেড়াব, 'ব্রেক ফাষ্ট' খেয়ে সেই যে বেরুব, তারপর রাত্রের ডিনার কোথাও শেষ ক'রে নিয়ে কোনোদিন একটা কিংবা কোনোদিন রাত্রি দু'টোয় হোটেলে ফিরব, তোর ঘর ত অমনি পড়ে থাক্‌বে। তবু এত টাকা দাবী কেন ? তারপর অনেক বলে করে ভয় দেখিয়ে ধমক দিয়ে দু'শ রুপায়া কমিয়ে ফেলেছি, প্রাতরাশ সহ আটশ রুপায়াতেই স্যুটটা পেয়েছি।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার হোটেলটা কোথায় ?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'হোটেল বালী'র কাছেই। কিন্তু 'হোটেল বালী' পর্যন্ত বলবা মাত্র তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, ওঃ তা' হ'লে ত খাসা হোটেল, তা' হ'লে ত কোনো কথাই নেই।

অর্থাৎ তিনি মনে করলেন, আমি 'হোটেল বালী'তে আছি ; সম্ভবতঃ সেই বয়সে তিনি কানেও কম শুন্‌তেন। আমি তাঁর ভুল ভাঙ্গাতে গেলাম না। ভাবলাম, আমি যে 'হোটেল'টিতে আছি, তা' ত আর বল্‌বার মত নয়, তাই তিনি যদি নিজে থেকেই বুঝে থাকেন যে আমি 'হোটেল বালী'র মত একটি অভিজাত হোটেলে আছি, তা' হলে আমার তা'তে বল্‌বার আর কি আছে! কিন্তু তা'তেই শেষ পর্যন্ত এক বিপদ হ'য়েছিল, সে কথা পরে বল্‌ব।

গিয়ে দেখি, শ্রীমতী দয়াল যে হোটেলটিতে আছেন, তা' সুন্দর বাগানঘেরা একটি একতলা বাড়ী। বাড়ীটির চারদিকে চারটি স্যুট, প্রত্যেকটি স্যুটের সাম্‌নে এক একটি ছোট্ট বারান্দা। ফুলের টব, দেয়াল ছবি, জানালায় জাপানী রঙিন পর্দা দিয়ে মনোরম ক'রে সাজানো।

দু' জনে দু'টো চেয়ার টেনে বসা গেল। শ্রীমতী দয়াল বল্‌লেন আজ বিকেলে আমিই ট্যাক্সি নিয়ে আপনাকে তুলে নেবার জন্য 'হোটেল বালী'তে যা'ব······

আমি একবার ঢোক গিলে বল্‌লাম, ও, হ্যা, হোটেল বালী, আমি

তৈরী হ'য়ে থাকব।

তিনি বলে যেতে লাগ্‌লেন, হ্যা, আপনি তৈরী হ'য়ে থাক্‌বেন, তারপর একাডেমি থেকে ডাঃ পাঞ্জীকে নিয়ে গ্রামের পথে নাচ দেখ্‌বার জন্য রওয়ানা হব। কেমন ঠিক ত?

আমি বল্লাম, হ্যা নিশ্চয়ই ঠিক। তবে পাঞ্জী যাবেন না, তার একজন লোক যাবে। তিনি বল্লেন, হঁ্যা, তাঁর একজন লোক।

তিনি বল্‌তে লাগলেন, আমার বিপদটা কি জানেন, আমি একা ঘুরে বেড়াই। বোম্বেতে আমার মালাবার হিলের উপর আমার পৈতৃক বাড়ী, সেখানকার একটা ফ্লাট নিজের জন্য তালা দিয়ে রেখে বাকি সবটা গভর্ণমেণ্টের কাছে ভাড়া দেওয়া আছে, ভাড়া মাসে মাসে ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে। আমার বাবার আমি একমাত্র সন্তান, তিনি খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁর ব্যবসায়ী কোম্পানী থেকেও আমি লভ্যাংশ পাই, তাও ব্যাঙ্কে জমা হয়। রানীক্ষেতে আমার স্বামী বাড়ী করেছিলেন, তারও একটি অংশ আমি আমার নিজের জন্য বন্ধ ক'রে রেখে বাকি অংশ ভাড়া দিয়েছি, সে টাকাও ব্যাঙ্কে জমা হয়।

আমার এত টাকা, কিন্তু একজন জোতিষ আমাকে কি বলেছে জানেন?

আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, কি বলেছেন?

তিনি বল্লেন, আমি আর মাত্র তিন বছর বাঁচব।

আমি হেসে বল্লাম, আপনি জ্যোতিষের কথা বিশ্বাস করেন?

তিনি অকপটে বল্লেন, করি, খুব করি। আমার স্বামীর মরবার আগেও জ্যোতিষ বলেছিল, তাঁর কোন্ বছর মৃত্যু হবে। আমার স্বামী বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু তাঁর সেই বছরই মৃত্যু হ'লো। আশ্চর্য্য! তারপর থেকে আমিও বিশ্বাস করি। তাই এই তিন বছরের মধ্যে আমি আমার টাকা যত পারি সব খরচ ক'রে যেতে চাই।

তাঁর কথা শুনে আমি মনে মনে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লাম, ভাবলাম, যত দিন তাঁর সঙ্গ লাভ করি, তত দিনই ভাল। তাঁর টাকায় ভাড়া করা ট্যাক্সিতে আমি সারা বালীদ্বীপ ঘুরে বেড়াতে পারব। হয়ত দু' একদিন 'ডিনার' 'লাঞ্চ' 'ব্রেক্ ফাষ্টে'র খরচাটাও আমার বেঁচে যেতে পারে।

প্রকাশ্যে বল্লাম, না, না, তা' কি কখনো সম্ভব হয়? আপনার

স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ ঘটে গেছে, তাই ব'লে জ্যোতিষের সব কথা সত্য হ'তে পারে না। আপনি এখনো অনেক দিন বাঁচ্‌বেন, তা' আপনাকে দেখেই আমি বল্‌তে পারি।

তিনি তা'তে সান্ত্বনা লাভ কর্‌লেন না, বরং দৃঢ় চিত্তে বল্‌লেন, না, তা' নয়। একাধিক ভাল জ্যোতিষ এ' কথা বলেছেন, তাদেরে আমি অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না, তাই এই তিনটা বছর পৃথিবীর আর যে ক'টা দেশ আমার ঘুরে বেড়ানোর বাকি আছে, সেগুলো ঘুরে বেরিয়ে দেখ্‌তে চাই। জানেন, দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ানোতে আমার বড় আনন্দ। স্বামীর সঙ্গে কত দেশ ঘুরেছি, তবু যেন আমার সেই পিপাসার নিবৃত্তি নেই। বরং তা'তেই যেন এই পিপাসা আমার বেড়েছে, তা' একটা অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে গেছে।

নিঃসন্তানা বৃদ্ধার কথা শুনে দুঃখ হ'ল, বল্লাম, হয়ত তাই।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি 'মহারাজা হোটেলে'র সন্ধান করতে গেলাম, কারণ, সেখানে আমাকে দ্বিপ্রহরের আহার শেষ ক'রে আবার সন্ধ্যার আগেই 'হোটেল বালী'র সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

দেখলাম, 'মহারাজা হোটেল'টি আমি যে জায়গায় আছি, তা' থেকে দূরে নয়। সেখানে গিয়ে হাজির হ'য়ে জান্‌তে পেলাম, মাত্র কিছু দিন আগে একজন স্থানীয় গুজরাটি ব্যবসায়ী তা আরম্ভ ক'রেছেন। তার ভাই একজন তরুণ গুজরাটি তার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত।

আমাকে দেখে ভারতীয় বলে জান্‌তে পেয়ে তরুণ গুজরাটি অত্যন্ত খুসী হ'লো। বল্ল, আপনার যত দিন খুসি এখানে খাওয়া দাওয়া করতে পারেন। সব রকম ভারতীয় খাদ্য এখানে পাওয়া যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা কয়লাম, ভারতীয় হোটেল এখানে কেমন চল্‌ছে?

সে বল্ল, একেবারেই চল্‌ছে না, আমরা নূতন আরম্ভ করেছি কি না, তাই তার সংবাদ বিশেষ কেউ এখনো রাখে না। দু' এক মাসের মধ্যেই চালু হ'য়ে যাবে। তবে তার আগে আরো আসবাবপত্র বাড়াতে হবে, আরও সাজ সরঞ্জামের দরকার হবে, তার জন্য আরো দু' লাখ রুপাইয়ার দরকার।

আমি চম্‌কে উঠে বল্‌লাম, দু' লাখ?

সে বল্লে টাকা নয়, রুপাইয়া অর্থাৎ আমাদের টাকার হিসাবে চার শ' পাঁচ শ' টাকা হ'বে।

আমি বল্লাম, সে আর বেশী কি টাকা ?

সে বল্ল, হোটেল থেকে এখনো কোনো লাভ হ'চ্ছে না, তবে আমাদের পরিবারে যে কয়জন লোক আছে, তাও ছেলেপেলে নিয়ে ১০।১২ জন হবে, আমরা এখানে রোজ দু'বেলা খাওয়া দাওয়া করি, বাড়ীর মেয়েদের কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না, সম্প্রতি তাই লাভ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভারতীয় হোটেল এখানে না চল্‌বার কি কারণ ?

সে বল্ল, একটি প্রধান কারণ, 'টুরিষ্ট'ই হোক, কিংবা এখানকার স্থানীয় লোকই হোক, তারা সবাই গোরু ও শূকরের মাংস খায়, ভারতীয় হোটেলে তা' পাওয়া যায় না, তা' সবাই জানে, সেই জন্য একমাত্র ভারতীয় ছাড়া এখানে কেউ আসে না। কিন্তু দেনপাসারে ভারতীয়ের সংখ্যা খুব কম। ভারতবর্ষ থেকে ব্যবসায়ীই হোক, কিংবা টুরিষ্টই হোক, কেউ একটা বড় আসে না। কেবল ইন্দোনেশিয়ার নানা জায়গা থেকে যে সব হিন্দু ব্যবসায়ী দেনপাসারে আসে, তারাই এখানে খেতে আসে, কিন্তু তাদের সংখ্যা আর কত ?

তারপর আরো বল্‌তে লাগ্‌ল, আমাদের রান্না এখানে কেউ খেতে অভ্যস্ত নয় বলে আমরা একজন ইন্দোনেশিয়ান রাঁধুনীকে অনেক মাইনে দিয়ে রেখেছি। সে শুধু রাঁধে, পরিবেশন করে না। আমরা বলেছিলাম, তুমি ভারতীয় কায়দায় শাড়ী পরে 'কাষ্টমার'দের পরিবেশন কর, তোমার মাইনে আরো বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু সে বড় লাজুক, রাঁধে ভাল, কিন্তু শাড়ী পরে পরিবেশন কর্‌তে চায় না। যে দু' চারজন 'কাষ্টমার' আসে, তাদেরে আমরাই পরিবেশন করি, আমি আর আমার ভাইপো, সে শুধু রেঁধে বেড়ে আমাদের হাতে তুলে দেয়। এইভাবে কি হোটেল চালানো যায় ? বলুন ত !

দ্বিপ্রাহরিক আহার সেখানে ব'সে সমাধা করা গেল। ইন্দোনেশিয়ান রাঁধুনী মাংসের ঝোলে এত বেশী লঙ্কা দিয়েছিল যে অনেকক্ষণ ধ'রে আমার মুখ জ্বালা কর্‌তে লাগ্‌ল।

আমি তরুণকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাংসে খুব ঝাল খাও বুঝি ?

সে বল্‌ল, না না, আমরা ত নিরামিষ খাই, মাংস ত 'কাষ্ট-মার'দের জন্য রাঁধা হয়, আমাদের রান্না সব নিরামিষ, তা'তে আমরা ঝাল বেশী খাই না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নিরামিষ বুঝি রাঁধুনী খুব ভাল রান্না করে ? তবে কাল থেকে নিরামিষই খাব।

প্রায় দু' ঘণ্টা সময় খেয়ে গল্প ক'রে আমার সেই হোটেলে কাট্‌ল, তা' 'লাঞ্চে'র সময়, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র একজন 'হিপি'কে সেখানে এ'সে এক গ্লাস কোকা-কোলা খেতে দেখ্‌লাম, আর কোনো খাদ্যগ্রহণকারী সেখানে এলো না।

সহসা একদল ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ এ'সে সেখানে প্রবেশ করল দেখে একবার সচকিত হ'য়ে উঠলাম, কিন্তু সংবাদ নিয়ে জান্‌লাম, তারা হোটেল-মালিকের পরিবারস্থ লোক, তারা বাড়ীতে রান্নার কোনো হাঙ্গামা না ক'রে তাদের নিজেদের হোটেলের রান্না করা খাবার খেয়ে যেতে এ'সেছে। বুঝ্‌তে পারলাম, এইটেই তাদের হোটেলের লাভ।

বিকাল ৫ টার সময়ই আমার আস্তানা থেকে বেরিয়ে আমি শ্রীমতী দয়ালের জন্য 'হোটেল বালী'র ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম। ভাবলাম, একটু আগে থেকেই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল, নতুবা তিনি এ'সে সরাসরি যদি হোটেলের 'রিসেপসানে' আমার কথা জিজ্ঞেস করেন, তবে ধরা পড়ে যাব। আমি পথের পাশের সাধারণ একটা রেস্তোরাঁ থেকে চা খেয়ে নিয়েছিলাম, সুতরাং শ্রীমতী দয়ালের ট্যাক্সি এলেই তা'তে উঠে বস্‌তে আমার আর কোনো বাধা ছিল না।

আধ ঘণ্টা পর শ্রীমতী দয়াল ট্যাক্সি ক'রে 'হোটেল বালী'র সদর দরজায় এ'সে থামলেন। আমি তাঁ'কে সহাস্য অভিবাদন জানিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে ভিতরে উঠ্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি তিনি নিজেই ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়্‌ছেন। তিনি নাম্‌তে নাম্‌তে জিজ্ঞাস করলেন, আপনার চা খাওয়া হ'য়েছে ?

আমি বল্লাম, হ্যাঁ, আমি চা খেয়ে নিয়েছি।

তিনি বল্লেন, আমি ভাবছি, আপনার হোটেলেই আমি চা খেয়ে নেব।

এই বলে তিনি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে হোটেলের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। আমি আবার তা'কে স্মরণ করিয়ে দিতে গেলাম, আমার চা খাওয়া হ'য়ে গেছে ; তবে চলুন, আপনিও খেয়ে নিন।

ব'লে তা'কে নিয়ে আমি হোটেলের ভোজনাগারের দিকে যেতে লাগ্‌লাম। এখানে আমি একদিন নগদ পয়সা দিয়ে প্রাতরাশ খেয়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং ভোজনাগারের সন্ধানটি জানি। একটি টেবিলের কাছে গিয়ে আসন টেনে তিনি বস্‌লেন, অগত্যা আর একটি আসনে আমাকে বস্‌তে হ'লো।

শ্রীমতী দয়াল চায়ের সঙ্গে কি কি খাবেন, পরিচারিকাকে তা' বল্‌লেন, সে আমাদের দু' জনের জন্যই তা' পরিবেশন করল। অগত্যা আমিও শ্রীমতী দয়ালেব সঙ্গে খাদ্যসহ চা পান কর্‌তে লাগ্‌লাম। একবার মনের মধ্যে আশঙ্কা হ'লো, এই 'বিলে'র টাকা শেষ পর্যন্ত আমাকে না দিতে হয়।

চা পান শেষ হ'বার আগেই পরিচারিকা দু' জনের 'বিল'ই একসঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে দিয়ে গেল। শ্রীমতী দয়াল খুব নির্লিপ্ত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, বিলের উপর আপনার রুম নম্বরটি লিখে সই ক'রে দিন, নগদ টাকা এখন না দিলেও চল্‌বে। চলুন, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

বলে তিনি 'বিলে'র দিকে না তাকিয়েই বেরিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হ'লেন।

আমি তাঁকে বল্লাম, আপনি চলুন, আমি আস্‌ছি।

তিনি অবিলম্বে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'বিলে'র দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষু চড়ক গাছ। লাখ রুপাইয়া না হ'লেও সিকি দু' আনি লাখ হবে। সবটা বিলই তা' হলে আমার ঘাড়ে চাপ্‌ল।

নিরুপায় হ'য়ে পরিচারিকার হাতে নগদ রুপাইয়া বুঝিয়ে দিয়ে শ্রীমতী দয়ালের পশ্চাদনুসরণ কর্‌লাম, ভাবলাম, যাই হোক, ট্যাক্সির খরচা ইনি সবটা দিয়ে দিলেই পুষিয়ে যাবে।

ডাঃ পাঞ্জীর লোককে তুলে নিয়ে বারং নাচ দেখ্‌বার জন্য যখন এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন ৬৷৷০টা বেজে গেছে। ৭টা থেকে নাচ আরম্ভ।

সেখানে এক একজনে দু'শ' রুপাইয়া (আমাদের টাকায় ১২'০০ টাকা) ক'রে টিকিট ক'রে নাচ দেখ্‌বার জন্য আসন গ্রহণ করলাম। ইতিমধ্যেই সেখানে প্রায় দু'শ বিদেশী দর্শক সমবেত হ'য়েছে। নৃত্যাঙ্গিনার একদিকে দুই দীর্ঘ বেতের চেয়ারের সারিতে তাদেরে বস্‌তে দেওয়া হ'য়েছে। নৃত্যাঙ্গিনাটি একটি মন্দির-প্রাঙ্গণ, সেখানে ৭ টা থেকে রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত বারং নৃত্যের অনুষ্ঠান চলে। (নৃত্যের বর্ণনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

ট্যাক্সি এতক্ষণ ধরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তাই অনুষ্ঠান শেষ হ'য়ে যাবার পর আমরা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠ্‌লাম। বিভিন্ন হোটেল থেকে তাদের যাত্রীদের নিয়ে কয়েকটি ডিল্যুক্স বাস এ'সেছিল, অন্যান্য দর্শকেরা তা'তে গিয়ে উঠে নিজেদের গন্তব্য স্থলের দিকে যাত্রা করল।

'হোটেল বালী'র সামনে আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে শ্রীমতী দয়ালের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাব এমন সময় তিনি বল্লেন, আপনার শেয়ারে ট্যাক্সির ভাড়া ৮০০ আট শ' রুপাইয়া হ'য়েছে, টাকাটা আমার হাতে দিয়ে দিন, আমি ড্রাইভারকে দিয়ে দিব।

আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম ! ভেবেছিলাম, তিনি যখন 'হোটেল বালী'তে আমার পয়সায় চা খেয়েছেন, তখন ট্যাক্সি ভাড়া তিনি নিজেই দিয়ে দিবেন, বিশেষতঃ তাঁর টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় থেকে আটশ রুপাইয়া ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য দিতে গেলে আমার বালীদ্বীপে একদিন থাকবার খরচে টান পড়ে। কিন্তু ভেবে কোনো লাভ নেই, তিনি আমার দিকে হাত পেতে রইলেন। সুতরাং নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে আট শ রুপাইয়া তার হাতে গুণে দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এক হাতের মুঠিতে টাকাগুলো ধ'রে নিয়ে আর এক হাত তুলে আমাকে শুভরাত্রি জানালেন, আমি তার কোনো জবাব না দিয়ে বিষণ্ণ মুখে নিজের ক্ষুদ্র 'হোটেল'টির দিকে অগ্রসর হ'য়েগেলাম।

পরের দিন সকাল ৮ টার সময় বালীদ্বীপের আর একটি গ্রামে কৃশ নৃত্য নামে একটি নৃত্যের অনুষ্ঠান হ'বে, সেখানে যাবার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে, আর শ্রীমতী দয়ালের সঙ্গে কোথাও যাব না, স্থির করলাম। তাই 'হোটেলে' ফিরে এ'সে গৃহকর্তার নিকট এই বিষয়ে আমার একটা কি ব্যবস্থা হ'তে পারে, তা' জানতে চাইলাম।

গৃহকর্তা নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তি, সামান্য ইংরেজি জানে। সে বল্ল,

আপনি মোটর সাইকেল চালাতে জানেন ?

আমি বল্লাম, না ; তবে সাইকেল চালাতে জানি।

সে বল্ল, সাইকেলে হবে না, কারণ, গ্রামটা কাছে নয়, বেশ দূরে। তারপর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনি মোটর সাইকেলের পিছনের সীটে বস্‌তে পারবেন ?

আমি বল্লাম, তা' হয় ত পারি, যদিও সে অভিজ্ঞতা তখন পর্যন্ত হয় নি।

তাই স্থির হ'লো ; একজন মোটর সাইকেল আরোহী আমাকে তার পিছনের সীটে বসিয়ে সেই গ্রামে নিয়ে যাবে, তারপর আবার সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌বে, তার জন্য তা'কে এক শত রুপাইয়া দিলেই চল্‌বে।

পরের দিন সকাল ৭৷৷০ টার সময়ই সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী কৃশনৃত্য দেখবার জন্য নির্দিষ্ট গ্রামের নৃত্যাঙ্গিনায় এ'সে পৌঁছলাম। মোটর সাই-কেল চালক এত দ্রুত চালিয়ে নিয়ে এ'সেছে যে সারাক্ষণ আমার মনে হ'য়েছিল যে, আমি ছিট্‌কে গিয়ে পথের ধারে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে হাত পা ভাঙব। সুতরাং আজ ফিরবার পথে যদি প্রাণ বাঁচে, তবে ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থাও পরিত্যাগ করবার সংকল্প করলাম।

আমি আজ অন্য ব্যবস্থায় নাচ দেখ্‌তে আস্‌ব, সে' কথা শ্রীমতী দয়ালকে কাল রাতে কিছু বলিনি ; তাই মনে হ'লো, হয়ত তিনি আমাকে 'হোটেল বালী'তে খুঁজতে পারেন! কিন্তু তার উপর বিরক্তিতে আমার মন ভরে আছে, তাই এ' বিষয়ে আর কিছু ভাবতে পারলাম না।

এমন সময় দেখি তিনি ট্যাক্সি ক'রে এ'সে হাজির! আমাকে দেখেই বল্লেন, ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আপনাকে হোটেল বালীতে গিয়ে আমি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এ'লাম, আপনি আমাকে ফেলে চলে এ'লেন ?

বলে তিনি আমার পাশের চেয়ারটিতেই বস্‌লেন। আমি বল্লাম, একজন পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে 'লিফ্‌ট' দিয়েছেন, বলেছেন, যাবার সময়ও আমাকে নিয়ে যাবেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠ্‌লেন, তা'হলে ত আমিও আপনার সঙ্গে ফিরতে পারি, ট্যাক্সিটাকে বিদায় ক'রে দিই, আপনিও এ'লেন না, সবটা ভাড়া ত আমাকেই দিতে হ'বে।

আমি সব কথা তা'কে খুলে বল্লাম। তিনি সব শুনে অভিযোগের সুরে

বল্লেন, আপনি আস্‌বেন বলেই আমি ট্যাক্সি করেছি, নতুবা একা আস্‌তাম না, এত টাকা আমি একা কোত্থেকে দেব বলুন ত! আমাকে সিঙ্গাপুরে দিন কয়েক থাকতে হবে, জানেন ত কত খরচ!

আমি বল্লাম, আমি সব জানি বলেই ত মোটর সাইকেলের পিছনে ক'রে এ'সেছি, নতুবা আপনার সঙ্গেই আস্‌তাম।

তিনি অসহায়ের মত বল্‌তে লাগ্‌লেন, তাই ত, আমি এখন কি করি বলুন ত! ট্যাক্সির এত খরচ, আপনি এক পয়সাও দিবেন না?

তাঁর ইচ্ছা আমি মোটর সাইকেলের পিছনে চড়ে আসা সত্ত্বেও তার ট্যাক্সি ভাড়ার অর্ধেক আমি দিয়ে দিই; কারণ, আমিও তাঁর সঙ্গে আস্‌ব আশা ক'রে তিনি ট্যাক্সি ভাড়া ক'রেছিলেন, নতুবা একা হ'লে তিনি আস্‌তেন না। তিনি এমন ভাবে তার জন্য কাতর অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন যে আমার হাতে টাকা থাকলে সত্যই তা'কে আমি সে টাকা দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার চুপ ক'রে থাকা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

কিন্তু শ্রীমতী দয়ালের ধনভাগ্য অত্যন্ত প্রবল দেখ্‌তে পেলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি ধনলাভের একটি সুযোগ পেয়ে গেলেন।

একজন বয়স্কা মার্কিন মহিলা এ'সে আমার পাশের চেয়ারে বস্‌লেন, মনে হলো, তিনি একাকিনীই সেখানে এ'সেছেন। আমি কোথা থেকে এ'সেছি, সে' কথা তিনি নিজে থেকেই আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌তে চাইলেন।

আমি বল্‌লাম, ভারতবর্ষের কোলকাতা থেকে।

কোলকাতা শুনেই তিনি যেন চম্‌কে উঠ্‌লেন, তখন বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ চল্‌ছিল, ভারত মুক্তিসংগ্রামীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু কোলকাতার অদূরবর্তী স্থানে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিল।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খবরের কাগজে প্রতিদিন উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশার কথা পড়ি, প্রকৃত অবস্থাটা কি আপনি একটু খুলে বলুন।

আমি বল্লাম, খবরেব কাগজে প্রতিদিন যা পড়েন, তা' প্রকৃত অবস্থার শতাংশ মাত্রও নয়, অবস্থা তার চাইতেও শোচনীয়। তা' বর্ণনার অতীত।

মনে হ'লো মহিলা খুব বিচলিত হ'লেন। তিনি বল্লেন, উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য আমি আমার সাধ্যমত সামান্য কিছু দান করতে চাই,

যদি আপনার হাতে তা' দিয়ে দিই, তা' হ'লে যথাস্থানে তা' নিশ্চয়ই আপনি পৌঁছে দিতে পারবেন।

আমি বল্লাম, হ্যা, আমাদের পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল একটি সাহায্য তহবিল খুলেছেন, আমি আপনার নামে তা' সেই তহবিলে জমা দিয়ে আপনাকে রসিদ পাঠিয়ে দিব।

তিনি বল্লেন, না, না, আমার নামে জমা দিবার দরকার নেই, শুধু একজন বিদেশী সমব্যথী (foreign sympathiser) এই নামে জমা দিলেই হ'বে।

আমি বল্লাম, আপনি যেমন ইচ্ছা ক'রেন, তাই হ'বে।

এতক্ষণ ধ'রে শ্রীমতী দয়াল আমাদের আলোচনা মন দিয়ে শুন্‌ছিলেন, কোনো কথা বলেন নি। যখন মার্কিন মহিলাকে তার 'ভ্যানিটি ব্যাগ' খুলে টাকা বার কর্‌তে দেখ্‌লেন, তখনই তিনি আমার উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বল্লেন, টাকাটা আপনি আমার হাতে দিতে পারেন, আমি শীঘ্রই দিল্লী যাব, দিল্লী গিয়ে টাকাটা ইন্দিরার (প্রধান মন্ত্রীকে সর্বদাই তিনি ইন্দিরা বলেই উল্লেখ করেন) হাতেই দিতে পারব।

আমি আর কোনো কথা বল্লাম না, অগত্যা এই ভেবে সান্ত্বনা নিলাম যে পরের টাকার দায়িত্ব না নেওয়াই ভাল।

মার্কিন মহিলা প্রধান মন্ত্রীর নাম শুনেই হোক, কিংবা তাঁর চোখের সাম্‌নে একটি প্রসারিত হস্ত দেখে লজ্জা বশতঃই হোক, তার হাতেই আমার যত দূর মনে হলো, ২০০ ডলার তুলে দিয়ে বল্লেন, আমার সঙ্গে আর ভাঙ্গানো ডলার নেই, থাক্‌লে আরো কিছু দিতে পারলে ভালো হ'তো। তবু আমার এই সামান্য সাহায্যটুকু আমি আপনার হাত দিয়ে পাঠালাম।

শ্রীমতী দয়াল বল্লেন, আমি দিল্লী গিয়েই টাকাগুলো ইন্দিরার তহবিলে জমা দিয়ে দিব।

ব'লে আমার চোখের সাম্‌নেই ডলারগুলো তাঁর 'ভ্যানিটি ব্যাগে' ঢুকিয়ে নিলেন।

এ'বার শ্রীমতী দয়াল তাঁর ব্যাগ থেকে 'বটতলার ছাপানো' তাঁর লেখা ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে ২।৩ খানি চটি বই বা'র কর্‌লেন। তারপর তাঁর পার্শ্ববর্তিনী একটি মার্কিন মহিলাকে তা দেখ্‌তে দিয়ে বল্লেন, ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে তাঁর লেখা এই একান্ত প্রামাণিক বইগুলো তিনি অতি অল্প

মূল্যেই বিক্রি কর্‌তে চান।

ততক্ষণে কৃশনৃত্য আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে বলে মার্কিন মহিলার দৃষ্টি বইগুলোর উপর থেকে গিয়ে নৃত্যের উপর ন্যস্ত হ'লো, বইগুলো তিনি নীরবে প্রত্যাখ্যান করে নৃত্য দেখায় মনঃসংযোগ করলেন।

প্রায় বেলা ১১ টার সময় কৃশনৃত্য শেষ হ'লো। শ্রীমতী দয়াল তাঁর ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠ্‌বার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার মোটর সাইকেল আরোহীর পিছনের আসনে গিয়ে ব'সে অল্পক্ষণের মধ্যেই দেনপাসারে এ'সে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু স্থির করলাম, ভবিষ্যতে আর মোটর সাইকেল ক'রেও যাব না, কারণ, উঁচু নীচু পথে যে কোনো মুহূর্তে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সে দিন রাত্রে আবার আর এক গ্রামে এক নৃত্য হ'বে, তার নাম কেচক নৃত্য (তার বর্ণনা অন্যত্র আছে)। অনেক ভেবে স্থির করলাম, আমি যে বিদেশী মুদ্রাগুলো এখানে জিনিসপত্র কিন্‌বার জন্য রেখে দিয়েছিলাম, ত.' নাচ দেখার ব্যাপারেই ব্যয় করব, কারণ, জিনিস পত্র ভবিষ্যতেও কিন্‌বার সুযোগ পাব, কিন্তু বালীদ্বীপের গ্রামে গ্রামে ঘুরে এমন অপূর্ব নৃত্যানুষ্ঠান দেখ্‌বার আর সুযোগ পাব না! ভেবে আমার আস্তানাটি ছেড়ে নিকটবর্তী 'হোটেল বালী'তে এসে উঠ্‌লাম। তার একটা মস্ত সুবিধা এই যে সেখান থেকে হোটেলের পর্যটকদেরে নিয়ে সকাল বিকাল দু'বারই একটি বাস বালীদ্বীপের গ্রামে গ্রামে নৃত্যানুষ্ঠান দেখানোর জন্য যাতায়াত করে। তার জন্য যা' দক্ষিণা দিতে হয়, তা' ট্যাক্সির তুলনায় ত কমই, এমন কি, মোটর সাইকেলের তুলনায়ও অনেক কম। প্রধানতঃ তার সুযোগ পাব ব'লেই আমি সে সিদ্ধান্ত নিলাম, তারপর হোটেলে থাক্‌লেও আমার ইচ্ছামত 'মহারাজা হোটেলে' খাওয়া দাওয়া কর্‌তে কোনো আপত্তি নেই। হোটেলে কেবল ঘরের ভাড়া দিলেই চল্‌বে।

সুতরাং রাত্রে কেচক নৃত্য দেখ্‌তে যাবার পক্ষে আর কোনো বাধা হ'লো না। এমনি ভাবে সকালে বিকালে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নৃত্য দেখে বেড়াতে লাগলাম, শ্রীমতী দয়ালকে কোনো কোনো দিন দেখ্‌তে পেলে তা'কে এড়িয়ে যাই, কিন্তু তিনি সর্বদাই আমার সঙ্গে কথা বল্‌বার জন্য এগিয়ে আসেন।

বরবুদর, মধ্য যবদ্বীপ

'হোটেল বালী'তে প্রায় দিন পনের কাটিয়ে যখন অর্থবল ক্ষীণ হ'য়ে এল, তখন স্থির করলাম, কোনো কেনাকাটা যখন আর কর্‌তে পারব না, তখন এ'বার দেশে ফিরে যাওয়াই স্থির। কিন্তু তার আগে দুটো জিনিস এখনো দেখ্‌বার বাকি, একটি পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধ মন্দির বরবুদর ও দ্বিতীয় প্রাম্বানামের শৈব মন্দির। দুটি জায়গাতেই যোগজাকার্তা থেকে যেতে হয়। সুতরাং একদিন দেনপাসার থেকে বিমান-যোগে যোগজাকার্তা এ'সে পৌঁছলাম, বিমানে তা' মাত্র আধ ঘণ্টার পথ।

এখানে একটি কথা আমি না ব'লে পাচ্ছি না। দেনপাসার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে যখন বেলা ১১ টার সময় আমাদের ইন্দোনেশীয় বিমান-পথের বিমান 'গরুড়' যাত্রা করল, তখন পর্যটকদের দেখাবার জন্যই হোক, কিংবা বিমান চলার কোনো বিশেষ ব্যবস্থার জন্যই হোক, বিমানটি খুব নীচু দিয়ে সারা দ্বীপটির উপর একবার চক্রাকারে ঘুর্‌ল। দ্বীপটি ছোট, নারকেল গাছের ঘন বন তা'কে নিবিড় ক'রে রেখেছে, তা মহাসমুদ্রের বিস্তৃত ললাটে যেন একটি ছোট্ট গাঢ় সবুজ টিপ ব'লে মনে হ'লো। তার সৌন্দর্য আমি বর্ণনা কর্‌তে পারব না, কেবল মুগ্ধ হ'য়ে যে একদিন তা' দেখেছিলাম, তার কথা স্মরণ করেও আজ আমার সর্বাঙ্গ পুলকে শিউরে ওঠে। দ্বীপটিকে সমতল ভূমি থেকে দেখ্‌লে তার সামগ্রিক এবং অখণ্ড রূপটি দেখা যায় না, কেবল উপর থেকে দেখ্‌লেই তা' সম্ভব। সমগ্রতার যে সৌন্দর্য খণ্ডের মধ্যে তার ছায়াটুকুও ধরা পড়ে না।

সমুদ্র সে দিন শান্ত, দ্বীপের চার পাশ ঘিরে ফিকা নীল তার জল, তার মাঝখানে একটি গাঢ় সবুজ রঙের টিপ, মধ্যাহ্ন রৌদ্রে যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কত বিচিত্র হ'তে পারে, তা' আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

দেনপাসার থেকে যোগজাকার্তার দূরত্ব বিশেষ কিছুই নয়। বিমান-পথে আধ ঘণ্টার মধ্যেই এ'সে পৌঁছে গেলাম। বিমান-বন্দরে নেমে সেখান থেকে ট্যাক্সি ক'রে সহরের কোনো হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। দেখলাম, তার ব্যবস্থাটি সেখানে বেশ ভাল। 'গরুড়ে'র পক্ষ থেকেই

সেখানে একটি 'কাউন্টার' আছে, তাতে গিয়ে একটি লিখিত 'ফরম' পূর্ণ করে গন্তব্য স্থান জানালেই তার জন্য যা ভাড়া নির্দিষ্ট আছে, তা' নিয়ে সেখানেই একটি 'ট্যাক্সি কুপন' দিয়ে দিবে। 'কুপন'টি নিয়ে ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠ্‌তে হবে, তারপর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কুপনটি সই ক'রে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে দিতে হ'বে। ড্রাইভার কুপনটি দেখিয়ে বিমান-বন্দরের নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে তার টাকা পাবে। বিমান-বন্দরে যাত্রীর সই করা 'ফরমে'র সই-এর সঙ্গে কুপনের সই মিলিয়ে দেখে তবে ট্যাক্সিওয়ালাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ট্যাক্সি-আরোহীর কোনো কথাবার্তা কি'বা লেনদেন হ'বার কোনো প্রয়োজন হয় না। বিদেশীদেরে ট্যাক্সিওয়ালাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য কর্তৃপক্ষের এই সতর্কতা প্রশংসনীয় বল্‌তে হয়।

নগদ ছয় শ' রুপাইয়া বিমান-বন্দরে ট্যাক্সির জন্য জমা দিয়ে যোগ-জাকার্তা সহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে 'হোটেল গরুড়'এ এ'সে আশ্রয় নিলাম। সেখানে দৈনিক এক হাজার রুপাইয়া (ভারতীয় মুদ্রার ২০ টাকার মত) ভাড়ায় একটি কক্ষে স্থান লাভ করলাম।

এখানে আসবার উদ্দেশ্য দু'টি, প্রথমতঃ পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির বরবুদর, দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাম্বানামের শিব মন্দির দর্শন। দু'টি জায়গাই যোগজাকার্তা থেকে দূরে, তবে সেখান থেকে যেতে কোনো অসুবিধা নেই। বরবুদর যোগজাকার্তা থেকে ত্রিশ মাইল, প্রাম্বানাম্ সেখান থেকে পনের মাইল মাত্র। যাতায়াতের পথ চমৎকার, ট্যাক্সি কিংবা বাস সর্বদাই যাতায়াত করে।

প্রথমেই ভাবলাম, হোটেল থেকে সেখানে যাবার কি ব্যবস্থা আছে, তা' গিয়ে জানা যাক। কিন্তু হোটেলের আপিশে গিয়ে জানা গেল, তাদের এ' সম্পর্কে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই, যাত্রীরা নিজেরাই যে যার সঙ্গতি এবং সুবিধা মত ব্যবস্থা ক'রে থাকে।

আমি নিঃসঙ্গ যাত্রী, অপরিচিত দেশে সব সময় সব জায়গায় একাকী যেতে সাহস পাই না। কি করি, ভাবতে ভাবতে সামনে বড় রাস্তায় এ'সে দাঁড়ালাম। রাস্তার দু'ধারেই বড় বড় দোকান, কাপড়ের দোকানই বেশী। সহসা রাস্তার ওপারে একটি 'সাইন বোর্ডে'র দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো। সাইন বোর্ডটি রোমান হরফে ইন্দোনেশিয়ায় ভাষায়

লিখিত থাক্‌লেও তা'তে India শব্দটির উদ্দেশ্য যে ভারতীয়, তা' বুঝতে পারা গেল। ব্যাপারটা কি, তা' জানবার জন্য ধীরে ধীরে রাস্তা পার হয়ে দোকানের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম। বিরাট দোকান, দোকানে নানা রঙের ছিট কাপড়ের স্তূপ। কর্মচারীদের মধ্যে একজনকে আমার দোকানের মালিক ব'লে মনে হ'লো। তার চেহারাটি সম্ভ্রান্ত একজন ভারতীয়ের মত। সুরবইয়ে কুন্দন দাসের বাড়ীতে এই রকম চেহারার সিন্ধী ব্যবসায়ী অনেক দেখেছি। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ভারতীয় ?

তিনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, হাঁ, বুঝতে পাচ্ছি আপনিও তাই, তা' না হলে এমন কথা জিজ্ঞেস করবেন কেন ? ব'লে নিজেই একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আমাকে বসতে বল্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কোকা-কোলার বোতলের ছিপি-খোলার শব্দ হ'লো, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি বোতলটি আমার মুখের সাম্‌নে ধরে আমাকে বল্‌লেন নিন, খান।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কোকা-কোলা খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'লাম। মনে হ'লো, বোতলটি তিনি 'ফ্রিজ' থেকে বার ক'রে দিয়েছেন।

অনেক কথার পর আমি আমার কথা বল্লাম ; বল্লাম, আমি বরবুদর আর প্রাম্বানাম্ যেতে চাই, কি ভাবে তা' সম্ভব হতে পারে, আমায় বলে দিন।

তিনি বল্লেন, তার কোনো অসুবিধা হবে না, তবে আজ অসময় হ'য়ে গেছে, আগামীকাল সকাল ১০ টার মধ্যে আস্‌বেন, আপনাকে আমি বরবুদরের বাসে বসিয়ে দিব, তারপর প্রাম্বানামেরও ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে।

আমি খুসী হ'য়ে হোটেলে ফিরে এ'লাম। পরদিন যথা সময়ে তাঁর দোকানে গিয়ে হাজির হ'য়ে গেলাম। তিনি তাঁর এক ইন্দোনেশীয় কর্মচারীকে আমাকে বরবুদরের বাস ষ্ট্যাণ্ডে নিয়ে যেতে বল্লেন, আমি আর বিলম্ব না ক'রে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাস ষ্ট্যাণ্ড সেখান থেকে পনের মিনিটের হাঁটা পথ।

পথে গিয়ে পা দিতেই দেখা গেল, ষ্ট্যাণ্ড থেকে ছেড়ে দিয়ে বরবুদরের বাস বরবুদরের পথে রওয়ানা হ'য়ে গেছে। কর্মচারীটি আমাকে চলন্ত বাসটি দেখিয়ে বল্‌ল, এই বরবুদরের বাস। আমি আর কোনোদিক

বিবেচনা না ক'রে বাসটির একটু মন্থর গতির সুযোগ নিয়ে তা'তে লাফিয়ে উঠে গেলাম।

কিন্তু উঠেই আমার ভুল বুঝ্‌তে পারলাম, বাসটি যাত্রীতে পূর্ণ, বস্‌বার একটিও আসন খালি নেই। দাঁড়িয়ে থাকার কোনো ব্যবস্থাও নেই, কারণ, দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা ছাতে ঠেকে। দাঁড়িয়ে যাওয়া আইনতঃও নিষেধ। আমি কন্‌ডাকটারের দিকে তাকিয়ে কোনো সীট্ শীগ্‌গির খালি হবে কিনা জান্‌তে চাইলাম। তার কথা থেকে বুঝতে পারলাম, বাসটি বরবুদর ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর যাবে, সব দূর পাল্লার যাত্রী নিয়ে সে চলেছে, সুতরাং পথে কোনো আসন খালি হবার আশা নেই। সুতরাং ত্রিশ মাইল পথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যাব কিন, তা' ভাবছি।

ইতিমধ্যে দ্রুতগামী দূর পাল্লার বাস সহর ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে। দু ধারে কেবল তামাক পাতার ক্ষেত ছাড়া আর তখন কিছুই চোখে পড়ছে না, সুতরাং এখানে নেমে পড়লেও আবার বাসে ক'রে হোটেলে ফিরে যেতে পারব কিনা, সে' বিষয়েও ভাবতে হলো।

এমন সময় একটি ইন্দোনেশীয় তরুণ তার নিজের আসনটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেই আসনে আমাকে বস্‌বার কথা বল্‌ল। আমি বিব্রত বোধ করলাম, কারণ, আমি আগে থেকেই যাত্রীভরতি একটি বাসে লাফিয়ে উঠে অন্যায় ক'রেছি, তারপর অন্যায়ের শাস্তি না পেয়ে আর একজনের ন্যায্য ভাবে প্রাপ্য আসনটি দখল ক'রে শাস্তির বদলে পুরস্কার লাভ করব, তা' কি ক'রে হতে পারে?

আমি তরুণটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার আসনে তাকে বস্‌বার জন্য অনুরোধ জানালাম, কিন্তু সে কিছুতেই বস্‌তে চাইল না, বার বার আমাকে অনুরোধ করতে লাগ্‌ল। সমগ্র বাস শুদ্ধ লোকের আমি একটা দ্রষ্টব্য এবং আলোচ্য বিষয় হ'য়ে উঠ্‌লাম দেখে শেষ পর্যন্ত আমি আসনে বসে পড়্‌লাম। তরুণটি নীচু ছাতওয়ালা বাসের নীচে নত মস্তকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তার সৌজন্য গভীর ভাবে আমার অন্তর স্পর্শ করল।

একটা দেশকে তার পুরানো মঠমন্দির দিয়ে চেনা যায় না, মানুষ দিয়ে চেনা যায়। কারণ, পুরানো মঠমন্দির অতীতের মধ্যে মৃত,

আর মানুষ বর্তমানের মধ্যে জীবন্ত। তাই আমি মঠমন্দিরে দেশের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধান করলেও তার মানুষকে পথে ঘাটে খুঁজে বেড়াই। ইন্দোনেশিয়ার গিয়ে সেই তরুণটির মধ্যে সে দেশের মানুষকে সে দিন জীবন্ত দেখেছিলাম, আর বরবুদর এবং প্রাম্বানামের জীর্ণ ভগ্ন স্তূপের মধ্যে মৃত মানুষের কঙ্কালের স্তূপ দেখেছিলাম।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ইন্দোনেশীয় তরুণটি বাসের নীচু ছাতের নীচে মাথা ঠেকিয়ে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর যাত্রীরা প্রায় সবাই আমার দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল, বরবুদর।

আমি বুঝতে পারলাম, আমরা বরবুদরে এসে পৌঁছেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি বাস থেকে নেমে পড়লাম। নামবার আগে তরুণটিকে আর একবার ধন্যবাদ জানালাম। আমি উঠবা মাত্র সে আসনটি, তারই আসন, আবার দখল করে বসল। আর কেউ সেখানে নামল না। বাস গন্তব্য পথে দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বাস থেকে নেমেই দেখি পশ্চিম দিকে প্রায় মেঘের মত অন্ধকার করে বরবুদরের পর্বতোপম বৌদ্ধস্তূপ মাটির উপর যেন ছিন্ন পক্ষ মৈনাকের মত উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে। একটু দূর থেকেও তাকে পাহাড় বলেই মনে হলো। আমি ধীরে ধীরে তার পথ ধরে এগুতে লাগলাম। দেখলাম, অনেক পর্যটক সেখানে এসে আগে থেকেই ভীড় করেছে।

চারদিকে পর্বতমালা বেষ্টিত একটু উঁচু সমতল ভূমি, অথচ প্রকৃত পক্ষে তাকে মালভূমিও বলা চলে না, এমন জায়গাতেই বরবুদরের বৌদ্ধ কীর্তিটি স্থাপিত। মনে হলো, একটি আস্ত পাহাড় কেটে কেটে এই কীর্তি রচনা করা হ'য়েছে। সেখান থেকে চারদিকে দূর পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত সবুজ ধান ক্ষেত। পরে জানতে পেরেছিলাম, চারদিক ঘেরা পর্বতমালার মধ্যে বহুদিন নির্বাপিত অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। তাদের লাভা-স্রোতে একদিন চারদিককার উঁচু নীচু ভূমি সৃষ্টি হ'য়েছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে যোগজাকার্তার শৈলেন্দ্র রাজবংশের একজন বৌদ্ধ রাজা বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করবার জন্য পাষাণে এই স্তবগান রচনা করেছিলেন। তাঁর স্থপতির নাম ছিল গুণধর্ম। তিনিও বৌদ্ধ ছিলেন এবং এই বিশাল কীর্তিকে রূপ দিবার জন্য দীর্ঘকাল ধ'রে নির্জনে বসে সাধনা করেছিলেন। কারণ, বরবুদর কেবল মাত্র একটি

স্মৃতিস্তম্ভ নয়, তার মধ্য দিয়ে সমগ্র বৌদ্ধ জীবন-দর্শন পাষাণের ভাষায় লেখা হয়েছে। তাই এক দিক দিয়ে তা' বহির্মুখী এক স্থাপত্য-কীর্তি, আর এক দিক দিয়ে তা এক সুগভীর বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পাষাণ-লিপি। সেই উপলব্ধিতে কেউ অনুভব করেছেন, বৌদ্ধদর্শনে 'দশভূমি' অতিক্রম ক'রে যে মহাশূণ্যতার মধ্যে বিলীন হ'য়ে যাবার কথা আছে, এই মন্দির তারই রূপক। তার ক্রমোচ্চ গঠনের মধ্যে তিনটি প্রধান স্তর, একটি ভূমিতে আশ্রয় করেছে, তা পার্থিব কামনা-বাসনার রূপক, দ্বিতীয় স্তরটি ভূমি এবং আকাশের মধ্যবর্তী, তা মনুষ্য জীবনকে একবার ভূমির দিকে ও আর একবার ভূমার দিকে টান্‌বার রূপক, শেষ স্তরটি ভূমির সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ভূমার মধ্যে বিলীন হ'য়ে যাবার রূপক। এই তিনটি স্তর যথাক্রমে কামধাতু, রূপধাতু, এবং অপরূপ ধাতু নামে পরিচিত, তিনটি স্তর আবার দশটি ভাগে বিভক্ত, তাই বৌদ্ধ দর্শনের 'দশভূমি'। বরবুদর তার বিশাল পাষাণ দেহে এই জীবন-বাণী প্রচার করতে চেয়েছে। স্থপতি গুণধর্ম এই বিশাল পরিকল্পনাটির একক রূপকার।

এই বিশাল স্তূপের চারটি দিক, পূব দিকে তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবার সোপান। সোপান দুরারোহ নয়, প্রশস্ত সোপান বেয়ে সহজেই উচ্চতম স্থানে পৌঁছানো যেতে পারে। পূব দিক ছাড়া আর কোনো দিকে উপরে উঠবার আর কোনো সোপান কিংবা অন্য কোনো উপায় নেই।

বরবুদর স্তূপের সর্বনিম্ন যে স্তরের নাম কামধাতু তা'তে অন্ততঃ দু'শর মত প্রস্তরমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। তা'তে পার্থিব জীবনের নানা কামনা-বাসনার লৌকিক প্রসঙ্গ প্রস্তরে রূপায়িত হ'য়েছে, যেমন পাপীর নরক-যন্ত্রণা, অসৎ কর্মের ফল স্বরূপ হীনতর যোনিতে পুনর্জন্ম। স্তূপের দ্বিতীয় স্তরে কামধাতু থেকে রূপধাতুতে উত্তরণ হ'য়েছে। তার চারটি সারিতে ছোট ছোট অসংখ্য চৈত্যের প্রত্যেকটির মধ্যে একেকটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। তাদের দেওয়ালের গায়ে প্রায় সমগ্র জাতক-মালা, ললিত বিস্তর এবং অন্যান্য বৌদ্ধ নীতিকাহিনীর প্রায় দু' হাজার প্রসঙ্গ বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির প্রসঙ্গ সহ প্রস্তরে উৎকীর্ণ হ'য়েছে। তার এই বিশালতা মানুষের কল্পনার অতীত। বুদ্ধদেব তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে যে সকল সৎকর্ম সাধন ক'রে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, এই শিলামূর্তিগুলোর ভিতর দিয়ে সেই

কাহিনীগুলো পর পর প্রকাশ পেয়েছে। যেদিন মানুষ নিরক্ষর ছিল, সেদিন পাষাণের ভাষায় যে দিব্যজ্ঞান লাভ করত, এ' ভাষা সেই ভাষা। আজও সেই ভাষা অমরত্ব লাভ ক'রে বুদ্ধবাণী প্রচার ক'রে চলেছে। মানুষের মুখের ভাষা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু পাষাণে সে যে ভাষা একদিন লিখে গিয়েছিল, কোনোদিন তার পরিবর্তন নেই, বিনাশও নেই। শুধু সেই ভাষা শুনবার কান চাই, প্রাণ চাই।

রূপধাতুর উপরিস্তরের নাম অরূপধাতু, রূপলোকের উর্ধ্বে তার অবস্থান ব'লে তাই বরবুদরের সর্বোচ্চ স্তর অধিকার করেছে। এখানকার পরিবেশ প্রশান্ত, সংযত, নির্মল এবং পবিত্র, সেখানে সর্বোচ্চ স্তূপটির তিন দিক ঘিরে অলিন্দ। সেখানেও প্রায় এক শ' টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্য বা স্তূপ, তার প্রত্যেকটিতে একেকটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি, মূর্তিগুলো সম্পূর্ণ অক্ষত। ভারতবর্ষে একমাত্র দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি মন্দির ব্যতীত কোনো মন্দি-রেরই দেবমূর্তি প্রায় অক্ষত নেই, ইন্দোনেশিয়ায় তার বিপরীত. সেখানে হিন্দু দেবদেবী কিংবা বুদ্ধমূর্তির উপর কোনোদিন কোনো আক্রমণ চলেনি বলে সেখানকার প্রত্যেকটি দেবমূর্তি অক্ষত। সেখানেও বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুধর্ম, তারপর মুসলমান ধর্ম ক্রমে নিজেদের অধিকার স্থাপন করেছে, কিন্তু ধর্মকলহ ব্যতীতই সে কাজ নিষ্পন্ন হ'য়েছে। তাই মূর্তিগুলো অক্ষত অবস্থায় থাকবার সুযোগ পেয়েছে।

ভারতবর্ষে আমরা প্রাচীন মূর্তি দেখলেই তা'কে ক্ষতবিক্ষত দেখ্‌তে পাই, প্রাচীন মূর্তি সম্পর্কে আমাদের এমনই একটি সংস্কার জন্মে গেছে, তাই বরবুদরের সর্বোচ্চ স্তরের মূল চৈত্যটি ঘিরে যে তিনটি অলিন্দে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্যে অগণিত বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত, তাদের প্রত্যেকটি যে অবিকৃত আছে, তা' দেখে বিস্ময় বোধ করলাম। এখানে যুগ-চিন্তার ক্রমবিকাশের সূত্রে যুগ-পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে সমাজের পরিবর্তন এসেছে, অস্ত্রের শাসনে সেই পরিবর্তন কেউ জোর ক'রে আন্‌তে যায় নি ব'লে নীরব পাষাণমূর্তিগুলোর গায়ে কারো অসহিষ্ণুতার কলঙ্কচিহ্ন মুদ্রিত হ'য়ে যায় নি। প্রত্যেকটি অক্ষত মূর্তি মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোকে সহস্রাধিক বৎসরের জীর্ণতাকে ধিক্কার দিয়ে নবযৌবনে উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে। বুদ্ধদেব ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, হাতে ধর্মচক্রমুদ্রা। স্তূপগুলোর অগ্রভাগ কতকটা দৃশ্য, অধিকাংশই অদৃশ্য, মহাশূন্যলোকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবার

উদ্দেশ্যেই তাদের চূড়াগুলোকে অংশত অদৃশ্য ক'রে রাখা হ'য়েছে।

এই সর্বোচ্চ স্তরে জাগতিক জীবনের কোনো রূপ প্রস্তরে উৎকীর্ণ নেই, এখানে নরনারী নেই, মুনিঋষি নেই, বৃক্ষলতা নেই, জীবলোক ও প্রকৃতি-লোক উত্তীর্ণ হয়ে যে এই অরূপলোক, তাই তার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত করা হ'য়েছে। এখানে একমাত্র সত্য বুদ্ধ, যিনি নিত্য সত্য। তিনি ছাড়া এই অরূপলোকে আর কিছু সত্য নেই। নিম্নতর স্তরগুলো যেন জীবনের অর্থ-হীন কলরবে মুখর, জীবনের বস্তুভারে পীড়িত, কিন্তু অরূপলোকে অনন্ত প্রশান্তি। সেখানে বুদ্ধ একমাত্র সত্য, মহাশূণ্যতার মধ্যে মহানির্বাণ একমাত্র লক্ষ্য।

বরবুদরের বিশাল বৌদ্ধস্তূপে পাষাণের অক্ষরে জীবনের এক মহাকাব্য পাঠ করলাম। কেবলমাত্র বহির্মুখী দৃশ্যে সুবিশাল স্থাপত্যকীর্তিই নয়, এক সুগভীর অন্তর্মুখী জীবন-দর্শনও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে রূপলোক থেকে অরূপলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে।

প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে সেই বিশাল কীর্তির নানা অলিন্দ, বারান্দা ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। মধ্যাহ্ন রৌদ্র তখন একেবারে মাথার উপর, অলিন্দগুলোর মধ্যে কোথাও কোনো ছায়া নেই, রৌদ্র থেকে মাথা বাঁচান দায় হয়ে পড়্‌ল, তবু ক্লান্তি নেই, প্রাচীন বৌদ্ধযুগের মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌লাম।

একজন ওলন্দাজ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হলো, তাঁর সঙ্গে পাণ্ডানের রামায়ণ উৎসবে আলাপ হ'য়েছিল, তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌, আমাকে সব বিষয় কিছু কিছু বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। তাঁর গাড়ীতে যোগজাকার্তা ফির্‌তে পারব ভেবে তার ব্যাখ্যা ধৈর্য ধ'রে শুন্‌তে লাগ্‌লাম, তার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করতে লাগ্‌লাম। কিন্তু আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ না হ'য়েও তার কাছে আমার কিছু নতুন ক'রে শিখ্‌বার ছিল না।

ওলন্দাজ অধ্যাপকের মাথায় একটা টুপী ছিল, তা'তে তিনি রৌদ্র থেকে মাথা বাঁচিয়ে চল্‌ছিলেন, কিন্তু আমি টুপীহীন, সুতরাং আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অবশেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখন ফির্‌বেন, আপনার সঙ্গে আমিও যোগজাকার্তা ফির্‌তে চাই, তা'তে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না ত'!

তিনি বল্লেন, আমার অসুবিধা হবে না, কিন্তু আপনার অসুবিধা হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ? আমার আবার অসুবিধা কি ? আমি একা মানুষ।

তিনি বল্লেন, আমার ফিরতে দেরী হ'বে। আমি এখানে এক জায়গায় ছায়ায় ব'সে স্তূপের একটি অংশের একটা পেন্সিল স্কেচ্‌ আঁক্‌ব, এদিকে আর আস্‌ব না, তাই স্কেচ্‌টা শেষ করে নিয়ে যেতে হবে। তা'তে পাঁচ ছয় ঘন্টা দেরী হবে। বলে কাগজ পেন্সিল ও একটা বোর্ড তার ব্যাগ থেকে বার করে বসবার জন্য ছায়ার সন্ধান করতে লাগ্‌লেন।

আমি মনে মনে বল্লাম, তুমি নিপাত যাও।

তারপর এ'বার ফিরবার কি করব ভাবছি এমন সময় দেখি বিরাট একটা ডিল্যাক্স বাসে ক'রে কথাকলির শিল্পীরা সেখানে এসে হাজির হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় তাদের প্রাম্বানামের মন্দিরের সাম্‌নে নাচ হ'বে, তাই তারা সকালেই যোগজাকার্তায় এ'সে পৌঁছেচে।

শুনে আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ওয়েরিয়ার কোথায় ?

ওয়েরিয়ার কথাকলি দলের নায়ক। তার কথা আগে বলেছি।

তারা জানাল, সে অন্য একটি গাড়ী ক'রে পিছনে আস্‌ছে। বল্‌তে বল্‌তেই বিশাল একটি গাড়ীতে একজন সামরিক কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করে শ্রীওয়ারিব সেখানে এ'সে অবতরণ করল। আমাকে দেখে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে ?

আমি আমার কথা তাকে খুলে বল্লাম। সে বল্‌ল, আপনি আমাদেব দলে ভিড়ে পড়ুন, কোনো অসুবিধা হবে না। আজই আমাদের সঙ্গে প্রাম্বানামেও যেতে পারবেন।

আধ ঘন্টার মধ্যেই তাদের বরবুদর দেখা হ'য়ে গেল, তারপর শ্রীওয়ারিয়ারের সঙ্গে সামরিক প্রহরায় তার বিশাল গাড়ীখানি ক'রে যোগজাকার্তায় আমার 'হোটেল গরুড়ে' ফিরে এলাম। সন্ধ্যার আগেই সে আমাকে সেখান থেকে তার এই গাড়ীতেই তুলে নিয়ে প্রাম্বানামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। প্রাম্বানামের প্রাচীন শিবমন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কয়েক সহস্র দর্শকের সাম্‌নে ভারতের কথাকলি নৃত্যের রামায়ণের তিনটি দৃশ্যেব নৃত্যাভিনয় হ'লো।

প্রত্যাবর্তন

ইন্দোনেশিয়ার এ'বারকার কাজ শেষ হ'লো, এ'বার কোলকাতায় ফিরবার পালা। পরের দিন সকালে 'হোটেল গরুড়ে' প্রাতরাশ শেষ ক'রে কিছু 'ট্রাভেলার্স চেক্' ভাঙ্গানোর জন্য ব্যাঙ্কের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক হোটেলেই 'ট্রাভেলার্স চেক্' ভাঙ্গানো যায়, কিন্তু 'হোটেল গরুড়ে' সে ব্যবস্থা ছিল না, হোটেলের ম্যানেজার ব'লে দিল, কাছেই ব্যাঙ্ক, পঁচিশ রুপাইয়া দিয়ে একটা রিক্সা করেও যেতে পারেন, কিংবা হেঁটে যেতেও কষ্ট হবে না, হেঁটেও যেতে পারেন।

রিক্সাওয়ালারা আমাকে বিদেশী বলে চিন্‌তে পেরে একজন একশ রুপাইয়া আর একজন পঞ্চাশ রুপাইয়া নিয়ে আমাকে ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিবে জানাল। আমি হেঁটেই ফুটপাত ধরে পথ চল্‌তে লাগ্‌লাম।

আমাদের দেশে যেমন ফুটপাতের উপরই দোকান বসে যায়, যোগ-জাকার্তার সহরেও দেখলাম তাই। নানা খুচরো জিনিসের ছোট ছোট দোকান ফুটপাতের উপর বিছিয়ে বসেছে। দোকানগুলোর মধ্যে সব চাইতে বেশী ছবি ও পুতুলের দোকান। ছবিগুলো অধিকাংশই রামায়ণের নানা বিষয়ের উপর হাতে আঁকা, অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎকারের ছবিটির সংখ্যাই সর্বাধিক দেখ্‌তে পেলাম। ছবিগুলো কাগজ কিংবা কাপড়ের উপর আঁকা নয়, এক রকম পাতলা বাঁশের বেতীর উপর আঁকা, বেতীগুলো সরু পাটির মত করে বোনা। আজ কাল এ' রকম ছবি আমাদের দেশেও কিন্‌তে পাওয়া যায়। তবে সেদেশের চিত্রকর্মে বিশেষত্ব আছে। আমাদের দেশের পটের মত খুব গাঢ় রং সেখানে ব্যবহার করা হয়। একটি বেশ বড় ছবির দাম চার শ রুপাইয়া, অর্থাৎ ৮ টাকার মত, তা খুব বেশী বলা যায় না। তারপর মাটির পুতুলে রাবণের মুখ প্রচুর দেখ্‌তে পেলাম। কিছু কেনাকাটা করা গেল।

ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এ'সে সেদিনই জাকার্তার বিমানের টিকিট কেনা হোল। বিকাল চারটার মধ্যেই জাকার্তায় পৌঁছে গেলাম।

যোগজাকার্তায় ট্যাক্সি ভাড়া করবার যে সুন্দর ব্যবস্থাটি ছিল, জাকার্তায় সে ব্যবস্থাটি না থাক্‌বার কথা নয়, কিন্তু আমি তার সুযোগ

পারলাম না। বিমান-বন্দরের দু'জন কুলি (porter) আমার দু'টি স্যুট্‌কেস দু'দিকে নিয়ে গিয়ে দু'টো ট্যাক্সির সামনে দাঁড়াল। আমি কোন্ দিকে যাই? মহাসমস্যায় পড়লাম। বিশাল জনবহুল বিমান-বন্দর। আগে থেকে শ্রীসিংহ রায়ই হোক, কিংবা শ্রীপ্রতাপই হোক কাউকেই আমার আগমন বার্তা জানাতে পারিনি, তা'হলে তাঁরা বিমান-বন্দরে উপস্থিত থাকতেন।

এমন সময় সহসা শুনতে পেলাম, দু'জন তরুণ ও একজন তরুণী আমার নিকটেই দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলছে। তরুণীর পরিধানে শালোয়ার কামিজ ও দোপাট্টা। শুনে আমি তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর একটু কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা বাঙ্গালী?

তারা মহাখুসী হ'য়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

আমি আমার পরিচয় দেওয়া মাত্রই তরুণীটি আমার পায়ে ধ'রে প্রণাম ক'রে বল্‌ল, স্যার, আমি আপনার ছাত্রের ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল হাই আমার অধ্যাপক ছিলেন, আমি সেখান থেকে বাংলায় এম. এ পাশ করেছি। হাই সাহেবের কাছে আপনার কথা শুনেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে তোমরা কি করতে এ'সেছ?

তারা বল্‌ল, তারা পাকিস্তান হাই কমিশনারের আপিশে চাকুরি করে। বাংলা দেশে মুক্তিসংগ্রাম চল্‌ছে, তারা এখন কি কর্‌বে বুঝ্‌তে পাচ্ছে না।

তরুণীটি বল্‌ল, আপনি আমার বাড়ীতে গেলে আমি খুব খুসী হব।

আমি আমার সঙ্কটের কথা বললাম। মনে মনে ভাবলাম, এ' অবস্থায় আমার ছাত্রের ছাত্রীটির বাড়ী গেলেও চল্‌ত, কিন্তু আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হ'য়ে এখানে এ'সেছি, ভারতবর্ষ তখন পাকিস্থানের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধরত। এই অবস্থায় আমার পক্ষে একজন পাকিস্তানী নাগরিকের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না। তা'তে আমার কিছু ক্ষতি না হোক, এই বাঙ্গালী তরুণ কর্মচারীদের ক্ষতি হতে পারে। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাঙ্গালীদেরে পাকিস্তানিরা সন্দেহের চোখে দেখত।

কিন্তু মেয়েটি বার বার অনুরোধ করতে লাগ্‌ল, আমি নানা কথা

ব'লে তা' কাটিয়ে দিতে লাগ্‌লাম।

অবশেষে দু'টি তরুণের সহায়তায় ট্যাক্সি-সঙ্কট থেকে মুক্তি পেলাম। তারা নিজেরাই নিজেদের ট্যাক্সিতে আমাকে সিংহ রায়ের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেল। সিংহ রায়ের বাড়ীতে যখন পৌঁছুলাম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে, কিন্তু রৌদ্রের প্রখরতা একটু কমে নি।

স্থির হলো, আগামীকালই সিঙ্গাপুর যাত্রা করব, সেখানে এক রাত্রি হোটেলে বাস করে পরের দিন কোলকাতায় রওয়ানা হব। সিংহ রায় বিমান-যাত্রার টিকিট 'এন্‌ডোরস্‌' করিয়ে দিয়ে সিঙ্গাপুরে হোটেলে থাক্‌বারও ব্যবস্থা করে দিলেন। সেদিনও অনেক রাত্রি পর্যন্ত সিংহ রায় ও নমিতার সঙ্গে গাড়ী ক'রে জাকার্তা সহরের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম।

পরের দিন সন্ধ্যার কিছু আগেই আমাকে নিয়ে শ্রীসিংহ রায় ও নমিতা জাকার্তা বিমান-বন্দরে পৌঁছে গেল। আমাকে বিদায় জানানোর জন্য সেখানে আগে থেকেই শ্রীপ্রতাপও অপেক্ষা করছিল। সে বার বার শুধু একই কথা বলে চলেছিল, আপনার জন্য রামায়ণ আলোচনা চক্রে ভারতের মান রক্ষা হ'য়েছে। তার সৌজন্য এবং অকৃত্রিম সৌহার্দের জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানালাম।

সন্ধ্যার আগেই বিমান সিঙ্গাপুরের দিকে যাত্রা করল।

বিমানে উঠে আর একজন তরুণ বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা। সে সিঙ্গাপুরে পাকিস্তানী দূতাবাসের একজন কর্মী, সরকারী প্রয়োজনে জাকার্তায় গিয়েছিল, এখন সিঙ্গাপুরে ফিরে যাচ্ছে। দেশে মুক্তিযুদ্ধ চল্‌ছে, সে জন্য সে খুব চিন্তিত, সে সংক্ষেপে শুধু একবার বল্‌ল, আমিও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিব, এই গোলামী আর করব না।

সিঙ্গাপুর গিয়ে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, সমুদ্রের জলে ভাসমান বন্দরটি আলোতে ঝলমল ক'রে উঠ্‌ল। বিমান কর্তৃপক্ষই আমার হোটেলের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নেমেই তাদের গাড়ীতে ক'রে সমুদ্র তীরের একটি সুন্দর হোটেলে এসে উঠ্‌লাম। হোটেলের ঘরখানি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, তার ভিতর প্রবেশ কর্‌তেই শরীরটা জুড়িয়ে গেল, কোনো দিক বিবেচনা না ক'রে বিছানার উপর এগিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিফোনটি বেজে উঠ্‌ল। কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস

ক'রে জান্‌তে পেলাম, একজন সিন্ধী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চান। তখন রাত্রি ৯ টা, কিন্তু ব্যাপার কি ? তাকে ঘরে আসতে বল্‌লাম।

ঘরে যে এ'ল সে ভদ্রবেশী সুশ্রী এক তরুণ। তার পরিচয় দিয়ে সে বল্ল, সে এখানকার একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। সিঙ্গাপুরে কোনো জিনিষের শুল্ক দিতে হয় না, তাই জিনিস পত্র খুব সস্তা। যদি কিছু কিন্‌তে চাই, তবে সে এখনই আমাকে তাঁর দোকানে নিয়ে যেতে পারে, যাতায়াতের জন্য সে তার গাড়ী নিয়ে এ'সেছে।

সস্তায় কিছু জিনিস কিন্‌বার ইচ্ছা যে না ছিল, তা নয়। কিন্তু এত রাত্রে ? আমি বল্লাম, কাল সকালে বরং আস্‌বে, তখন দেখা যাবে।

সে হাসি মুখে বল্ল, আপনি বোধ হয়, ভুলে যাচ্ছেন, কাল রবিবার এখানকার সব দোকান পাট কাল বন্ধ থাক্‌বে। তাই রাত ক'রেই আপনার কাছে এ'সে আপনাকে বিরক্ত করছি। হয়ত পরশুদিন আপনি সিঙ্গাপুরে না-ও থাক্‌তে পারেন।

সে সংবাদ সে আগেই হোটেলের আপিশ থেকে জেনে এসেছে দেখলাম।

আমি ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগলাম দেখে সে আবার বল্ল, আমরা কিন্তু 'ট্রাভেলার্স চেক্'ও নিয়ে থাকি।

আমি বল্লাম, না, সেজন্য নয়। আমি যার জন্য ইতস্ততঃ কচ্ছিলাম, তা' আর কিছু নয়, একটা অপরিচিত স্থানে একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে রাত্রি ন'টার পর টাকা পয়সা নিয়ে নিঃসঙ্গ যাওয়া ঠিক হবে কি না, তাই ভাবছিলাম। অথচ কাল রোববার, কিছু কিন্‌তে হ'লে আজ এখুনি না গেলেই নয়।

অগত্যা আর কিছু না ভেবে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কেবল যাবার সময় হোটেলের 'রিসেপ্‌শানে' যে চীনা মেয়েটি ব'সেছিল, তাকে বলে গেলাম, আমি একটু এ'র সঙ্গে ঘুরে আস্‌ছি।

সে মাথা নেড়ে বল্‌ল, আচ্ছা ! বুঝ্‌তে পারলাম, যুবকটি হোটেলের অপরিচিত নয়, মনে একটু সাহস হ'লো।

গাড়ী ক'রে সামান্য দূরে যেতেই তার দোকান। ভিতরে প্রবেশ ক'রে ত চক্ষু স্থির ! একদিকে টেপরেকর্ডার, ট্রানজিস্‌টার, রেডিও ও

ইলেকট্রিক সরঞ্জামের এক বিরাট পাহাড়, আর একদিকে জাপানী রঙ বেরঙের ছিট্ কাপড় থেকে বেনারসী শাড়ীর স্তূপ। দোকানে অনেক কর্মচারী, তারা গম্ভীর ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আমি কি কি জিনিস কিন্তে চাই, তা' জান্তে চাইল। একজন একটা কোকা-কোলার বোতল হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। বিলাস-দ্রব্যের এই বিপুল সংগ্রহের মধ্যে যেন আমি হারিয়ে গেলাম। কি কিনব, কিছুতেই মন স্থির করতে পারলাম না।

দোকানে আর ক্রেতা নেই, কর্মচারীরা এখন দোকান বন্ধ করবার জন্য উৎসুক, শুধু আমার মুখের কথার জন্য সবই অপেক্ষা ক'রে আছে।

হঠাৎ চোখমুখ বুজে বলে ফেল্লাম, আমি কিছুই কিন্‌ব না, ব'লে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে পথে নেমে এলাম। এমন সময় দেখি সিন্ধী যুবকটি ছুটে এসে আমাকে অনুরোধের সুরে বল্‌ছে, গাড়ীতে উঠুন, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি। একা আপনি রাতে পথ চিনে যেতে পারবেন না।

আমি নির্লজ্জের মত গাড়ীতে গিয়ে চড়ে বস্‌লাম।

পরের দিনই সন্ধ্যার পর কোলকাতায় ফিরলাম।

ফিরে এসে দেশবাসীর কাছ থেকে কয়েকটি অভিনন্দন পত্র পেলাম, তাদের মধ্যে একটি প্রবীণ কবি শ্রীনিকেতনের অধিবাসী শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রেরিত। তা' এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য—

অভিনন্দন

মানুষের সভ্যতার সে কোন্ অস্ফুট ঊষালোকে
অভয়ের অমৃতের সুন্দরের স্বপ্নলগ্ন চোখে
একদা এ ভারতের বীর্য দীপ্ত জাগ্রত যৌবন
গিয়াছিল দিগ্বিদিকে পার হ'য়ে গিরি-মরু-বন
উত্তাল উর্মিল সিন্ধু—ধরণীর দেশে দেশান্তরে—
নিশান্তের বার্তা বহি—গ্রামে পুরে কান্তারে প্রান্তরে।
সেদিন সে অসঙ্কোচে লয়েছিল সঙ্গে করি তার
পরিপূর্ণ অন্তরের অফুরন্ত ঐশ্বর্য সম্ভার,—
তপস্যার হোমবহ্নি,—সৌন্দর্যের চন্দন সৌরভ,—
সমৃদ্ধির রত্নপেটি,—শৌর্যের নিঃশঙ্ক শঙ্খরব—

বিতরিতে স্বল্পবিত্ত সুদূরের স্বজন সভায়
আত্মীয়ের মমতায়,—পুণ্যে প্রেমে প্রজ্ঞার প্রভায়
দিগন্ত উদ্দীপ্ত করি, সেদিনও অরণ্য অন্তরালে
যেথা রাত্রি ছিল গুপ্ত মানবাত্মা বাঁধি সুপ্তিজালে
সহসা সে গেল ভাসি দুর্নিবার আলোর জোয়ারে।
প্রীতির পরশমণি স্বর্ণ করি তুলিল লোহারে
দেশে দেশে, সঞ্জীবনী জীবন-জাহ্নবী জলধারা
জাগাইল প্রাণস্পন্দ ভস্মস্তূপে ভাঙি মৃত্যু কারা।
দিকে দিকে দিব্যজ্যোতি দীপঙ্কর পাঠাল ভারত —
মাতৃ আশীর্বাদ সহ—তিমির ছেদে দেখাইতে পথ
স্বপ্ন তার মূর্তি নিল শুষ্ক মরু ভরি ফলে ফুলে
শত তীর্থে জনপদে চৈত্যে হর্ম্যে দেবতা দেউলে
পাষাণ পেলব করি অপরূপ শিল্প সুষমায়।
শতলক্ষ রূপদক্ষ অনিন্দ্য সুন্দর প্রতিমায়
ভরিল ধরিত্রীবক্ষ অমূর্তেরে ধ্যাননেত্রে হেরি।
জগদ্ধাত্রী জননীর জীমূতনিঃস্বন জয়ভেরী
ধ্বনিল নিদ্রিত বিশ্বে— যোগাতে মৌনের মুখে ভাষা,
নিখিলের অবজ্ঞাতে জানাতে ভ নব ভালোবাসা।

সেদিন সহস্র পোতে মন্থিয়া দুস্তর সিন্ধুজল
দূর পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে গেছে ঋষি কৌপীন সম্বল
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের পূজামন্ত্র কণ্ঠে লয়ে তার।
গেছে ভিক্ষু চীরবাস সদ্ধর্মের অশোক উদার
বাণী বহি, পণ্য লয়ে বণিক্ গিয়াছে স্বর্ণলোভী,
বাজাইয়া রণডঙ্কা গেছে যোদ্ধা, গেছে শিল্পী, কবি,
গেছে রসায়নাচার্য, জ্যোতির্বিদ, চতুঃষষ্টি কলা
সুনিপুণা গেছে নটী কলকণ্ঠী লাবণ্য উচ্ছলা,
ভাস্কর, স্থপতি গেছে পাষাণে রচিতে স্তবগান
অক্ষয় অক্ষরে ঃ তারা করেছে যে যার অর্ঘ্যদান
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে সুদূর দক্ষিণ সিন্ধুপারে—
মুখরি নগর পল্লী নৃত্যে গীতে বীণার ঝঙ্কারে—

রচিয়া রুচিরা পুরী, বন্দর, সরণী, খনি খাত।
ভারতের শিব-বুদ্ধে দ্বীপবাসী করি প্রণিপাত
মাগিয়াছে আশীর্বাদ ; অন্তরে বাহিরে দেহে মনে
ভারতেরে স্বাঙ্গীকৃত করেছে সেদিন ফুল্লমনে ;
মাতিয়াছে রামায়ণ মহাভারতের অভিনয়ে ;
গাহিয়াছে পূজামন্ত্র প্রতিদিন চৈত্যে দেবালয়ে।
ভারতের শিষ্যবৃন্দ লভি দীক্ষা কবিগুরু পাশে
সাহিত্য মাধুর্য তার সম্ভোগ করেছে অনায়াসে,
জানিয়াছে আমাদের সমুদার ধর্মের মহিমা।
শিল্পী কলা-কারু শিল্পে দেখায়েছে দক্ষতার সীমা
গুরুদক্ষিণায় গেছে মূর্ত কবি সহস্র কবিতা—
নিষ্প্রাণ পাষাণে রচি অপরূপা প্রজ্ঞা পারমিতা।

কাটিল বসন্তবেলা, থামিল বাঁশরী কলস্বনা
মধু পূর্ণিমার রাত্রে মঞ্জুকুঞ্জে, বজ্রের ঝঞ্ঝনা
সঙ্গে লয়ে অকস্মাৎ উন্মাদিনী কী কালবৈশাখী
নামিল, নিকষকৃষ্ণ তমিস্রায় স্বর্গমর্ত্য ঢাকি
বঙ্গ উপসাগরের তিন কূলে। এপারে ওপারে
নিভে গেল দীপাবলী মুহূর্তে ভয়ার্ত হাহাকারে।
সংস্কৃতির স্বর্ণচূড় বহু শতাব্দীর কীর্তিরাশি
ঝঞ্ঝার প্রলয়নৃত্যে ধ্বংসের প্লাবনে গেল ভাসি।
বরোবুদুরের বক্ষে ত্রিশরণ মন্ত্র গেল থামি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব চণ্ডী প্রস্থাননে কোরান প্রণামী।
বিচূর্ণিত শত শত মন্দিরের শিলাস্তূপ পরে
অরণ্য বাড়াল বাহু। দুর্যোগের ঊর্ধ্বে স্পর্ধাভরে
অর্ধচন্দ্র দিল দেখা বিজেতার জয়ধ্বজ পটে
বিধাতার ইন্দুলেখা মুছি দিয়া, সে মহা সঙ্কটে-
অটল বিশ্বাসে বলী সুদূর দক্ষিণে বালিদ্বীপ
নিভৃতে রাখিল জ্বালি' হিন্দুর একটি পূজাদীপ।
ভারতের দেবদেবী নাহি জানি মর্মকোষে তার
সঙ্গোপনে করেছিল একদিন কী সুধা সঞ্চার।

অতন্দ্র পূজায় তাই একা সর্ব শঙ্কা পরিহরি
সে শুধু রহিল জাগি শতাব্দী শতাব্দী কাল ধরি।
কালচক্র চলে ঘুরি, নবধর্ম ছলে বলে যবে
গ্রাসি পূর্বদ্বীপপুঞ্জ মেতেছিল ধ্বংসের তাণ্ডবে
রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিগ্বিদিক্, আতঙ্কে মগন
নরনারী করেছিল তার কাছে আত্মনিবেদন
দেশ জুড়ি, তার পরে ধর্মান্ধের দুরন্ত প্রয়াস
দিতে মুছি সে দেশের উজ্জ্বল অতীত ইতিহাস
মানুষের মর্ম হতে ব্যর্থ হ'ল ক্রমে দিনে দিনে
বৎসরে বৎসরে, পুনঃ দ্বীপে দ্বীপে সাগর পুলিনে
বিদ্বেষ গরল ঢাকি পলে পলে পীরিতি পরাগে
বর্বরতা করি জয় মন্দারের মকরন্দ রাগে
সংস্কৃতি বিজয়ী হ'ল। বহু শতাব্দীর ব্যবধানে
ইসলামের রাজদণ্ড শ্বেত বণিকের অভিযানে
অবশেষে হ'ল চূর্ণ, রাজদণ্ডে হ'লো পরিণত
বণিকের মানদণ্ড—দুর্যোগের নিশান্তে জাগ্রত
ভারত দিগন্ত প্রান্তে আঁখি মেলি চিনিল আবার
দূর পূর্ব দক্ষিণের দ্বীপপুঞ্জে আত্মজনে তার।
দেখিল প্রলয়রাত্রে যাদের ভুলিয়াছিল মাতা
স্থান দিতে নিজ অঙ্কে আজিও পঙ্কজাসন পাতা
ভারতলক্ষ্মীর তরে অকলঙ্ক ও'দের অন্তরে,
আজও মমতার মধু তাহাদের মরমে সঞ্চরে।
বহু দীর্ঘ শতাব্দীর বিস্মৃতির ঘন কুহেলিকা
ভেদ করি হেথা হোথা ভারতের হোমবহ্নিশিখা
দেখা দিল দিবালোকে। নব ভারতের ঋষি কবি
সেদিন গেলেন যেথা আত্মীয়ের আমন্ত্রণ লভি'
স্বদেশের স্নেহসিক্ত গীতাঞ্জলি দিতে উপহার।
বহু দুর্গতির পরে মুক্তিযুদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার
সার্থক হয়েছে আজি দ্বীপপুঞ্জ স্বতন্ত্র স্বাধীন
সগৌরবে স্মরিতেছে আজি তার অতীতের দিন

খুঁজিয়া প্রেরণা উৎস মহত্তর ভবিষ্যের লাগি।
হে মোর কোবিদ্ বন্ধু, হে গাঙ্গেয় বঙ্গ অনুরাগী
তুমি গিয়াছিলে সেথা স্বদেশের বাণীদূতরূপে
সিন্ধুপারে, বঙ্গ আজও কী স্নেহ বন্ধনে চুপে চুপে
বদ্ধ তাহাদের সাথে জানাইতে তাহার সন্ধান
বন্ধুবৃন্দে সেদেশের, বাড়ায়েছ বাঙালীর মান
সুদূরের আত্মীয়েরে আহ্বান জানায়ে মাতৃক্রোড়ে ;
অপরিচয়ের বাধা ছিন্ন করি বাঁধি রাখী ডোরে।
সঙ্গে লয়ে গিয়াছিলে অতীতের স্মৃতির সুরভি,
ফিরিয়াছ মহানন্দে বন্ধুর বন্দন-মাল্য লভি
চন্দন চর্চিত ভালে। আজি ভারতের বীণাপাণি
রেখেছেন শিরে তব স্নেহভরে সুদক্ষিণ পাণি,
আমরা গৌরবান্বিত তোমার গৌরবে, শুধু ভাই,
আমি তব স্বদেশের দীন কবি—ভাবিয়া না পাই
তোমারে নন্দিত করি কী অভিনন্দনে? যায় সাধ
বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণের জানাইতে শুভ আশীর্বাদ ;
ভরসা না পাই কিন্তু ঃ অকিঞ্চন অজ্ঞে মম সম
বহুশ্রুত প্রাজ্ঞ তুমি আজি, বন্ধু, নিজগুণে ক্ষম।
শুধু এ প্রার্থনা—আজ বাণীতীর্থে যে পূজায় রত
সুকঠিন সাধনায় সাঙ্গ করি সেই মহাব্রত
জীবন সার্থক হোক—স্বদেশ সমৃদ্ধ হোক তব।
অন্তরে আনন্দ আর বহির্বিশ্বে জয়মাল্য লভো।

শ্রীনিকেতন, বীরভূম — প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাপ্ত